বিপ্লবী জীবনই
সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়

শিবদাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময় — শিবদাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ, ২০২৩

প্রকাশক ঃ প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

প্রকাশকের কথা

১৯৭৪ সালে কলকাতার মহাজাতি সদন হলে এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে দলের নেতা-কর্মীদের জন্য একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক প্রশ্নের ভিত্তিতে ঐ শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এযুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। টেপ রেকর্ডে ধরে রাখা ঐ আলোচনা সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কাজটি ওনার অবর্তমানে যত কঠিন ও সময়সাধ্য কাজই হোক, আমরা এই মূল্যবান আলোচনা সম্পাদনা করে অবশেষে প্রকাশ করছি। সম্পাদনায় কোনও ত্রুটি ঘটে থাকলে, তার সম্পূর্ণ দায় আমার।

বর্তমানে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের সময় কিছু ইংরাজি বাক্য ও শব্দের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০২৩
এস ইউ সি আই (সি) অফিস
৪৮, লেনিন সরণি
কলকাতা - ৭০০০১৩

ধন্যবাদান্তে
প্রভাস ঘোষ

বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়

শিবদাস ঘোষ

পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে চারদিনের এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। আমি শুনেছি এই শিক্ষাশিবিরে নতুন অনেকে অংশগ্রহণ করছেন। আমি মনে করি, এই শিক্ষাশিবির পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাতে কর্মীরা উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন এবং জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যান্যবার যেমন মার্কসবাদের বুনিয়াদি ধারণাগুলো, মার্কসবাদের মূলনীতি, তত্ত্ব, দর্শনের দিক একদম সাধারণ মানুষের বোঝবার মতো করে আমরা উপস্থাপনা করি এবং তারপর সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি এবং সাংগঠনিক সমস্যাবলীর উপর আমরা আলোচনা করি, এবার অন্যভাবে করব। কোনও কোনও শিক্ষাশিবিরে আমরা হয়তো দর্শনের দিকটার ওপর বেশি জোর দিই, কখনও হয়তো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকটার ওপর বেশি জোর দিই। কখনও হয়তো আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর জোর দিই। আগের স্কুলগুলোর মধ্যে থেকে এইরকম একটা ধারণা কমরেডদের হয়েছে। ফলে, সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের ওপর আলোচনা হওয়ার জন্য অনেক কথাই ঠিকমতো ধরতে পারা বা বুঝতে পারা হয়তো তাদের ক্ষেত্রে মুস্কিল হবে। তবে আমি চেষ্টা করব, নির্দিষ্ট প্রশ্নের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্কিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদের বুনিয়াদী সিদ্ধান্তগুলির যেখানে যতটুকু যা সম্বন্ধ রয়েছে সেইগুলো খানিকটা যুক্ত করে বা সম্বন্ধ স্থাপন করে আলোচনা করার। কিন্তু তা করলেও আমার ধারণা, সেটা যথেষ্ট হবে না। যার ফলে নতুন কমরেডদের বা কিছুদিন হল যুক্ত হয়েছেন এবং কিছু পুরানোদের মধ্যেও যাদের মার্কসবাদের বুনিয়াদি কনসেপ্ট, পার্টির চিন্তাধারা এবং বিচারধারার সঙ্গে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিচারধারার সঙ্গে তেমন পরিচয় ঘটেনি এবং যাদের কমিউনিস্ট এথিক্স-এর (নীতি-নৈতিকতার) ধ্যানধারনাগুলো সম্পর্কে জানা-বোঝা এখনও ভাল করে হয়নি, তাদের একটু মুশকিল হতে পারে। আবার নতুন এরকম কিছু কর্মী, যারা তত্ত্বমূলক আলোচনা, দর্শনের ওপর আলোচনা ও নানা সমস্যার ওপর নানা রকমের আলোচনা শোনবার জন্য এসেছেন —তারা হয়তো খানিকটা হতাশ হবেন। কিন্তু তবুও এই স্কুল নেতারা বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে ডেকেছেন সেটাকে আমি ওয়েলকাম করছি। যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো দেখলে বোঝা যায়, সেগুলি ইটসেল্ফ স্পিকিং ফর ইমম্যাচিওরিটি অফ দ্য কমরেডস (সেগুলির মধ্য দিয়ে কমরেডদের অপরিণত মানের প্রতিফলন ঘটেছে)। অন্যান্য দল বলে এস ইউ সি আই দলের কর্মীদের চেতনার স্তর খুব উন্নত। হ্যাঁ, অন্য দলের কর্মীদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু তা হল, ভ্যারেন্ডা বনে খাটাশ বাঘের মতো। এদের মধ্যে আমরা খাটাশ বাঘ। তা খাটাশও ভ্যারেন্ডা বনে বাঘ হয়! কাজেই অপর দলের কর্মীদের কোনও তত্ত্ব-টত্ত্বর বালাই-ই নেই; চিন্তাচেতনা, দর্শন, নীতির কোনও বালাই নেই। তাদের হল শ্লোগানসর্বস্ব আর হৈহৈ-এর রাজনীতি। কাজেই অন্য দলের লোক বা পাবলিকের মধ্যে একটা ধারণা স্বভাবতই হতে পারে যে, ঐসব দলের কর্মীদের যাদের তারা রাস্তাঘাটে দেখে, আর আমাদের কর্মীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ হয়, তাদের মনে হয় যে এই দলের কর্মীরা খুব সচেতন, অ্যাডভান্সড ক্যাডার এবং তাদের উন্নত চেতনা রয়েছে। কিন্তু আমি জানি এ হল ভ্যারেণ্ডা বনে খাটাশ বাঘের মতো অবস্থা। চেতনার যে স্তর এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা দেখেই এ কথা বোঝা যায়। এই প্রশ্নগুলো শুনে আর যেই ডিসিভড হোক (ঠকে যাক) , আমার ডিসিভড হবার কোনও কারণ নেই। লোকে যাই বলুক, বোঝাই যাচ্ছে আমাদের কর্মীদের চেতনার স্তর খুব একটা ভাল জায়গায় নেই। কিছু প্রশ্নের যথার্থ গুরুত্ব আছে। আবার কিছু কিছু প্রশ্ন একেবারে সিলি (অর্থহীন)। যদিও এই সিলি প্রশ্নগুলোকে আমি ওয়েলকাম করছি। কারণ এর মধ্যে কমরেডদের একটা বার্নিং আর্জ (জ্বলন্ত স্পৃহা) দেখা যাচ্ছে। তারা যেসব সমস্যাগুলির সম্মুখীন সেই সমস্যাগুলো থেকে বাইরে আসতে চাইছে। এই বার্নিং আর্জ থেকে তারা এই প্রশ্নগুলো করেছে। তাই তারা পারপাসলেস (উদ্দেশ্যহীন) কতগুলো অ্যাকাডেমিক (পুঁথিগত) ও থিওরেটিক্যাল (তত্ত্বগত) ডিসকাশন (আলোচনা) চায়নি।

কমরেডরা যে প্রশ্নগুলো করেছে সেগুলো হচ্ছে হাউ টু ডেভেলাপ আওয়ার অর্গানাইজেশন্স (আমাদের সংগঠনগুলি কীভাবে গড়ে তুলতে হবে) অর্থাৎ হাউ টু বিল্ড আপ আওয়ার পার্টি ইন সাচ এ ওয়ে, সো দ্যাট ইট ক্যান প্রোভাইড লিডারশিপ টু দ্য মাস স্ট্রাগলস অ্যান্ড মাস মুভমেন্টস ইন দ্য নিয়ারেস্ট ফিউচার (অদূর ভবিষ্যতে গণসংগ্রাম এবং গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দলকে গড়ে তুলতে হবে)। তারা চাইছেন অতি দ্রুত পার্টির শক্তি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং তা করবার জন্য আমাদের মধ্যে যে সমস্ত দুর্বলতা রয়েছে বলে মনে করছেন, সেই প্রশ্নগুলোকেই বিনা দ্বিধায় তারা পার্টির সামনে উপস্থিত করেছেন। কর্মীরা সেই দুর্বলতাগুলোর হাত থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, শক্তি অর্জন করতে চাইছেন, এবং কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে চাইছেন। এই দিকটা এই মামুলি প্রশ্নগুলোর মধ্যেও অত্যন্ত ভাল জিনিস এবং খুবই প্রশংসনীয় ও খুব আশার জিনিস। সো আই ওয়েলকাম ইট।

কিন্তু আমি এই কথাটা বললাম এই কারণে যে, আমাদের কমরেডরা যখন পরস্পরের মধ্যে অফিসে বা নানা জায়গায় আলোচনা করেন তা আমার কানে আসে। আবার অনেক সময় আমার সামনেও তারা করেন। আমি শুনি, পাবলিকের প্রশংসায় কমরেডদের মনটা খুব ভরে যায়। যদিও এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, লোকে বলছে এস ইউ সি আই দলের কর্মীগুলোর স্যাক্রিফাইসের (আত্মত্যাগের) তুলনাই হয় না। এদের সততারও তুলনা হয় না। এরা অপর দলের মতো অমন উটকো টাইপ নয়। এরা শ্লোগানমঙ্গার (স্লোগান সর্বস্ব), হুল্লোড়বাজ নয়। এরা কনসাস (সচেতন), এদের চেতনার স্ট্যান্ডার্ড (মান) খুব ভাল। এসব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই কমরেডদের বুকের ছাতিটা দশ হাত ফুলে যায়।

আমাদের ভাবনা হবে, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কতটা কাজ করতে পারছি

আমি এইটুকু শুধু বলতে চাইছি যে, হ্যাঁ, অপর দলের তুলনায় আমাদের কর্মীদের স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চয়ই অ্যাডভান্সড (উন্নত), কিন্তু সাথে সাথে এটাও আমি মনে করি, এটা কোনও কার্যকরী স্ট্যান্ডার্ড নয়। আমরা তো এটাতেই সন্তুষ্ট থাকব না যে, ঐসব হুল্লোড়বাজ রাজনৈতিক কর্মীদের চেয়ে আমরা কত নিষ্ঠাবান, কত অনেস্ট এবং কতখানি সচেতন। আমাদের ভাবনা হবে দেশের যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী কতটা ক্রিয়া করতে পারছি। জনসাধারণের মধ্যে হতাশা যেমন ডিপ রুটেড (গভীরে প্রোথিত), তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে অবিশ্বাস যেরকম দৃঢ় ভিত্তিমূলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই অবস্থায় আমরা

আমাদের শিক্ষা, বচন পদ্ধতি, কর্মপদ্ধতি এবং জ্ঞানের দ্বারা তাদের কীভাবে বারবার বুঝিয়ে এই হতাশার মনোভাব দূর করতে পারি এবং কত দ্রুত তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারি। জনগণকে বোঝাতে হবে, নিরাশার কোনও কারণ নেই। আর নিরাশা বা নৈরাশ্য কোথায় লিড করে (নিয়ে যায়)? নৈরাশ্য দিয়ে সমাজের সর্বনাশ ছাড়া কিছু হবে না। আর সেই সর্বনাশ তো তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। বিপদ তো তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। এই কথাগুলো মানুষকে বোঝাতে হলে এবং আমাদের দলের প্রয়োজনীয়তা কী এবং তার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কী এবং কেন জনসাধারণের মুক্তি এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সফলতা, বামপন্থী আন্দোলনের সফলতা ও বিফলতার প্রশ্ন আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধির এবং বাস্তব নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত,— এই কথাগুলো বোঝাতে হলে নেতৃত্বের যে ক্ষমতা এবং জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার, পলিটিক্যাল ইনিসিয়েটিভ (রাজনৈতিক উদ্যোগ) দরকার, সে তুলনায় আমাদের কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা এবং যুক্তি করবার ও আর্গুমেন্ট করার ক্ষমতা অত্যন্ত নগণ্য।

এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে সিপিএম দলের অনেকেই সুবিধাবাদী;তাদের ধান্দা হল চাকরি বাকরি মিলবে কিনা, দুপয়সা পাব কিনা। কংগ্রেসের ছেলেগুলোও তাই। আর, আমাদের দলের ছেলেরা ডেডিকেটেড (নিষ্ঠাবান), যাদের পয়সা দিতে হয় না, বরং নিজেদের সামর্থ থাকলে ঘর থেকে পয়সা এনে জনগণের কাজ করে। যে কমরেডরা চাকরি করে তারা সর্বস্ব পার্টিকে দিয়ে দেয়। এই দলে চাকরি পাওয়ার লোভে কেউ আসে না। এই রকম কর্মী শুধু এই দলটাতেই আছে। এইজন্য আমরা অন্য দলের থেকে গর্ব অনুভব করতে পারি। পাবলিকের মধ্যেও আমাদের তারিফ বাড়ছে। কারণ পাবলিক তো অন্ধ নয়, তারা বিচার করবেই। দুটি দলের কর্মীকে যখন রাস্তায় চলতে দেখবে, তারা বিচার না করে পারবে না। শালীনতা, রুচি, শিক্ষাদীক্ষা, আত্মত্যাগ, পরিশ্রম করার শক্তি — এ সমস্ত দিক থেকে বিচার করলেই অপর যে কোনও দলের কর্মীদের থেকে মনে হবে এ দলের ছেলেমেয়েগুলো খুব ভাল। কিন্তু শুধু তারিফ দিয়েই কাজ হবে কি?

এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় আলোচনা করা দরকার। এই যেমন একটি কর্মী প্রশ্ন করেছেন, আমরা এত ভাল হয়ে গিয়েছি যে আমাদের দলের সমস্ত কর্মীই কেবল ভাল ছেলেমেয়েদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। পাবলিকও মনে করে, এটা সব ভাল ছেলেমেয়েদের দল। কিন্তু দেশের মধ্যে বেশিরভাগ যুবক, যারা সব ডানপিটে এই হুল্লোড়বাজির রাজনীতির জন্য, ভুল নেতৃত্বের জন্য, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তারা বিভ্রান্ত বা মিসগাইডেড। এরা না বুঝে নানা হুল্লোড়বাজির মধ্যে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এরাই তো প্রধান যুবশক্তি। এই ডানপিটে, হুল্লোড়বাজ, যাদের হয়তো অনেক সময় পাবলিক গুণ্ডা বলে, রকবাজ বলে, তাদের মধ্যে আমাদের আদর্শ রেখাপাত করতে পারছে না কেন? আমরা তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারছি না কেন? একজন কমরেড এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। ইট ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন টু পন্ডার ওভার। এটা খুবই গুরুত্ব দিয়ে ভাববার মতো বিষয়। কারণ কেবল গুডি গুডি ভাল ছেলেদের দিয়েই যে ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে তা তো নয়, ইতিহাস তা বলছে না। আবার বেশিরভাগ এই ভাল ছেলেরা আমাদের দলের আদর্শটা খুব ভাল বলে তা গ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত রকমের ঝক্কি, ঝড় ঝাপটা সামলে, রাজনৈতিক ইনিশিয়েটিভ নিয়ে, জনসাধারণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করার শক্তির যে প্রয়োজন তাদের অনেকের মধ্যেই তার একান্ত অভাব। এই ডানপিটে ছেলেগুলো ভ্রান্ত পথে চলছে, তারা হয়তো গুণ্ডামি করে, তারা হয়তো নিজেরা নিজেদেরই অনিষ্ট করে বসে। তারা সব এমন কাজ করে যার ফলে যুবশক্তিরই যে অনিষ্ট হচ্ছে, দেশেরই যে অনিষ্ট হচ্ছে সে বোধটুকুও তাদের নেই। কিন্তু তবুও তাদের কর্মক্ষমতা রয়েছে। তারা জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে পারে। ঐ হুল্লোড়বাজ চরিত্রটা নিয়েই তারা বেশ কিছু কাজ করতে পারে। অথচ যারা গুড বয়, ভাল ছেলে, তারা বড় আদর্শের কথা বলে, বড় আদর্শের জন্যই তারা আকৃষ্ট হয়েছে;কিন্তু জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে নিজের ইনিশিয়েটিভে আর পাঁচজনকে জড়ো করে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা এদের অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে না। সেইজন্য দল যদি যথার্থ কমিউনিস্ট আদর্শভিত্তিক হয়, ভাল ছেলেদের মধ্যে তার আবেদন থাকবে বৈকি। দলের আদর্শের প্রতি যদি সমাজের ভাল মানুষদের এবং ভাল ছেলেদের আবেদন না থাকে, ভাল ও সৎ মানুষদের যদি দলের আদর্শ, দলের কর্মপদ্ধতি, দলের কর্মীদের জীবন, নেতাদের জীবন আকর্ষণ করতে না পারে, তাহলে সে দল লোকবল জড়ো করলেও হাজার হাজার কর্মী জড়ো করলেও দেশের কোনও মঙ্গলসাধন করতে পারবে না। এই দলের শক্তি বাড়লে হুল্লোড়বাজি এবং বিভ্রান্তিকর রাজনীতির প্রভাব কমবে। সেজন্য এটা একটা অ্যাসিড টেস্ট (অগ্নিপরীক্ষা)। সৎ ছেলেরা এবং সৎ মানুষগুলো আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়, তারা কাজের হোক বা না-কাজের হোক, এটা আমাদের একটা বড় অ্যাসেট (সম্পদ)। আবার সকল স্তরের মানুষ থেকে বিপুল সংখ্যায় কর্মী সংগ্রহ করতে পারা চাই — যে কর্মীরা হবে কাজের এবং যোগ্যতাসম্পন্ন।

শক্তি ছাড়া ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না

এখন একটা প্রশ্ন থেকে শুরু হোক। প্রশ্ন এসেছে, আমরা বুঝি বিপ্লব ছাড়া কোনও সমস্যার সমাধান হবে না, বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র রাস্তা, কিন্তু তবু সেই বিপ্লবের জন্য আমি সব কিছু দিয়ে, মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে পারছি না কেন? যেমন প্রশ্ন এসেছে — আমরা এটাও বুঝি আমাদের দল ঠিক, এটাই সঠিক রাস্তা এবং এই দল বাস্তবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জায়গায় যতদিন না আসতে পারবে — এই হুল্লোড়বাজি রাজনীতি, কেরিয়ার সিকিং পলিটিক্স (ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ পূরণ করার রাজনীতি) সে বামপন্থার নামেই হোক বা দক্ষিণপন্থার নামেই হোক, কিংবা কমিউনিজমের ঝাণ্ডা উড়িয়েই হোক বা বিপ্লবের ঝাণ্ডা উড়িয়েই হোক, ততদিন এসবই চলবে। হয় এ-পক্ষের কর্তাগিরি, না হয় ও-পক্ষের কর্তাগিরি চলবে। জনসাধারণের ক্ষেত্রে শুধু অষ্টরম্ভা, কারও কিছু হবে না। এই যে রাজনীতির দুষ্ট চক্র, তা সে কংগ্রেসই ক্ষমতায় যাক আর তথাকথিত কমিউনিস্টরাই যাক, অবস্থা তথৈবচ। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে কর্মীরা বলেছেন যে, আন্দোলনে যদি আমাদের হাতে নেতৃত্ব থাকে, তাহলে আন্দোলনের মোড় ঘুরবে, আন্দোলনের চরিত্র ঘুরবে এবং আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিও ঘুরবে। রাজনৈতিক শক্তি এবং রাজনৈতিক আন্দোলন একটা নতুন মাত্রা পেতে পারে যদি সত্যি সত্যিই আন্দোলনগুলোর নেতৃত্ব বাস্তবে আমাদের হাতে থাকে। চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় আমরা নেতৃত্ব দেওয়ার মত ভূমিকা পালন করছি। আমরা যা বলছি সেগুলো সঠিক, আমরা যা ব্যাখ্যা করছি সেগুলো বাস্তব — সেই অর্থে চিন্তাগত ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা বাস্তবে গড়ে উঠেছে তা কেউ মানুক আর না মানুক। যে কর্মীরা এটা বুঝছেন, তাদের এটাও বুঝতে হবে যে, এই স্বীকৃতিটা আবার দলের শক্তি বেশি না হলে মানুষ সম্পূর্ণভাবে মানে না। মানুষ শক্তি দেখে। এ সম্পর্কে স্ট্যালিনের একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। ওয়ার্কারদের অ্যাড্রেস (ভাষণ দিতে গিয়ে) করে তিনি বলছেন, 'আজকের এই দুনিয়া, পুঁজিবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই দুনিয়া, এমন একটা দুনিয়ায় তোমরা বাস করছ সেখানে হাজার ভাল কথা, ন্যায়নীতির কথা বল, সৎ কথা বল, যত সত্যি কথা বল, সুযুক্তি, সুনীতি, সত্য থিওরি তোমরা বল না কেন, কেউ মানবে না। কাউকে দিয়ে মানাতে পারবে না। কারণ এ দুনিয়ায় ন্যায়কে মেনে নিয়ে চলবার প্রবণতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে অন্যায়ও মানুষ গলাধঃকরণ করতে পারে এবং মেনে নেয়। সহজেই মেনে নেয়, রাগ না করে মেনে নেয় যদি তার পিছনে শক্তি দেখে। কাজেই ন্যায়ের জয় যদি ঘোষণা করতে চাও তাহলে শুধু ন্যায় এবং ঠিক রাস্তা বাতলালেই চলবে না। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ঠিক রাস্তায় বিজয় প্রাপ্তির জন্য শক্তি অর্জন করতে হবে। কারণ পুঁজিপতিরা, শোষক সম্প্রদায়, এমনকি সাধারণ মানুষও শক্তির ভাষাটা সহজে বোঝে। যদিও সাধারণ মানুষকে বোঝাবার ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের শক্তির ভাষায় কথা বললে হবে না। সেটা হবে যুক্তির ভাষা, ন্যায়নীতির ভাষা, তত্ত্বের ভাষা, সিদ্ধান্তের ভাষা। কিন্তু যদি তুমি শক্তি অর্জন না করতে পার, শত্রুপক্ষ তোমার কোনও কথা মেনে নেবে না বা সে

পরাস্ত হবে না। হাজার ভাল কথা বললেও অন্যায়ের শাসন চলতে থাকবে। কাজেই সেই অন্যায়টা পরাস্ত করার জন্য তোমার শক্তির দরকার।'

যে কর্মীটির প্রশ্নের উত্তরে যেটা আমি বলতে গিয়েছিলাম, যে আমরা বুঝি আমাদের দল সামনে না এলে, নেতৃত্বে না এলে ভারতবর্ষের মুক্তি নেই। এটা বুঝতে পারছি খানিকটা পরিবেশ দেখে। আগে বাইরের পরিবেশটা যত কঠিন ছিল, আমাদের কাজ করার পক্ষে যতটা দুরূহ ছিল, এখন বাইরের পরিবেশ অর্থাৎ জনসাধারণের মাঝে পার্টির কাজ করার সেই দুরূহ দুর্লঙ্ঘ বাধাগুলো অত নেই। মানুষ আমাদের কথা শুনতে চায়। কমরেডটি বলতে চেয়েছেন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন বেড়েছে। ছোট হই, বড় হই, এই পার্টিটার প্রতি মানুষের একটা নজর আছে। এমনকি নানা কারণে যারা গালাগালি করে, একটু বিশ্লেষণ করলেই টের পাওয়া যায় তাদেরও ভিতরে ভিতরে পার্টি সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে। এটা কর্মীরাও ফিল (অনুভব) করছেন। সেটাও প্রশ্নের মধ্যে এসেছে যে পরিবেশ বর্তমানে অনেকটা অনুকূল। কী অর্থে অনুকূল? সেটা হল পূর্বের তুলনায় অনুকূল। এই অনুকূল কথাটার মানে এই নয় যে, কাজ করতে শুরু করলেই হু হু করে লোক আসতে থাকবে দলে। এই অনুকূল কথাটার অর্থ হল, নানা কারণে কাজ করার ক্ষেত্রে যে দুর্লঙ্ঘ বাধাগুলো ছিল, জনসাধারণের কাছে যাওয়ার এবং তাদের কথা শোনানোর যে দুর্লঙ্ঘ বাধাগুলো আগে ছিল, তা অনেকটা পাল্টেছে। একটা প্রধান বাধা হিসাবে যেটা ছিল যে, কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে যে ক্রেডিট (সুনাম) সিপিআই, তারপরে সিপিএম এবং তার খানিকটা পরে নকশালরা এনজয় করত (পেতো), সোসাইটিতে (সমাজে) সেটা অনেকাংশে মার খেয়েছে। তারা ডিসক্রেডিটেড (বদনাম) হয়েছে অনেকাংশে। পুরো হয়ে গিয়েছে, সমস্ত মানুষ ওদের সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে গিয়েছে, এগুলো হচ্ছে ঝোঁকের কথা। তারা অনেকখানি এক্সপোজড (স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত) হয়েছে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একজন কমরেড যদি মনে করে তারা সম্পূর্ণ এক্সপোজড হয়ে গিয়েছে, না তা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক, আগে তাদের যে ক্রেডিটটা ছিল সেই ক্রেডিটটা এখন আর সে জায়গায় নেই। আগে মানুষ নিঃসংশয়ে তাদের কমিউনিস্ট বলে মনে করতো, মনে করতো এদের দ্বারাই হবে, এরাই বিপ্লবী। সমাজের মধ্যে তাদের সম্পর্কে এইরকম যে একটা বিশ্বাস ছিল, সেটা আর বর্তমানে সে জায়গায় নেই। মানুষ এখন সিপিআই, সিপিএম ও নকশালদের নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। মানুষের মধ্যে একটা ভাল সেকশন (অংশ), ইফ নট দ্য মেজরিটি অফ দ্য পিপল, বাট এ গুড সেকশন, এন্ড এ লার্জ সেকশন অফ দ্য মাসেস-এর (বেশিরভাগ মানুষ হয়ত নয়, কিন্তু জনগণের মধ্যে একটি ভাল ও বড় অংশের) মধ্যে সিপিএম, সিপিআই তো বটেই, এমনকি নকশালপন্থীদের সম্বন্ধেও সংশয় তৈরি হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন এদেরটা কোনও রাস্তাই নয়, ওটা ভুল রাস্তা এবং এদের দ্বারা কিছু হবে না। ন্যাচারালি (স্বভাবতই) সেই জায়গায় এস ইউ সি আই'র দিকে মানুষের চোখ পড়ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবনা প্রকাশ করছে, আপনারা কবে কি করবেন। আপনারা পারবেন তো? আপনারা এতটুকু পার্টি। হ্যাঁ, আপনাদের প্রতি ভরসা আছে। কিন্তু আপনাদের দ্বারা হবে কি? আর কবে হবে, ততদিনে আমরা মরে সব ভুত হয়ে যাব। আপনারা কবে শক্তি সঞ্চয় করবেন তারপর বিপ্লব হবে! এই রকম একটা মনোভাব একদল মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে। আবার কারও কারও অন্য রকম ভাবনাও আছে। তাদের কথা হল, আপনারা যে কাজ করছেন আপনাদের দেখলে ভাল লাগে, আপনারাই ঠিক, একমাত্র আপনাদের পার্টিটাই এখনও ঠিক আছে, বাকিদের তো সবই দেখলাম। কিন্তু, কিছু হবে না মশাই, এদেশে কিছু হবে না। মানুষগুলোই সব খারাপ হয়ে গেছে। এই যে মানুষের এইসব মনের প্রকাশ, এগুলো কোনওটাই খারাপ লক্ষণ নয়। অথচ যখন অনেক বুঝিয়ে কর্মীটি তার মুখ থেকে শুনল, না না মশাই এদেশে কিছু হবে না, তৎক্ষণাৎ কর্মীটির প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে তিনি কিছু বুঝলেন না। এই কথাটার দ্বারা সেই কর্মীটি এইটুকু ভেবেছিলেন যে, আমি যখন এতক্ষণ বোঝালাম এবং তিনি যখন সিপিএম এর দ্বারা কিছু হবে না বুঝেছেন, সাথে সাথে তিনি কেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন না 'কমরেড আসুন, এইবার আপনার সঙ্গে আমি কাজে নেমে গেলাম।' এইটি না বলে তিনি যখন আবার উল্টো বললেন যে, না মশাই কিছু হবে না, ও কিছু হওয়ার নয়, ও যাই বলুন কিছু হবে না, ও সব অনেক দেখলাম, তখনই কর্মীটি দমে গেল, তাহলে আর কী হবে, এত বোঝালাম, এ তো শুনতেই চাইছে না কোনও কথা। তখন কর্মীটি বলতে শুরু করল — আরে মশাই শুনুন শুনুন;আর তিনি বলছেন — কী শুনব মশাই, আপনারা আর কদিন ধরে রাজনীতি করছেন, আমার বয়স এত হয়ে গেল, আমি অনেক দেখেছি, অনেক পার্টি দেখেছি, মশাই আমার ঐসব দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু সেই কমরেডটি ভাবল না যে, সেই মানুষ যে দুদিন আগে তার সাথে এতগুলো কথাই বলত না, সে অতগুলো কথা আমার কাছে বলছে। আর ওই অতগুলো কথার মধ্যে সে এইটে বলেছে যে, এই পুরনো পার্টিগুলো সম্পর্কে সে মোহমুক্ত। এবং এটাও সে আকারে ইঙ্গিতে বলেছে সে বিশ্বাস করুক আর না করুক, তার মন এস ইউ সি'র দিকে ভিতরে ভিতরে সফ্‌ট (নরম) হচ্ছে। যদিও এখনও সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমরা কিছু করে উঠতে পারব।

এস ইউ সি আই বিরোধী কমন ফ্রন্ট

এই যে দু'টি বিষয় তার কথার থেকে বেরিয়ে এল, এই দুটি জিনিসই একটা মূল্যবান দিক তুলে ধরেছে। বলছে, পেশেন্স (ধৈর্য) নিয়ে ওয়ার্ক কর, পড়ে থেকে কাজ কর, লোকের সাথে মিশতে থাকো, লোকের মধ্যে যেতে থাকো, ফল পাবে। এমনকি এই রকমের উত্তর যে লোকটা দেয়, সেখানে এটাই ইন্ডিকেটিভ (ইঙ্গিতবাহী) যে, সেই মানুষগুলো ভাবছে। আজকে যারা এই ধরনের কথা বলছে, তারাই হয়তো পাঁচ বছর বাদে বা দুবছর বাদে, ঘটনা ও আন্দোলনের ঢেউয়ে এবং আমরা যদি যোগাযোগ না ছাড়ি এবং নিয়ত পরিচর্যা করি, আর নিজেদের আত্মবিশ্বাস না হারাই— এই রকম একটা বিরাট অংশের মানুষ সক্রিয় কর্মী হোক না হোক, দলের সক্রিয় সমর্থককে পরিণত হবে। তারা সেই দিকেই পা বাড়াচ্ছে। এই বাড়াবার রীতিটা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ধাক্কা পাওয়ার ফলে তাদের মানসিক চিন্তায় যে জটিলতা হয়েছে, সেই জটিলতার জন্য এইরকম নানা রূপে তার প্রকাশ হচ্ছে। এক এক জনের এক এক রকমভাবে চিন্তার প্রকাশ ঘটছে। কিন্তু সকলের কথার মধ্যে কী কী পাওয়া গেল? এই যে এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হল — এস ইউ সি সম্বন্ধে কি কোনও একটা উগ্র বিদ্বেষ পেলেন? না, তা পেলেন না। তাহলে, তার জায়গায় কী পেলেন? দেখার চোখ থাকলে অবশ্যই তা নজরে পড়ত। এখন পরিবেশটা কী? সকল দলের কর্মীরা জানেন যে এস ইউ সি আই একটা ছোট পার্টি হলেও এর সম্বন্ধে রাজনৈতিক মহলে একটা অদ্ভুত আলোচনা চলছে। লোকের নজরে পড়ছে যে, প্রত্যেক দলের সঙ্গে প্রত্যেক দলের সংগঠনগত ক্ষেত্রে, রাজনীতিগত ক্ষেত্রে লড়ালড়ি আছে, ঝগড়া আছে। কোথাও সেই ঝগড়া অনেক সময় মারমুখী রূপও নিচ্ছে। কিন্তু এস ইউ সি আই'র কথা উঠলেই এদের সকল দলের মধ্যে একটা কমন ফ্রন্ট হয়ে যায়। কারণ সকলেই যেন তাদের মৃত্যুবাণটি এস ইউ সি আই'র মধ্যে বাই ইনটিউশন (সহজাত গভীর বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে) অ্যান্ড বাই ইনস্টিংক্ট (প্রাণশক্তিতে) দেখতে পায়। তারা ক্লাস ইনস্টিংক্ট (শ্রেণিবোধ) থেকে বোঝে। সেজন্য দেখতে পাবেন, সিপিআই এবং সিপিএম নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে, আর যেই এস ইউ সি আই'র কথা এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুর এক হয়ে গেল। আর এস পি, সিপিএম-এর কখনও কখনও কনফ্লিক্ট (দ্বন্দ্ব) হয়। এতদিন তো এক সঙ্গেই তারা চলেছে, এখন কিছু কিছু বিরোধ হচ্ছে। বর্তমানে এস ইউ সি আই'র সঙ্গে একত্রে তারা সিপিএম'র বিরুদ্ধে লড়ছে। কিন্তু কোথাও যদি আলাদা করে এস ইউ সি আই'র প্রসঙ্গ ওঠে, তাহলে তারা মোর ভোকাল, এ্যান্ড নো লেস ভোকাল দ্যান সিপিএম এগেনস্ট এস ইউ সি আই (সিপিএম-এর থেকে কম নয়, বরং বেশি সোচ্চার এস ইউ সি আই-র বিরুদ্ধে)। সিমিলারলি (একই রকম) ফরওয়ার্ড ব্লক। তাই আমি একসময় একটা মিটিংয়ে অনেক ভেবে নিজের কণ্ঠরোধ করে ছিলাম। মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছিল এই কথাটা — এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি, সকলেই এস ইউ সি আই'র নাম শুনলেই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। এটার দ্বারা কী প্রমাণ হয়? এই যে বিদ্বেষ,

এটার দ্বারা একটা জিনিসই প্রমাণ হয় যে,— হয়, অদ্যাপি এস ইউ সি আই'র মত এতবড় একটা নচ্ছার পার্টি, এমন একটা দুষ্ট পার্টির ভূভারতে এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম হয়নি। এ এমন একটা বাজে পার্টি তা কংগ্রেসই বল, বুর্জোয়া বল, ফ্যাসিস্ট বল, এ কারও মতো নয়। এ সকলের থেকে শয়তান পার্টি। এরা মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় দুশমন। তাই 'মানবসভ্যতার' জন্য নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নানা দলে বিভক্ত হয়ে যে দলগুলো আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছে, তারা সবাই মানব সভ্যতার উদ্বেগে এক-কণ্ঠ হয়ে যায় এস ইউ সি আই'র বিরুদ্ধে। প্রকৃত সত্য হল, এস ইউ সি আই এর মধ্যেই রয়েছে এই সব পার্টিগুলোর মৃত্যুবাণ এবং এটাই হচ্ছে বিপ্লবের একমাত্র শক্তি, যাকে দেখলে সব বিপ্লব বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যে কারণে সকলে একটা কমন ফ্রন্টে এসে এস ইউ সি আই-কে কোণঠাসা করতে চায়, যাতে এস ইউ সি আই সামনে না আসতে পারে।

এই কাগজওয়ালাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের দেশে নেতা তৈরি করে ঐ কাগজওয়ালারা, মনোপলিস্টরা। কাগজে ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে একটা হনুমানকেও এরা নেতা বানিয়ে দিতে পারে। একটা কমপ্লিট (আস্ত) হনুমান — তাকেও এরা নেতা করে দেয়। কাগজে তার ছবি তুলছে, বাণী ছাপছে, বক্তৃতা ছাপছে, কোথায় তিনি কী হাঁচি দিলেন, কোথায় তিনি কী বাণী দিলেন, যদিও সব বোকার মত কথা, তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু কথা যেগুলো বলছে, সেগুলো বড় বড় হরফে ছাপাতে হবে। আর লোকে কাগজে পড়ে আর রেডিওতে শুনে ধরে নিল, ইনিই একজন খুব জাঁদরেল নামজাদা লোক। কিছু না বুঝে, আর না দেখে শুধু কাগজটা পড়ে আর রেডিও শুনে সারা দেশের মানুষ জেনে গেল যে উনি একজন বিরাট নেতা। ব্যাস, নেতা তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে পেপারের মারফৎ বুর্জোয়াদের কৌশল হল নেতা তৈরি করার। একটু লক্ষ্য করুন, বুঝতে পারবেন। ডিএসও কটকে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস কনফারেন্স করল। সিপিএম এবং অন্যরাও সময়ে সময়ে কনফারেন্স করে। সিপিএম-এর বাইরে দিকে থেকে ভাবটা হল যে তারা কংগ্রেসের একটা বিরাট বিপ্লবী প্রতিপক্ষ। এর মানে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধ শক্তি, এমনকি অ্যান্টি কংগ্রেসিজমের প্রতীক। এই কাগজগুলো কখনও যদি আমাদের কারও বক্তৃতা একটু আধটু ছাপল তো সিপিএম'র মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। তারা তখন চিৎকার করতে শুরু করল যে, এগুলো সব পুঁজিপতিদের কাগজ;তারা তো এস ইউ সি'র খবর ছাপবেই। কাগজগুলো যে আমাদের সব পাবলিসিটি দেবে আমরা তা চিন্তাও করি না। কিন্তু ওড়িশার এই কাগজওয়ালাদের বাস্তব ঘটনাটাকে অস্বীকার করতে না পারার ফলে তিন কলম ছবি এবং ব্যানার দিয়ে সমস্ত ওড়িশার কাগজগুলোতে পাবলিসিটি দিতে হল। অমৃতবাজার প্রথম দিন এক কলাম কাগজের পেছনের দিকের পাতায় বা দুলাইন ভিতরের পাতায় খবরটা দেওয়ার একটু চেষ্টা করেছিল। পরে তারা হাওয়া দেখে দু'কলাম ব্যানারে ওড়িশা ইস্যুতে পাবলিশ করল। কিন্তু এই অমৃতবাজার কলকাতার ইস্যুতে (সংস্করণে) একটি খবরও ছাপল না। নবকৃষ্ণ চৌধুরী (গান্ধিবাদী এবং ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) ঠাট্টা করে আমাকে ডেকে বললেন, এখানকার এই কাগজের খবর দেখে মনে করবেন না এরা সব বাইরের কাগজে খবর ছাপিয়েছে। কলকাতায় গিয়ে দেখবেন যে ওরা কোনও খবর দেয়নি, দিল্লিতেও গিয়ে দেখবেন ওরা ছাপেনি। মফঃস্বল ওড়িশা ইস্যুতে দিয়েছে। কারণ ওড়িশার অন্য সব কাগজ মিটিংয়ের খবর ছাপিয়েছে। কটকে শোরগোল পড়ে গেছে। এটার কারণ হল, জার্নালিজম (সাংবাদিকতা) একটা বিতর্কে বা বেকায়দার যাতে পড়ে না যায়, সেজন্য ওড়িশার এডিশনে তারা ছাপাল। অথচ ক্যালকাটা এডিশনে (সংস্করণে) কোনও কাগজে কোনও খবর ছাপল না। এমন তো নয় যে, কলকাতার বাইরে এরকম কোনও কনফারেন্স বা মিটিং হলে কলকাতার প্রেস (সংবাদপত্র) ছাপে না! কাগজগুলো সব পার্টির খবরই ছাপে। কোথায় ফরওয়ার্ড ব্লক দশজনকে নিয়ে একটা কনফারেন্স করল, আরএসপি একটা হলের মধ্যে বিশজনকে নিয়ে কী একটা বৈঠক করল, তারও একটা পাবলিসিটি দিয়ে দেয়। পলিটব্যুরো কোথায় একটা বৈঠক করে কী একটা বাণী দিয়েছে, তার একটা পাবলিসিটি দিয়ে দেয়। আর এই স্টুডেন্টস কনফারেন্সের ম্যামথ গ্যাদারিং (বিশাল জমায়েত) দেখে ওড়িশার কাগজগুলো বলেছে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স (স্বাধীনতার পরে) এতবড় স্টুডেন্টস কনফারেন্স ওড়িশাতে আর হয়নি। তিন হাজার ডেলিগেট এবং বিশ হাজার লোক মিটিংয়ের ওপেন র‍্যালিতে (প্রকাশ্য সমাবেশে) ছিল, তা আবার ওড়িশার কটকের মত জায়গায়! অথচ কলকাতার কাগজগুলোতে কনফারেন্সের কোনও পাবলিসিটি দিল না। এটা কী ইন্ডিকেট (নির্দেশ) করে? একটা জিনিস ইন্ডিকেট করে যে, কান মলে এদের কাছ থেকে যদি খবর আদায় করতে না পারেন, ওরা কাগজে এক লাইনও দেবে না। এইরকম একটা বিরাট গ্যাদারিং বা একটা মুভমেন্ট পার্টি করল, তাকে একেবারে বাইপাস করে (এড়িয়ে) যেতে পারে না। যেমন ওড়িশাতে তারা খবর দিতে বাধ্য হল। যেমন ২৪ এপ্রিলের একটা অতবড় মিটিং, তাকে ডিনাই (অস্বীকার) করতে পারে না। কাজেই দুচার লাইন তাদের দিতে হয়। কাগজের একটা কোণায় দুলাইনের একটা খবর, সেটা আবার খুঁজে বার করতে হয়। ইনটেনশনটা (উদ্দেশ্যটা) কী? না, যেটুকু না দিলে নয়, এস ইউ সি'র ক্ষেত্রে শুধু সেইটুকু দাও। কিন্তু কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে এস ইউ সি কে আগে বাড়তে সাহায্য করো না। এটা হল মালিকপক্ষের নীতি, মনোপলিস্টদের নীতি। সিপিএমের ক্ষেত্রে দেখুন — পার্লামেন্টারি অপোজিশন সৃষ্টি করার জন্য স্টেটসম্যানের মত ঝানু মনোপলিস্টদের (একচেটিয়া পুঁজিপতিদের) কাগজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা অলটারনেটিভ (বিকল্প) সৃষ্টি করার জন্য সিপিএমকে সাধ্যমত পাবলিসিটি দিয়ে যাচ্ছে। স্টেটসম্যান কাগজ যদি খোলেন দেখতে পাবেন যে হেন নিউজ তাদের নেই, ইন্ডিভিজুয়াল (বিশেষ একজনের) স্টেটমেন্ট (বিবৃতি) থেকে শুরু করে কোথায় ছোটখাটো একটা মিটিং, কোন জায়গায় তারা একটা কী করছে যেখানে হয়তো তারা একটা টোকেন (ক্ষুদ্র) পার্টনার (অংশীদার), সেখানেও তাদের সমস্ত বক্তব্য দিয়ে কনটিনিউয়াসলি (ক্রমাগত) সিপিএমকে ব্যাক (মদত দিয়ে চলেছে) করে চলেছে। ইনটেনশন হচ্ছে — অ্যাজ এগেনস্ট কংগ্রেস স্বতন্ত্র পার্টি দাঁড়ালো না, জনসংঘ অল ইন্ডিয়াতে এখনও সেরকম নেই, সিপিআই কংগ্রেসের সাথে চলে গিয়েছে, এস পি একটা ভাঙা দল;আর সিপিএম বাংলা, কেরালা, ত্রিপুরায় আছে, কাজেই তাকে ব্যাক করে করে স্টেটসম্যান এবং অন্যান্য কাগজগুলো কংগ্রেসের অলটারনেটিভ হিসাবে, একটা অপোজিশন (বিরোধী) হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা অবিরাম চালাচ্ছে। কাগজওয়ালারা যে নেতা তৈরি করে— এটা ঠিক কথা। আমাদের তারা পাবলিসিটি দেয় না, এটাও ঠিক কথা। তা সত্ত্বেও পার্টি এগোচ্ছে এবং এগোবে আদর্শের শক্তিতে।

এখন অন্য প্রশ্নগুলিতে যাই। একজন কর্মী প্রশ্ন করেছেন যে, বিপ্লব ছাড়া মুক্তি হবে না জানি, কিন্তু তবু কেন নিজেকে পার্টির কাজে ঢেলে দিতে পারি না। আরেকজনের প্রশ্ন — আমাদের এই দলটিকে কেউ সাহায্য করবে না, অথচ আমরা বুঝছি এই দলটির শক্তিবৃদ্ধি না হলে যত আন্দোলনই যুবকরা করুক, মজুররা করুক, চাষিরা করুক, বারবার মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে, দেশের মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন হবে না, বামপন্থী আন্দোলনের চেহারাও পাল্টাবে না, বিপ্লব তো দূরের কথা। এসব আমরা বুঝি। কিন্তু বুঝেও আমরা তো সেই ইনিশিয়েটিভ (উদ্যোগ) নিয়ে কাজ করতে পারি না। তার প্রশ্ন, কেন সে কাজ করতে পারছে না।

এখানে কমরেডদের বোঝার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। আমি কেন কাজ করতে পারছি না, এটা একজন ব্যক্তির প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু একটা সাংগঠনিক প্রশ্ন নয়। ইন্ডিভিজুয়াল (ব্যক্তি বিশেষের) প্রশ্নের একটা ইন্ডিভিজুয়াল (ব্যক্তিগত) উত্তর আছে ঠিকই। সেই ইনডিভিজুয়ালের (ব্যক্তির) প্রবলেমটা বুঝে সেটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হ'ল যিনি বা যাঁরা প্রশ্নটি করছেন তাঁরা কি পরিস্থিতি যথার্থ বোঝেন? যেমন কমরেডরা রিপোর্ট করে, জনসাধারণের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে। এখন এনভায়রনমেন্ট (পরিবেশ) খুব অনুকূল। আবার যখন একটা কাজের প্রোগ্রাম সাকসেসফুলি (কর্মসূচী সফলভাবে) ক্যারি করতে (এগিয়ে নিয়ে যেতে) পারছে না, তখন এসে বলে ও কাউকে বোঝানো যায় না, লোককে কত বলি, কিছুতেই বোঝানো যায় না, কেউ শুনতেই চায় না। কথাগুলো কনট্রাডিক্টরি (পরস্পর বিরোধী)! যখন কাজের কথা নেই, পাবলিক সম্বন্ধে তখন রিপোর্ট করছেন যে পরিবেশ অনুকূল,

আমাদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুব ভাল। সাধারণ মানুষ আমাদের কথা শুনতে চায়। আর যেই কাজের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে, কাজটা কেন করতে পারল না, তখন কাজটা না করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করছে কিছুতেই লোকে শুনতে চায় না। তাহলে ঠিকমত বোঝা হলে এই কথাগুলো কী ইন্ডিকেট করছে? ইন্ডিকেট করছে এই যে, লোকের মনের মধ্যে আমাদের কথা শোনবার মনটা তৈরি হয়েছে, অথচ ট্র্যানজিশনাল (উত্তরণের) ফেজে (পর্যায়ে) তারা এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেসপন্স করার (সাড়া দেওয়ার) মত স্টেজে (অবস্থায়) আসেনি। এইসব দলগুলি সম্বন্ধে কিছুটা হলেও মোহমুক্তি ঘটেছে, তাদের পুরনো অ্যাটাচমেন্ট (সুসম্পর্ক) অনেকখানি কেটেছে। আমাদের দিকে তাদের আকৃষ্ট হওয়ার মত মানসিক গঠন এবং মানসিকতা ডেভেলাপ করেছে (তৈরি হয়েছে)। অথচ তারা এখুনি সম্পূর্ণভাবে কাজে এগিয়ে আসার স্তরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে না। ফলে আমাদের একদল কর্মীদের ব্যস্ততায় চাপাচাপিতে এক্ষুণি যেহেতু তারা তাদের কাছ থেকে কিছু কাজ চাইছে, তা সে যে ফর্মেই হোক — পাঁচটা টাকা দিন, দশটা কাগজ রাখুন, এই কাগজটা পড়ুন, তখন তাদের কাছে রেসপন্সটা (সাড়া) ঠিকমত না পেলে, তাদের বোঝাতে না পারলে, তাদের দিয়ে সেইগুলো ঠিকমতো করাতে না পারলে, সঙ্গে সঙ্গে সেইসব কর্মী মনে করছে যে লোকগুলোকে বোঝানো যাচ্ছে না। তারা বুঝতে পারছে না, এই ঘটনাটাকে কীভাবে বিচার করতে হবে। এই বিষয়টার মধ্যে আমরা দুটো জিনিস পাচ্ছি। একটা বিষয় হল কর্মীর ক্ষমতার প্রশ্ন, আর একটা হল লোকের মানসিকতা যে স্তরে রয়েছে সেই স্তরের প্রশ্ন। এই দুটি জিনিসের মধ্যে কর্মীর ক্ষমতাটা যদি খুব প্রবলভাবে বাড়ে তবে সেই স্তর থেকে লোককে দ্রুত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে আসতে পারা যায়। আর যদি কর্মীর স্তরটা, ক্ষমতার জোরটা কম থাকে তাহলে সেটা বেশি বেগ দেবে এবং সময় বেশি লাগবে। এইটুকু মাত্র তফাৎ। কিন্তু এখানে হতাশার সুযোগ কোথায়?

বিপ্লব ছাড়া মুক্তি হবে না এই কথাটার মানে কী

কাজেই যে কমরেডরা বলছে আমরা বুঝি, আমি তাদের উল্টে প্রশ্ন করতে চাইছি — আপনারা কি সত্যিই বোঝেন? এই যে কথাটা বললেন তার ফেস ভ্যালু যা, ওপর ওপর যা মানে — বিপ্লব ছাড়া মুক্তি হবে না, এই কথাটা বলছেন, শুনছেন, কিন্তু হ্যাভ ইউ রিয়েলাইজড (উপলব্ধি) ইট? আপনি সত্যিই কি বোঝেন এই কথাটার মানে কী? এই কথাটার মানে কি শুধু বুদ্ধি দিয়ে, শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব? আপনি কি জানেন — এই কথাটার যথার্থ মানে বোঝা শুরু হয় যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বোঝার পর জনতার আন্দোলনে নিজেকে সামিল করা এবং পার্টি পরিচালনার যথার্থ দায়িত্বে নিজেকে যুক্ত করার পর। সেই কাজ করা যখন থেকে শুরু হয় আসলে যথার্থভাবে বোঝাটাও শুরু হয় তখন থেকে। তার আগে পর্যন্ত তা থাকে বুদ্ধির লেভেলে (স্তরে) শুধু যুক্তি করার জন্য, ওকে বোঝা বলে না এবং সে বোঝাটাও হয় এককেজনের একেক রকম। যেহেতু প্রত্যেকটি কর্মীর চেতনার মান একরকম নয়, মানসিক গঠন একরকম নয়, বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা হুবহু একরকম নয়, সেহেতু সকল কর্মীর এই একই কথা বোঝাটা এক স্তরেরও নয়। একই কথা আমিও বুঝি, সেই কথাটাই আর একটি কমরেডও বোঝেন। এই যে দু-জনের বোঝা তা একরকম হবে না। এটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এবং যারা প্রশ্ন করেছেন তারাও মানেন যে সকলের বোঝাটা এক স্তরের নয়। এই কারণেই একস্তরের নয় যে, প্রত্যেকের মানসিক গঠন, শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা এগুলো এক ধরনের নয়। আবার এই প্রশ্ন করার মধ্যেও একটা মারাত্মক গলদের দিক রয়েছে। এই কথাটা যথার্থভাবে বুঝলে প্রশ্নটা এভাবে আসত না, অন্যভাবে আসত। যে প্রশ্নটা আসত সেটা এই রকম যে, আমরা যেভাবে কাজ করি সেই কর্মরীতিটা কীভাবে আরও উন্নত করা যায়। কিন্তু প্রশ্নটা সেভাবে আসেনি। প্রশ্নটা এসেছে — আমি সেভাবে বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করতে পারি না, বা আমরা বুঝি এই দলটার দ্বারাই বিপ্লব হবে, আমাদেরই নেতৃত্বে যেতে হবে; কিন্তু তবুও আমরা তেমনভাবে জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার প্রেরণা পাচ্ছি না। এই ধরনের প্রশ্ন ইন্ডিকেট করে যে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার স্তরটাও আপনাদের ভাল নয়।

আমাদের জীবনের যথার্থ প্রয়োজন কী

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের জীবনের যথার্থ প্রয়োজন কী অর্থাৎ নেসেসিটি কী? আর যথার্থ নেসিসিটি না বুঝলে আপনাদের এই যে বোঝার স্তর তাও উন্নত হবে না। নেসেসিটির সঠিক উপলব্ধিই হল স্বাধীনতা। সমস্ত গতিধারায় নিহিত নিয়ম গতিকে কোন দিকে নির্দেশিত করছে, সেটা বোঝাই হল নেসেসিটির যথার্থ উপলব্ধি। এই নেসেসিটির উপলব্ধি এইরকম নয় যে আমি মনে করলাম আমার এটা প্রয়োজন এবং এটা যে প্রয়োজন এটা আমি খুব ভাল বুঝি। এর মানে আমি যে নেসেসিটি সম্বন্ধে সচেতন, তা নয়। ফ্রিডম (স্বাধীনতা, মুক্তি) হচ্ছে হেগেলের ভাষায় — রেকগনিশন অফ নেসেসিটি (প্রয়োজনের স্বীকৃতি)। মার্কসবাদীরাও হেগেলের ফ্রিডম সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নেয়। এটার সঙ্গে মার্কসবাদের সিদ্ধান্তের কোনও মতভেদ নেই, শুধু হেগেলের চিন্তায় যে আইডিয়ালিস্টিক ফিলজফিক্যাল ট্রেন্ড (ভাববাদী দর্শনের ঝোঁক) আছে তার থেকে মুক্ত করে বোঝা দরকার। সেটা অন্য আলোচনা, আরও বিস্তৃত আলোচনা, সে আলোচনা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখতে হবে, নেসেসিটির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা এবং পেরে সচেতনভাবে সেই অনুযায়ী ক্রিয়া করতে পারার নামই ফ্রিডম অর্জন করা। যখন সেই প্রক্রিয়াটা বুঝে সেই প্রক্রিয়াতে সচেতনভাবে আমি ক্রিয়া করি এবং সংগ্রাম করি — তখনই আমি ফ্রিডম অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করছি বলা চলে। তার আগে পর্যন্ত আমার ফ্রিডম সম্পর্কে ধারণা হল আত্মপ্রতারণা বা সেল্ফ ডিসেপশন বা প্র্যাগম্যাটিক কনসেপ্ট অফ নেসেসিটি, যেটা সোজা কথায় হল সুবিধাবাদ। সে হতে পারে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ অথবা রাজনীতিগত সুবিধাবাদ। প্র্যাগম্যাটিক নেসেসিটি হল, মার্কসবাদ যে নেসেসিটির অনুসন্ধান করতে বলে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মার্কসবাদ যখন নেসেসিটির কথা বলে, তখন সে বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রক্রিয়া এবং নিয়ম, তার গতিধারা লক্ষ্য করতে বলে। বস্তুর বিকাশে, জীবন বিকাশে, সমাজ বিকাশে বস্তুর গতিধারায় কী কী নিয়ম এবং তার গতিধারা কোনদিকে, তা যথার্থ নিরূপণ করতে পারলেই নেসেসিটি সম্পর্কে আমাদের যথার্থ বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি ঘটল বা ধারণার যথার্থ উপলব্ধি ঘটল। কিন্তু চরিত্রে, ক্রিয়ায় আমরা ফ্রিডম অর্জন করলাম তখন, যখন সেই প্রক্রিয়ায় আমরা সচেতনভাবে ক্রিয়া করতে এবং সংগ্রাম করতে সক্ষম। তখনই আমরা অ্যাকচুয়ালি (যথার্থই) ফ্রিডম কথাটার মানে বুঝলাম। তার আগে আমরা ফ্রিডম কথাটা বলছি, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে, কিন্তু তার যথার্থ মানে বুঝিনি।

মার্কসবাদের বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নানা বিষয় নিয়ে এর আগে যত আলোচনা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আপনারা শুনেছেন যে, জ্ঞান ক্রিয়া-বিচ্যুত নয়। যখন জ্ঞান সত্যকে প্রতিফলিত করে তখন সে জ্ঞান ক্রিয়াশীল হয়, ক্রিয়াধর্মী হয়। অর্থাৎ তখনই তা হল যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞান যেখানে যথার্থ সত্যকে প্রতিফলিত করে না, তখন সে অহমের জন্ম দেয়, পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্ম দেয়। সে তখন অকাজ করে, সমাজের বুকে সে বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। সে নানা বিপদ এবং বিপত্তির সৃষ্টি করে। রাজনীতিতে এবং ফিলজফিতে যার জন্য স্কলাস্টিসিজম (পাণ্ডিত্যাভিমান), সিউডো (মেকি) ইন্টেলেকচুয়ালিজম (পণ্ডিতি), অ্যাকাডেমিক ট্রেন্ড (পুঁথিগত বিদ্যা) — এইগুলোকে খুব নিন্দা করা হয়। কারণ বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে জীবনবেদকে রূপায়িত করার বাস্তব প্রক্রিয়া। এখানে ভাববিলাসিতার স্থান নেই, এখানে অকাজের স্থান নেই। স্কলাস্টিসিজম এই অকাজ করে। সিউডো ইন্টেলেকচুয়ালিজম, অ্যাকাডেমিক আউটলুক (দৃষ্টিভঙ্গি) — এই অকাজগুলি নানা দিক থেকে ক্ষতিসাধন করে বলেই সমস্ত বিপ্লবীদের বারবার বলতে হয়েছে — জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যাভিমান এক জিনিস নয়। ইন্টেলেকচুয়ালিজম আর জ্ঞান এক জিনিস নয়। স্কলাস্টিসিজম আর বিপ্লব সম্পর্কে সত্য ধারণা এবং জ্ঞানের আলোকে তা প্রতিভাত হওয়া এক জিনিস নয় — তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। শ্রেণিগত দিক থেকে এবং তার কার্যকারিতার দিক থেকেও তা বিপরীতধর্মী। যেমন লেনিন ভীষণভাবে এমপিরিসিস্টদের (অভিজ্ঞতাবাদীদের) বিরুদ্ধে ছিলেন।

সাধারণ অর্থে যাকে আমরা জ্ঞান বলি — খবর রাখা, বলতে পারা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছুকে দেখা, এমপিরিসিস্টরা মূলত তাই করে। কত খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম জিনিস তারা অনুসন্ধান করে করে নানা ঘটনা উপস্থাপনা করে। কী বিরাট পরিশ্রমের কাজ এই এমপিরিসিস্টরা করে। কিন্তু তবুও লেনিনকে এই এমপিরিসিস্টদের বিটারলি (কঠোরভাবে) সমালোচনা করতে হয়েছিল। তার কারণ দ্যাট স্টুড ইন দ্য ওয়ে অ্যাজ এ স্টাম্বলিং ব্লক টু রেভোলিউশনারি আইডিয়া (তা বিপ্লবী আদর্শের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল)। সত্য ধারণা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে রিলিজ করা (কাজের জোয়ার সৃষ্টি করা), ক্রিয়াধর্মী জ্ঞান যা সমাজ পরিবর্তন, বস্তুর পরিবর্তন, কার্যক্ষেত্রে সমস্ত গতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে, এমপিরিসিস্টরা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে উপকার করার চেয়ে তারা অপকারই করে। জ্ঞান যখন বাধার সৃষ্টি করে তখন তাকে কুজ্ঞান বলে। এমনিতেও তো বাংলায় সুজ্ঞান ও কুজ্ঞান বলে দুটো কথা আছে। কুজ্ঞান অর্থে যদি জ্ঞান বল তো তাকে কুজ্ঞান বলা উচিত। আপনি কী জানলেন, কী বলতে পারলেন, কী লিখতে পারলেন এবং সে সম্বন্ধে হেগেল কী বলেছেন, এ সম্বন্ধে মার্কস কী বলেছেন, এ সম্বন্ধে অমুকে কী বলেছে, আর এই ফ্রিডম সংক্রান্ত বহু মনীষীর ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি আপনার মুখস্থ থাকতে পারে, কিন্তু ফ্রিডম তত্ত্বের যথার্থ মানে ততক্ষণ আপনার বোঝাই হল না, নেসেসিটির যথার্থ উপলব্ধি ততক্ষণ আপনার হয়নি, যতক্ষণ না নেসেসিটি বলতে আপনি যেটা বুঝেছেন সেই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সংগ্রামে নিয়োজিত হচ্ছেন। আর এই সংগ্রাম করার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে ফ্রিডমের উপলব্ধি আপনার মধ্যে প্রস্ফুটিত এবং প্রোজ্জ্বল হতে থাকে। যতক্ষণ আপনি এই সংগ্রামের মধ্যে নেই, ততক্ষণ আপনার বোঝা ভাসাভাসা থাকে এবং বোঝার মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। তারপরও যদি আপনি বলেন যা যুক্তিসঙ্গত এবং যা উচিত বলে মনে করি তার জন্য আমি কাজ করতে পারি না; যা অন্যায়, দুষ্ট, আমার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করি তা আমি আঁকড়ে ধরেই থাকি;তা হলে আমি কি নিজেকে মনুষ্য পদবাচ্য র‍্যাশনাল বিইং (বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব) ভাবতে পারি?

আপনারা কি এই কথাটার মানে বোঝেন যে, ইউ কানট ফাইট ফর ইওর ওন ফ্রিডম উইদাউট ফাইটিং ফর দ্য ফ্রিডম অফ আদারস (অন্যের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম না করলে নিজের স্বাধীনতার জন্য আপনি লড়তে পারেন না)। আগেও বহু ক্লাসে একথা আপনাদের বলেছি — এই ফ্রিডম কথাটা বুঝতে হবে কীভাবে? বুঝতে হবে — তুমি যদি নিজে বিকাশলাভ করতে চাও, সমাজ বিকাশের জন্য তোমার যদি উদ্বেগ এবং আকাঙ্খা থাকে, সংস্কৃতিসম্পন্ন, রুচিসম্পন্ন, শালীনতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপন করতে যথার্থই যদি তুমি চাও এবং মর্যাদা সম্পর্কে তোমার যদি কোনও ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, মর্যাদা মানে টাকাপয়সা, মর্যাদা মানে আইসিএস অফিসার হওয়া, মর্যাদা মানে হাইকোর্টের জজ হওয়া, মর্যাদা মানে মিনিস্টার হওয়া, চিফ মিনিস্টার হওয়া, মর্যাদা মানে অ্যামবাসাডার (রাষ্ট্রদূত) হওয়া এবং গাড়িবাড়ি থাকা; লোকে আমাকে স্যার স্যার বলবে, এইরকম তোমার যদি ভাবনা না থাকে, মর্যাদা কথাটার যথার্থ উপলব্ধি যদি তোমার থাকে তাহলে এ সমাজে তার একটাই মানে। সেটা হচ্ছে, দ্য ওনলি ওয়ে টু লিড ইওর লাইফ ইন অ্যান অনারেবল ওয়ে ইজ টু এনগেজ ইওরসেলভস কনস্ট্যান্টলি ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস (মর্যাদামায় জীবন যাপনের একমাত্র রাস্তা হল জনগণের জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের অবিরত নিযুক্ত রাখা)। ইনজাস্টিসের (অন্যায়ের) বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং তাকে নিয়ে লড়াই করা এবং এই লড়াই সংগঠিত করার কাজে এবং সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়েই কেবল তুমি মর্যাদা এবং ডিগনিটিসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারো। বাকি সমস্ত রাস্তা হল সেল্ফ ডিসেপশন (আত্মপ্রতারণা), মর্যাদার নয় — অহম মাত্র। কারণ এ সমাজে ওয়াগন ব্রেকারের টাকায় সম্পত্তি করলেও মর্যাদা মেলে, ফুলের মালা মেলে। ডাকাতি-গুণ্ডামির পয়সায় টাকা-কড়ি হলে তারও কদর হয়। তারপরে সে এমএলএ, এমপি হয়, আর তা হয় পয়সার জোরে। তারপরে সে মিনিস্টার হয়। তারপরে তিনি বাণী দিতে থাকেন। তা তিনি যদি এসব ঠুনকো মর্যাদায় আত্মসন্তুষ্টি পান তাহলে ফ্রিডম নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার কী?

প্রকৃত মর্যাদা কাকে বলে

কেউ ভাবতে পারে, আমি একটু লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হব, এটা হলো অনারেবল ওয়ে (সম্মানজনক)। কিন্তু ডাক্তার হলেও তো হবে না। কারণ এই সমাজে ডাক্তার যদি এথিক্স অফ মেডিকেল সায়েন্স কে আপহোল্ড করে (নিয়ে চলে), ডাক্তারের নোবল লাইফ লিড করতে (মহৎ জীবন নিয়ে চলতে) চায়, তাহলে হয়ত কখনও কখনও তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। তার দ্বারা হয়ত প্র্যাক্টিসও তেমন হবে না এবং সে নামও করতে পারবে না এবং টাকাপয়সাও তার হবে না। কেউ হয়ত তাকে ব্যাক (মদত) করবে না। সে একটা পাগল বলে গণ্য হবে। সর্বস্তরে তার রীতিনীতি, নৈতিকতা, মেডিকেল এথিক্স নিয়ে সংঘর্ষ হবে। ফলে সে কিছুই করতে পারবে না। তাহলে মেডিকেল এথিক্স বা বিজ্ঞানের যে এথিক্স, একজন বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার বা কেমিস্ট হোক বা ফিজিক্সের ছাত্র হোক, তার কোনও কিছু পরোয়া না করে, হোয়াট ইজ দ্য এথিক্স অফ সায়েন্স — তার পরোয়া না করে তিনি যদি নিজেকে গোলাম, চাকুরিজীবীতে পর্যবসিত করেন, পয়সার বিনিময়ে টাটার কাছে, না হয় বিড়লার কাছে, না হয় কোনও ফার্মের কাছে, না হয় গভর্নমেন্টের কাছে, নিজের বিবেক বিক্রি করেন, হ্যাঁ তাহলে তার পয়সা হবে, নাম হবে। এই তো? কিন্তু সে যদি ভাবে যে না না, আমি তো ওয়াগন ব্রেক করে বা রেস খেলে বা গুণ্ডাদল তৈরি করে টাকা করে তো নাম করিনি, আমি ডাক্তারি করে নাম করেছি, ফাঁকি দিয়ে নয়। কিন্তু তুমি কি জানো যে শুধু ডাক্তারি করে তুমি নাম করোনি। ডাক্তারির সঙ্গে তুমি গোলামি করেছ, তোষামোদি করেছ। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে গোলামি করেছ, তোষামোদি করেছ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছ। মানব সভ্যতার চরম দুশমনদের কুকার্যগুলোকে চুপ করে থেকে হজম করেছ। তাদের কাছে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিকিয়ে দিয়েছ। তবে তুমি পয়সা করেছ। এর নাম কি মর্যাদা? এই মর্যাদার জন্য সিদ্ধার্থবাবুর দল দৌড়চ্ছে, অন্য দলগুলো দৌড়চ্ছে।পৃথিবীতে দু-দল মানুষ আছে। একদল মানুষ ঠুনকো মর্যাদার জন্য দৌড়তে থাকে। আরেক দল মর্যাদা বলতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস মনে করে। মনে করে বিবেকের দংশন কী করতে বলে, মনে করে সত্যিকারের প্রগতি আছে সেখানেই যেখানে সমাজের অগ্রগতি নিহিত রয়েছে, যে অগ্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষকে তার কূপমন্ডূকতা, দুর্বলতা, লোভ, ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করা এবং সেই রাস্তায় মাথা উঁচু করে সংগ্রাম করা। সমাজকে শোষণমূলক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া, অবিরাম সমাজের পরিবর্তন আনা। আর সমাজের এই পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং তার বিকাশের রাস্তা খুলে দেওয়া।

আজ সমাজের সমস্ত পরিবেশটা হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমি তো একটা মানুষ বা সোস্যাল বিইং! আমি সচেতন শুভবুদ্ধি নিয়ে ঘরে বাইরে, সমাজে, চাকরির ক্ষেত্রে, সর্বত্র এই যে বিরুদ্ধ পরিবেশ তাতে আমি ঠিক থাকতে পারি না। কারণ, এই সমাজের উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আমাকে বাঁচতে হবে। আর এই বাঁচার দুটো রাস্তা আছে। একটা হল এই অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, প্রতিবাদ করা, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে না খেয়ে মরলেও মাথা উঁচু করে চলা। আর না হয়, লেখাপড়া শিখে শিক্ষার অভিমান নিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলামি করা, মাথাটাকে বিকিয়ে দেওয়া। এই উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যায় ব্যবস্থার সাথে এই যুক্তি সেই যুক্তি খাড়া করে গোলামির পক্ষে ওকালতি করা। অন্যদিকে এই পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে এগোতে শুরু করল সে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তু গ্রহণ করতে শিখবে। তার কিছু চাওয়ার আকাঙ্খা থাকবে না।

আর একটা বিষয়ও বুঝতে হবে, এই সমাজে স্নেহ-মমতার বন্ধন কী শুধু পরিবারের মধ্যেই রয়েছে? জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিডম কথাটার যথার্থ মানে বুঝলে সে বুঝতো, কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে রয়েছে আমার হৃদয়ের কারবার। ঘরের পাঁচজন লোক চোখের জল ফেলবে বলে সত্য পথে আমি পা

বাড়াতে পারলাম না — এর নাম কি স্নেহ-মমতাকে স্বীকার করলাম? না। স্নেহ-মমতা আর দুর্বলতা এক জিনিস নয়। স্নেহ-মমতা তো মানুষকে দুর্বল হতে বলে না। কাপুরুষতা মানুষকে দুর্বল হতে বলে। স্নেহ-মমতার সাথে কোনও বিরোধ নেই বিপ্লবের। কিন্তু স্নেহ-মমতা আমাকে দুর্বল হতে বললে আমি দুর্বল হব কেন? মমতা আছে বলে আমি দুর্বল হব কেন? মমতা আছে বলে আমি বিবেক ছাড়ব কেন? মমতা আছে বলে আমি সত্য পথ পরিত্যাগ করব কেন? এইগুলো যার গোলমাল হয় না, তার তো এরকম প্রশ্ন মনের মধ্যে আসতে পারে না। আর এই ধরনের প্রশ্নে গোলমাল বা হবে কেন? গোলমাল হয় তার যে এসব প্রশ্ন ভাল করে বোঝে না, পরিষ্কার করে বোঝে না। নতুন নতুন কর্মীরা এসব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করল — কোথায় যাব, কোথায় থাকব? তার মানে কী? সে এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থাকার জায়গা দেখতে পায় না। তার মানে দে হ্যাভ নট লার্নড টু ওয়ার্ক উইথ দ্য মাসেস (তারা জনগণের সঙ্গে থেকে কাজ করতে শেখেনি)। সেইজন্যই বলছি যে, জ্ঞান ক্রিয়াধর্মী হয় তখন, যখন ফ্রিডম সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান আমাকে প্রথমেই জনসাধারণকে সংগঠিত করার মধ্যে নিয়ে যায়,পার্টি সংগঠন গড়ার মধ্যে নিয়ে যায়। আই লিভ ইন দ্য পার্টি, আই লিভ উইথ দ্য মাসেস, অ্যামঙ্গ দ্য মাসেস (আমি দলের মধ্যে থাকি, জনগণের সঙ্গে থাকি, জনগণের মাঝে থাকি)। এ জায়গায় আমার বিরোধ হচ্ছে না। খাওয়া, না-খাওয়া, চলা-বসা, দুঃখ-কষ্ট সবই এভাবে ভাবতে শিখি। ফলে একদল এক সম্পর্ক ভেঙে আর এক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরিবারের পাঁচটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গিয়েছে, পাঁচশো লোকের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তা আরও গভীর, আরও মমতায় ভরপুর, আরও রসপূর্ণ। এই তো বিপ্লবীর জীবন। যে এটা বোঝে তার তো এসব প্রশ্ন ওঠার জায়গাই নেই।

জ্ঞানের যথার্থ রূপ কী

আমার এই কথাগুলো শুনলেও বোঝা হবে না, যদি না এইটুকু প্রথম বুঝি যে জ্ঞান ক্রিয়াধর্মী। এর যথার্থ মানে আমাকে প্রতিদিন তিলে তিলে বুঝতে হবে। তাছাড়া বোঝার আর কোনও রাস্তা নেই। এইটে যদি তুমি শুরু না করে থাকো, কিংবা শুরু করেই যদি তুমি ফল ভাবতে শুরু কর, তাতে তোমার এক ছটাকও বোঝা হবে না। তুমি কি ফলের জন্য একাজে এসেছো? না, বিবেকের দংশনের জন্য এই কাজে এগিয়ে এসেছো। এই কাজটা তোমার জীবনধর্ম। এই হল জ্ঞানের যথার্থ রূপ। কোনও বিপ্লবী শুরুতেই এভাবে ভাবে না যে আমি জিতবোই। জিতবার প্রচন্ড ইচ্ছা নিয়ে সে শুরু করে। কিন্তু, এই ভুল ধারণা তার কোথাও নেই যে আমি জিতবোই সেই জন্য শুরু করেছি, আর আমি যদি জিততে না পারি তবে আমার শুরু করার কোনও মানে নেই। সে জানে এই শুরু করাটাই তার একমাত্র রাস্তা। আর এই রাস্তায় বিপ্লবীর হাজার একটা ফেইলিওর (ব্যর্থতা) ঘটে। আর এটা ঘটে বলেই একদিন বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। মাও সে তুং ঠিক এই কথাটাকেই এভাবে বলেছেন, — 'অল দ্য রেভলিউশনারি স্ট্রাগলস এভরিহোয়ার স্টার্ট উইথ ফেইলিওর, এগেইন মিট উইথ ফেইলিওর, এগেইন মিট উইথ ফেইলিওর, অ্যান্ড আলটিমেটলি উইন ভিকট্রি' (সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রাম সর্বত্র ব্যর্থতা দিয়েই শুরু হয়, একটার পর একটা ব্যর্থতা মোকাবিলা করতে করতেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়) — এই তো বিপ্লবের রাস্তা! বিপ্লবটা জেতার মধ্য দিয়ে কোথাও শুরুই হয় না। আমি দু-চার বছর জনসাধারণের মধ্যে ঘুরছি, বোঝাচ্ছি, কত কিছু করছি, তা সত্ত্বেও কাউকে রিক্রুট করতে পারলাম না। তখন ভাবতে শুরু করলাম, তাহলে আর কী হবে! এখানে আর কিছু হবে না। তাহলে যখন আর কিছু হবে না তখন ঘরে গিয়েই বা কী হবে — এ প্রশ্নটি তো করোনি নিজেকে। বিপ্লবের ময়দানে থেকে প্রশ্ন করছো, এতো করছি কিছু হচ্ছে না, তাহলে কী হবে? তুমি কি মরে গিয়েছ? মরে তো যাওনি। তা হলে? কী হবে ভেবে নিয়ে চুপি চুপি ঘরে গিয়ে ঢুকছো, আর না হয়, কী আর হবে — এইরকম ভেবে চুপ করে গিয়ে বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হচ্ছো। কই, এটা তো প্রশ্ন করছো না যে ঘরে গিয়ে কী হবে? এখানে যেমন হচ্ছে না, তো ওখানে গিয়ে কী স্বর্গবাস হবে? নাকি, যৌন তাড়নাই ঐদিকে পুশ করছে। তাহলে সেটাই বলো। না খেয়ে থাকতে পারি না, চাকরিটা না হলে কষ্ট স্বীকার করতে পারছি না, তাহলে সেটাই সরাসরি বলো। নিজেকে-কি প্রশ্ন করেছ? এইভাবে নিজেকে সরাসরি প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে বৈকি। উত্তরের জন্য আমার কাছে এতদূর আসার দরকার নেই। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলবে। এ তো সোজা প্রশ্ন। তুমি জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে যখনই ফল পাচ্ছো না, ভাবছো তাহলে আর কী হবে, কাজে আর উৎসাহ পাচ্ছি না। উৎসাহ পাচ্ছো না বলে কী বসে আছো? না। উৎসাহ পাচ্ছো না বলে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরির বন্দোবস্ত করার জন্য জুতোর সুকতলা খসাতে আরম্ভ করেছো। সেখানে তো উৎসাহের অভাব নেই। কিছুই করছো না তা তো নয়। ঘরে ঢুকছো গিয়ে। কেন ঘরে গিয়ে ঢুকছো? সেখানে তো প্রশ্ন করছো না যে কেন এটা ভাল লাগছে না। উল্টো'টাই তো হওয়ার কথা। জনতার মধ্যে থাকতে ভাল লাগে না — এ কথার অর্থ কী? এ কথার অর্থ, ঐ কথাগুলি ভাল করে বোঝা হয়নি যে রেকগনিশন অফ নেসেসিটি ইজ ফ্রিডম। নেসেসিটি ঠিকমতো অনুধাবন করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কারণ, সে সম্বন্ধে সচেতনতা আমার নেই। অথবা আমি তেমন ধরনের মানুষ নই যে মানুষ বিবেকের আবেদনে, যুক্তি এবং নীতির আবেদনে কাজ করে। তার মনের মধ্যে যত কল্পনা আর উল্টোপাল্টা ভাবনা যাই আসুক না কেন, কাজ সে নীতির অনুশাসনে করে, বিবেকের অনুশাসনে করে এবং বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা করে। সে অযৌক্তিক আচরণ করে না। হ্যাঁ, হতে পারে মনের মধ্যে হয়তো অনেক অযৌক্তিক ভাবনা ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়, আর জন্ম নেয় বলেই তো আমি তার ডিমান্ড (দাবি) অনুযায়ী বা তার চাপে পড়ে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারি না। সেটা পারে সেই মানুষ যে মানুষের নীতির অনুশাসন নেই, যে মানুষ বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয় না, যে মানুষ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। কিন্তু সে মানুষ না কি? মানুষকে আমরা কি বলি? মানুষকে আমরা বলি র‍্যাশনাল বিইং — অর্থাৎ অ্যানিমাল (প্রাণী) উইথ র‍্যাশনালিটি। তাই র‍্যাশনালিটি মাইনাস হলে (বিচারবুদ্ধি না থাকলে) আমি তো অ্যানিমাল (জন্তু)। আমি টেরিলিনের জামা কাপড় পরি, আমি টাই পরি, আমি সিনেমা দেখি, আমি গান গাই, আমি ইংরেজিতে কবিতা লিখি, আমি গভর্নমেন্ট অফিসে কাজ করি বা দুখানা বই লিখেছি— এগুলো করি বলে কি আমি ভারচুয়ালি (কার্যত) অ্যানিমালের মত হতে পারি না? আমি ভারচুয়ালি অ্যানিমাল না ম্যান তার তো একটিই বড় প্রমাণ যে, আমি যুক্তি, বিবেকের অনুশাসন এবং নীতির দ্বারা পরিচালিত হই কি হই না। আর তো কোনও মাপকাঠি নেই। ইজ দেয়ার এনি আদার ইয়ার্ডস্টিক (অন্যকোন মাপকাঠি কি আছে) যে আমি ম্যান না অ্যানিমাল তা ডিটারমিন (নির্ধারণ) করা যায়? আমি ইমপালসের (প্রবৃত্তি) দ্বারা চলি, আমার যুক্তি আমাকে চালায় না, আমার বুদ্ধি আমাকে পরিচালিত করে না, তাহলে তো আমার সবই পশুর মতো। তা হলে আমি মানুষ কিসে? মানুষ তো জন্তুজগৎ থেকে এই জায়গাতেই আলাদা যে সে চিন্তা করবার অধিকারী এবং তার বুদ্ধি আছে। আর এই চিন্তা এবং বুদ্ধির দ্বারা সে তার আদর্শ, নীতিনৈতিকতা, রাস্তা সমস্ত গড়ে তুলে বিরুদ্ধ পরিবেশ এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে ফাইট (লড়াই) করে। এই প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করা, তাকে কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) করা এবং মানব প্রগতির কাজে তাকে লাগাবার জন্যই তো মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। এই পথেই তো মানুষ নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ, মূল্যবোধ এগুলো গড়ে তুলেছে। তা আমি যদি সেটা করতে না পারি তাহলে আমি মানুষটা কিসে? এ তো বেসিক কোশ্চেন (মৌলিক প্রশ্ন)।

আমাকে গুলি করে মারা যাবে কিন্তু কেনা যাবে না

এই যে এখানে যাঁরা বসে আছেন আমার কিছু সহকর্মী, তাঁরা অতীতের অনেক কথা জানেন। আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স হল, প্রথম যখন এই দল শুরু হয়, কি ছিল আমাদের? কিছুই ছিল না। টাকা নেই, পয়সা নেই, লোকজন নেই, থাকার জায়গা নেই, কেউ চেনে না, জানে না। আর আমাদেরও বয়স বা তখন কত? আমি তখন কোয়াইট ইয়াং, অল্প বয়সের একটি যুবক। সে বলছে ভারতবর্ষে সত্যিকারের কোনও বিপ্লবী দল নেই, দল গঠন করতে হবে। অনেকেই

যুক্তি-টুক্তি শুনে বলছে, হ্যাঁ, এটা তো করা উচিত, যুক্তিগুলো তো ভালই। কিন্তু এ একটা পাগলের মতো কথা। একটা দল করা কি সোজা কথা নাকি? এতগুলো বড় বড় দল রয়েছে, তারাই সব ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, কত কী কাণ্ড হচ্ছে। আর যাদের কেউ চেনে না, জানে না, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক নেই, নাম করা নেতা নেই, প্রেস পাবলিসিটি (খবর কাগজের প্রচার) নেই তারা কী করবে? কিছু বললেই লোকে ঠাট্টা করত, হাসত, বাঙাল ভাষায় বলতো — দেখ, বলা নাই, কওয়া নাই, কি সব পোলাপান হইছে আমাগো দ্যাশে, কি সব পাগল পোলা হইছে দেখো দিহি। এরা দল গঠন করবে! এ অসম্ভব ব্যাপার! এ হতে পারে না। পার্টি গড়া কি একটা সহজ কথা? এসব অবাস্তব কল্পনা, ও সব হবে না। হ্যাঁ আপনি যা বলছেন তা ঠিক, কিন্তু কিছু হবে না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেশি তর্ক করিনি। আমি তাদের উত্তর করেছি পাল্টা। হ্যাঁ হবে না মেনে নিলাম। তর্কের মধ্যে না গিয়ে একেবারে সোজা মেনে নিলাম, হ্যাঁ কিছু হবে না তো বুঝলাম, কিছু করতে পারব না। তাহলে, কী করতে হবে বলুন? গোলামি করব? দালালি করতে হবে? বিবেক বিক্রি করতে হবে? যা বুঝেছি তা না করে অন্যরকম আচরণ করতে হবে? আমি পারব না। আমার কথা ছিল, তোমরা যারা পারবে তারা আমার সঙ্গে থাকো, আর যারা পারবে না সরে পড়। বিকজ ইফ আই ডাই স্টার্ভিং ইন দ্য স্ট্রিট, আই স্যাল ডাই উইথ অনার রেইজিং মাই হেড হাই (কারণ, যদি খেতে না পেয়ে রাস্তায় আমি মারাও যাই, আমি মাথা উঁচু করে মরব)। আমি যেদিন রাস্তায় না খেয়ে মরব, সেদিনও আমি যেকোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব। যে কোনও অন্যায়কারী মানুষের গালে দরকার হলে চড় বসিয়ে দিতে পারব, আমার হাত কাঁপবে না। কারণ আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না। হোয়াট এলস ক্যান আই ডু (এ ছাড়া আমি কি করতে পারি)? আমি তো দালালি করতে পারব না।

আমার এত সব বুঝেই তো বিপদ হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমার কোনওই অসুবিধা ছিল না। আমার বাবারও কোনও অসুবিধা ছিল না, মারও অসুবিধা ছিল না। কারণ তারা ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতির বিয়ে দিয়েছে, ঘর সংসার করেছে, পুজোআচ্চা করেছে, কালীবাড়ি গিয়েছে, সেখানে বারবার মাথা ঠুকে প্রণাম করেছে, বাবা সর্বসময় ভাবছেন, এই বুঝি স্বর্গের রথ সুর সুর করে নেমে এল এবং তিনি স্বর্গে গিয়ে আমাদের জন্য বসে থাকবেন। এ তাঁর পক্ষে কত সুবিধে। কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমি বুঝে ফেলেছি মানুষ কথাটার মানে কী, মানুষের মূল্যবোধ কী, সত্যিকারের মর্যাদা কী। আর এই দেশে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে সেই মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য কী। আমি তো জেনেছি যে, ভারতবর্ষের এই সমাজটার পরিবর্তন না হলে আমরা কেউ বাঁচব না। আমি বাঁচব না, আমার বিবেক বাঁচবে না, নীতিনৈতিকতা বাঁচবে না, সংস্কৃতি বাঁচবে না, চরিত্র বাঁচবে না, কোনও কিছু বাঁচবে না। আমি যদি একটা সুখের সংসার গড়বার চেষ্টা করি সেই পরিবারের ভিতরেই দুষ্টশক্তি ঢুকে আমার স্নেহের সন্তানটিকে নষ্ট করে দেবে। সেটি কোনও ফিল্ম স্টারের চ্যালা হবে, নাকি ওয়াগন ব্রেকারের দলে নাম লেখাবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সেটি কী করবে না করবে কেউ বলতে পারবে না। প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাকে গড়ে তুলবো সে বিট্রে (বিশ্বাসঘাতকতা) করে চলে যাবে। সে পয়সার জন্য কোনও কিছু পরোয়া করবে না। আজকের সমাজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে যদি ভালবাসাকে বাঁচাতে হয়, নীতিনৈতিকতাকে বাঁচাতে হয়, স্নেহপ্রীতিকে বাঁচাতে হয়, দায়িত্ববোধকে ও কর্তব্যবোধকে বাঁচাতে হয়, মানুষকে বড় করতে হয়, নিজেকেও যদি বড় হতে হয়, আমার স্নেহের পাত্রপাত্রীগুলিকে যদি বড় করে গড়ে তুলতে হয় বিপ্লবের রাস্তা খুলে দিতে হবে। বিপ্লবের জন্য লড়াই করা ছাড়া এর আর কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই। এটা আমি বুঝে ফেলেছি। আমি কেন এরকম বুঝলাম তা নিয়ে রাগ করব কার ওপর? আমি কি নিজের চুল ছিঁড়ব যে এরকম বুঝলাম কেন? এ নিয়ে তো কারও সাথে আরগুমেন্ট (তর্কবিতর্ক) করা যায় না যে, তুমি বোঝোনি, আমি বুঝলাম কেন? আর বুঝলাম বলেই তো আমার বিপদ হয়ে গিয়েছে। এখন আমার সামনে দুটি রাস্তা খোলা আছে। হয় নিজেকে অধঃপতিত করা, নিজের বিবেক বিক্রি করা; আর না হয়, লড়াই করা। এই লড়াইয়ে আমি জিতব কি হারব, সে ইতিহাস বলবে। কিন্তু আমি যা সত্য বলে মনে করি, ভারতবর্ষে নতুন করে একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে না পারলে মানুষের মুক্তি আসবে না, তা সে হাজার মানুষ কোরবানি করুক, লক্ষ লক্ষ ছেলে রক্ত ঢেলে দিক, সব বিপথে চলে যাবে। তাই যথার্থ বিপ্লবী দল চাই, যথার্থ আদর্শ চাই।

ফলে আমি কী করব? যেহেতু দল গঠন করতে পারব না, যেহেতু এই দলটা গড়ে তুলতে পারব কী না তার ঠিক নেই, তাহলে নিজেকে যা হয় করে বুঝিয়ে আবার ঐ সিপিআইতে গিয়ে ঢুকব? না কি, সিপিআই কে শুধরে নেবো? তাহলে তো ভাবতাম — হ্যাঁ, ওই দলটাই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি, ওটাই সঠিক দল, দলটার ভিতরে কিছু ত্রুটি আছে, ওকে শোধরানো যাবে। আমি তো তা বুঝিনি। আমি বুঝে ফেলেছি যে ও দলটাকে শুধরে বা সংশোধন করে কমিউনিস্ট পার্টি করা যাবে না। আর যতদিন যাবে, তত ওর পচা গন্ধ বেরোতে থাকবে। তিরিশ বছর আগে তো এর দুর্গন্ধ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তিরিশ বছর আগে আমি বুঝেছিলাম যে, যতদিন যাবে তত এর দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে। এ পার্টি সংশোধিত হতে পারে না। কারণ, অন্য কোনও ক্লাস পার্টি ওয়ার্কিং ক্লাস পার্টিতে ট্রান্সফর্মড (পরিবর্তিত) হতে পারে না। ওয়ার্কিং ক্লাস পার্টির গঠন পদ্ধতি, এর চিন্তাধারা, এর মেথডলজি (পদ্ধতি), সমস্ত কিছু আমাকে নিঃসংশয়ে বলছে যে, এ পার্টিটা হল পেটি বুর্জোয়া পার্টি; সে কমিউনিস্ট পার্টির নামে চলছে, ফলে এ শুধু সর্বনাশই করবে। মানুষের কমিউনিজমের প্রতি যে শ্রদ্ধা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মোহ তাকে আপন দিকে টেনে রাখবে এবং নিজের দুষ্কর্মের দ্বারা শেষ পর্যন্ত কমিউনিজমকেই লোকচক্ষে হেয় করবে, মার্কসবাদকেই হেয় করবে। ফলে, এর দ্বারা হবে না। তোমরা যদি এরই ওপর নির্ভর কর, একেই সংশোধন করে ভারতবর্ষে বিপ্লব করার কথা ভাবো, সেটা মিথ্যা রাস্তা। আমি তো এ রাস্তাটাকে ভুল বলে মনে করি। আমি তো বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে বিপ্লব ছাড়া মুক্তি অর্জনের আর কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই। কিন্তু বিপ্লব আপনাআপনি হবে না। বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী আদর্শ, তত্ত্ব, বিপ্লবের রাস্তা, প্রোগ্রাম এবং বিপ্লবী দলকে সেনাপতির মতো উপস্থিত থাকা দরকার। তা হলে সে দল গঠন করবে কে? যে বুঝলো, তারই ওপর তো দায়িত্ব এসে বর্তালো। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আইডিয়ার (চিন্তা-ভাবনার) যে সংঘাত চলছে সেই সংঘাতের ফলে কেন আমার মধ্যে এসে এই চিন্তাটা বর্তালো এর জন্য আমি কার ওপর রাগ করব? কারও ওপর রাগ করা তো চলে না। তাই আমি তাদের একটিই প্রশ্ন করেছিলাম। কী করতে হবে বলো। হ্যাঁ, হবে না, বুঝেছি। কিন্তু দালালি করতে হবে? আমি পারব না। এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি জানি আমাকে হয়তো না খেয়ে মরতে হবে। একটা লোক না খেয়ে মরছে কি না তার খবরটাও কেউ নিতে আসবে না। কিন্তু কি করব? ভাববো যে এ আমার অক্ষমতা। অক্ষমতার লজ্জা একরকম, আর বিবেক বিকিয়ে দেওয়াটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। আমি পারিনি কিন্তু কোনও অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াইনি। সাধ্যমত আমি লড়েছি, কিন্তু পারিনি। না খেয়ে মরেই গেলাম শুধু, কিছু করতে পারলাম না। কিন্তু কোনও কিছু বিফলে যায় না। সকল বিপ্লবীই জানে ঐ যে সে না খেয়ে নিঃশেষে মরে গেল, পাঁচটা লোকের মধ্যে, পঞ্চাশ-একশোটা লোকের মধ্যে শুধু বলে গেল যে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ ও দল ছাড়া কিছু হবে না, এটা ব্যর্থ হয় না, ব্যর্থ হতে পারে না।

জনগণকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করার মধ্য দিয়েই বিপ্লবের তত্ত্ব বোঝা শুরু হয়

তাই আপনারা যেসব প্রশ্ন করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এই কথাগুলো এমন করে আপনাদের বোঝা হয়নি। যদি ঠিকমত বুঝতেন, তাহলে প্রতিদিন ভ্যান ভ্যান করার মতো এসব প্রশ্ন করতেন না। এ এমন একটা জটিল তত্ত্বেরও ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হওয়া প্রয়োজন তত্ত্বগত, কলাকৌশলগত এবং সংগ্রামগত। আমি যে মানুষের মধ্যে থেকে লড়বো, এই লড়াইয়ের কলাকৌশলটা কত উন্নত করা যায় এবং তার রাস্তাটা আরও কত ধারালো করা যায় এই নিয়ে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে আমাকে কীভাবে আরও কত তীক্ষ্ণ তরবারির মত তৈরি হতে হবে, এইটি হচ্ছে আমার তত্ত্বগত আলোচনার বিষয়। এইভাবে বুঝলে আমি

কেন করতে পারছি না, এটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে নাকি? এটা বিশেষ একজনের ব্যক্তিগত সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম (মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা) হতে পারে। এমনও হতে পারে, একজন ব্যক্তির বিপ্লব সংক্রান্ত ধ্যানধারণা গড়ে ওঠেনি, তৎসত্ত্বেও বিপ্লবের অনেক কথা তার ভাল লাগে। সেটাও কিন্তু দরকার। এমন ব্যক্তিদের আমরা বলব — আপনার ভাল লাগুক, আপনি আমাকে সমর্থন করুন, তারও অনেক মূল্য। দলকে সমর্থন করছেন, সেটারও অনেক মূল্য। কিন্তু বিপ্লবী কর্মীর, যে বিপ্লবী হতে চাইলো তার তো প্রশ্নের রূপ এরকম হতে পারে না। সে সঙ্গে সঙ্গেই এই কথাটা বুঝবে যে, আমি রেভলিউশনারি, যতটুকু বুঝলাম তা নিয়েই যদি আমি সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তাদের অর্গানাইজ করি, তাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা থাকি; তাহলে তখন থেকেই আমার বিপ্লবের তত্ত্ব বোঝা শুরু হয় মাত্র।

তাহলে বুঝতে পারছেন আমি কি আনসার করছি (বলছি)। আমি এটাই বলছি যে, এই বিষয় বা দিকটি থিওরেটিক্যালি, পলিটিক্যালি এবং ফিলজফিক্যালি যেমনভাবে বোঝা দরকার, বোঝাই যাচ্ছে তেমন করে বোঝা হচ্ছে না। একইসঙ্গে অবশ্য এই কথাও সত্য, এই বোঝাও জীবনভোর শেষ হয় না। আজ যা বুঝবেন, সে বোঝাও এক জায়গায় থেমে থাকে না। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যখন চল্লিশ বছর আগে বা তিরিশ বছর আগে বুঝেছি তখনও তার ঐ তিনটি মূল সূত্র বুঝেছি। বুঝেছি সব কিছুই বস্তু, বস্তু দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে বস্তুতান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা বস্তুজগৎ আলোড়িত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। বুঝেছি ঈশ্বর নেই, অতিপ্রাকৃত সত্তা নেই, এই সবগুলোই ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে একরকমভাবে বুঝতাম। সেই বোঝা নিয়ে তখন কাজ শুরু হয়েছে। তখনও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি মূলসূত্র বুঝতাম বলে মনে করতাম, এখনও বুঝি বলে মনে করি। সেই বোঝাটা কি একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? তখন যা বুঝতাম, আর এখন সেই একই কথাগুলোর যে মানে বুঝি, তা এক না কি? না, অতি অবশ্যই এক নয়। তাই আপনি এখন যা বুঝলেন তার ভিত্তিতে যদি বাস্তবে জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রামে আপনি নেতৃত্ব দিতে আত্মনিয়োগ করেন, পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন এবং সেইটেই আপনার জীবন হয়, শুরুতেই সম্পূর্ণ জীবন না হলেও, আপনার বোঝার স্তর কি এক জায়গায় থাকবে?

এই দিক থেকে বিপ্লবের সামগ্রিক উপলব্ধি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কথা আপনাদের বলব। বিপ্লবের প্রতি আমার দায়িত্ববোধ, এই আবেদনে সাড়া দিয়ে যদি সংসারের ছোট ছোট দায়িত্বগুলো বা আর পাঁচটা স্নেহ-প্রীতিভাজনদের প্রতি যে দায়িত্ব তা যদি আমি পালন করতে না পারি তাহলে সেটা অন্যায় নয়। মনে রাখতে হবে সমাজের কোনও কিছু দায়িত্ব পালন না করে ব্যক্তিস্বার্থে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যখন আমি আরেকটা কর্তব্যের আবেদন অস্বীকার করি তখন তা হয় অন্যায়। কিন্তু একটা বৃহত্তর মানবিক স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে সাড়া দিতে গিয়ে যদি একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বা একটা মমতাময় সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কোথাও রাখতে না পারি, তাহলে তাতে কোনও অন্যায় নেই। এটা গোলমাল হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। এ বারবার আলোচনা করে ফয়সালা করার বিষয় নাকি! এতো জীবন দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয়। তার রাস্তা কি খালি আলাপ আলোচনা নাকি? তার প্রধান ভিত্তি হল টু এনগেজ ইওরসেল্ফ ইন অ্যাক্টিভ স্ট্রাগল অফ দি মাসেস ফর জাস্টিস এগেইনস্ট ইনজাস্টিস; টু কনস্ট্যান্টলি মুভ উইথ দ্য মাসেস, রিমেইন অ্যামাঙ্গ দ্য মাসেস (এর ভিত্তি হল - অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখা, সর্বক্ষণ জনগণের মধ্যে থাকা) — এই হচ্ছে এ বিষয়ে বুনিয়াদী কথা। আরেকটা খুব জরুরি কথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে। শুধু জনগণের মধ্যে থাকলেই হবে না। জনগণের মধ্যে থাকা মানে ভিড়ের মধ্যে একজন হিসাবে নয়, আর রুটিনমাফিক কাজ নয়;থাকার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, নেতৃত্বকারী ভূমিকা, সৃজনশীল কাজ, তবেই বোঝার স্তরটা উন্নত হতে থাকবে। আবার কাজেরও বিভিন্ন প্রকৃতি থাকে। বিপ্লবের হাজার এক রকমের কাজ, পার্টির হাজার এক রকমের টুকিটাকি কাজ থাকে। কোনও একটা কাজ আলাদা করে দেখলে হয়ত মনে হতে পারে এটা অত্যন্ত ইনসিগনিফিক্যান্ট (অকিঞ্চিৎকর)। আবার মনে রাখতে হবে সেই কাজটি বাদ দিয়ে বিপ্লবের এই বিশাল কর্মকাণ্ডটি গড়ে উঠতে পারে না, বিপ্লবও সাধিত হতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মনে হতে পারে তা অতি ক্ষুদ্র কাজ, না করলেও চলে। সেই জন্য সকল কাজেরই গুরুত্ব আছে। আবার স্থান, কাল ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব নিরূপণ করতে হয়। এর বিচার করাও একটা সমস্যা। সেই সমস্যা নিরসন করতে হয়। কিন্তু রিজলভ করা সেইখানেই খুব ভাল হয়, যেখানে প্রতিটি কর্মীর কর্মের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্যোগ আছে এবং সৃজনশীল ক্ষমতা আছে।

পার্টি ও মাস ফ্রন্টের মধ্যে সংঘাত

দেখা যায় পার্টি থেকে সরাসরি অথবা কোনও একটা মাস ফ্রন্ট থেকে একটা প্রোগ্রাম এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল পার্টি প্রোগ্রামের সাথে মাস ফ্রন্টের প্রোগ্রামের কনফ্লিক্ট (সংঘাত)। যেখানে তা নেই, সেখানে দেখা যায় কর্মীর উদ্যোগ এবং সৃজনশীল ক্ষমতার একান্ত অভাব; সেখানে দুটি রুটিন প্রোগ্রামের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন দলেরই দুটি এগজিকিউটিভের কেউই একে অপরকে সাহায্য করতে পারে না। পরস্পর নিজের জায়গাটায় অনড় থেকে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতন লড়াই করে। অথচ দুজনেই দায়িত্বশীল কমরেড। কিন্তু দুজনের লড়াই দেখলে মনে হবে এরা কমরেড নয়, কেউ কারও জমি থেকে এক ইঞ্চি নড়বে না। একজন বলছেন এটা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা আগে করতে হবে। আবার আর একজন বলছেন পার্টির জন্যই তো মাস অর্গানাইজেশন (গণসংগঠন), এটা যদি না থাকে তো পার্টিইতো দুর্বল হবে। পার্টির নেতা বলছেন, গোল্লায় যাক মাস অর্গানাইজেশন (গণসংগঠন), সবার আগে পার্টি। কারণ, কমরেড জি এস বলেছেন, পার্টির স্বার্থের কাছে সব গৌণ। ব্যাস, হয়ে গেল! ফলে এই দুটি কমরেড না পারলো বোঝাতে, আর না পারলো মেনে নিতে। অথচ তারা জানে পার্টির স্বার্থের কাছে সব গৌণ। তার মনে হচ্ছে পার্টির স্বার্থটাই আলটিমেটলি (শেষ পর্যন্ত) মার খাচ্ছে। এর ফলে কী হচ্ছে? তাদের মনের মধ্যে খচখচ করছে। কেউই কারোর মত কিছুতেই মানতে পারছে না। এই যে ষাঁড়ের লড়াই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুজন একজিকিউটিভ হেড-এর (কার্যবাহী পদাধিকারী) মধ্যে হয়। সেটা যে কারণে হয় তার প্রধান দুর্বলতার দিক হচ্ছে, এগজিকিউটিভরা একটা সমস্যার সামনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজে কী চাই, নিজে কী ডিরেকশন (নির্দেশ) দিয়েছিলাম, সেটা কেন হয়নি, এইটার কৈফিয়ৎ বা এইটার ওপর বক্তব্য বলবার আগে প্রবলেমটা কী অ্যারাইজ করল (দেখা দিল) সেটা বোঝার চেষ্টা করে না। অপর পক্ষ থেকে প্রশ্নটা তোলার ফলে প্রবলেমটা কী অ্যারাইজ করল সেইটে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার। তারপরে পার্টির নেতা আর এই ফ্রন্টের নেতারা বসে ফয়সালা করে তর্কবিতর্ক করতে করতে যখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল — ততদিনে ঐ কর্মীটি যে উৎসাহ ও আবেগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, তা থিতিয়ে জল হয়ে গেল। তার মানে যে প্রপার টাইমে (সঠিক সময়ে) যতটা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে সেটা ইমিডিয়েটলি (তখনই) রিজলভ (মিমাংসা) করে নেওয়া দরকার ছিল, তা না করে সেটা অযথা অফিসিয়াল (আনুষ্ঠানিক) করে ফেললো। অফিসিয়াল না হলে কি কোনও আলোচনা চলে না? একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করেছে, দুজনে মিলে যদি নন-অফিসিয়ালি বসে সলভ (সমাধান) করে নিতে পারি তার জন্য তো এত লড়াই করার প্রশ্ন ওঠে না। হাউ টু সলভ ইট, এটাই তো প্রশ্ন। অলওয়েজ ইট ইজ নট নেসেসারি টু ব্রিং ইট টু দ্য লেভেল অফ অফিসিয়াল ডিসকাশন (সবসময় আনুষ্ঠানিক স্তরে এই আলোচনার প্রয়োজন নেই)। অফিসিয়াল ডিসকাশনটা এসব ক্ষেত্রে যত কম হয় তত মঙ্গল। যে কোনও ব্যাপারে অফিসিয়াল ডিসকাশনটা ইন্ডিকেট করে যে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং প্রবলেম অ্যাপ্রোচ করবার (সমস্যা বোঝার) জন্য যে ইলাস্টিক মাইন্ড (নমনীয় মন), ক্রিয়েটিভ

মাইন্ড (সৃজনশীল মন) দরকার সেটা খুব ল্যাক করছে (অভাব আছে)। যে লিডারদের ছোটখাটো জিনিসে অফিসিয়াল ডিসকাশন (আলোচনা) করতে হয়, কমিটিতে বসে ডিসকাস করতে হয়, নইলে ফয়সালা হয় না — তার দ্বারা কি প্রমাণ হয়, প্রবলেম সল্‌ভ করা সম্পর্কে নেতারা মনোযোগী? নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সৃজনশীলতার সাথে বোঝবার চেষ্টা করলেই, সে অপরের দিকটা ভাল করে বুঝতে পারবে।

মনে রাখবেন, পার্টির কর্মক্ষেত্র দুটো — একটা পার্টির নিজস্ব প্রাত্যহিক রুটিন কাজ, আর একটা মাস ফ্রন্টের কাজ। এক্ষেত্রে যা দেখি, হামেশাই একটা ভুল পুটিং (উপস্থাপনা) হয়। পুটিংটা এইভাবে করা হয়, আমি পার্টি ওয়ার্কে আছি, ও আছে ফ্রন্টাল ওয়ার্কে। যেকোনও একটা মাস অর্গানাইজেশনের কতগুলো নিজস্ব প্রোগ্রাম থাকে। তেমনি পার্টিরও কতগুলো রুটিন কাজ থাকে। কিন্তু দুটোই পার্টির কাজ। দুটো ক্ষেত্রেই ওভারঅল (সামগ্রিক) নেতৃত্বটা পার্টির। ওভারঅল দায়িত্বটাও পার্টির। এই যে দুটো কাজই পার্টির দায়িত্ব — ফ্রন্টের মধ্যে পার্টির একজিকিউটিভরা যারা আছে তারা যদি এটা না ভোলে, আর পার্টির কাজে যে এগজিকিউটিভরা আছেন তারাও যদি না ভোলে, তাহলে কাজ অনেক সহজ হয়। পার্টির এগজিকিউটিভ যদি মনে করে এটা পার্টির কাজ, এটাকে সামাল দেওয়া আমার দায়িত্ব। আর আরেক দল এগজিকিউটিভ যারা ফ্রন্টের দায়িত্বে আছে তারা মনে করে এটা ফ্রন্টের কাজ, এটা সামাল দেওয়া আমার দায়িত্ব। সেও একরকম করে বোঝে যে পার্টির স্বার্থেই তো আমি ফ্রন্টের দায়িত্ব পালন করছি, কাজেই এটা আমার সামাল দেওয়ার দায়িত্ব। তারা বোঝে না যে সকল কাজের ওভারঅল কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব রয়েছে পার্টির ওপর এবং দুটোই পার্টি ওয়ার্ক। কিন্তু দুটোরই কর্মক্ষেত্র আলাদা বলে কতগুলো আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম রয়েছে। এইরকম বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিরোধ প্রতিনিয়ত এসে দেখা দেয়। এসব জিনিস এগজিকিউটিভরা সহজে সমাধান করলে কাজেরও অনেক গতি বাড়ে, অহেতুক ডাম্পিং হয় (জমে যায়) না। কতকগুলো সমস্যা থাকে, যেগুলো সমাধানের জন্য কমিটিতে না বসলে চলে না। সেসব বিষয় নিয়ে কমিটিতে বসতেই হবে। কিন্তু প্রতিদিন টুকিটাকি নানা রকমের কাজে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন (মতপার্থক্য) দেখা দেয় বা বোঝাবুঝির কিছু গণ্ডগোল দেখা দেয়। এই যে প্রাত্যহিক ফ্রন্টের কাজ চালানো এবং পার্টির কাজ চালানো, এই দুটো ক্ষেত্রে যেখানে দ্বন্দ্ব এসে দেখা দেয়, আর তার প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়ে যদি কমিটিতে বসতে হয়, তাহলে তো রোজ কমিটি মিটিং করতে হয়। আবার রোজ তো আর কমিটি মিটিং হতে পারে না, কাজ থাকে। ন্যাচারালি কী হয়, সেগুলো পড়ে থাকে। আর এসব টুকিটাকি বিষয় মীমাংসা না হওয়ার ফলে কাজ মার খায়। একটা ডিফারেন্স হয়েছে, পার্টি এগজিকিউটিভ এগ্রি করেনি (একমত হয়নি) , অথচ ফ্রন্ট সে কাজটা করতে চাইছে। তাহলে, এর মীমাংসার জন্য কি কমিটিকে বসতে হবে? আর কমিটি যখন সঙ্গে সঙ্গে বসতে পারবে না, ফলে পড়ে রইল সাত দিন। সাত দিন বাদে কমিটি মিটিং হবে, ততদিন ইনঅ্যাকশন — অর্থাৎ কোনও কাজই হল না। টু এলিমিনেট দিজ থিংস (এ সমস্ত দূর করতে), জেনারেল টেন্ডেন্সি (সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি) হবে, যে কোনও পলিসি মেকিং (নীতি নির্ধারণ করা সংক্রান্ত) বিষয় কমিটিতে বসে সলভ করতে হবে, সেক্ষেত্রে কমিটিকে বাইপাস (এড়িয়ে) করে কিছু সেটলড (নিষ্পত্তি) হবে না। কিন্তু প্রাত্যহিক কাজকর্মে বহু সময় বহু সমস্যা এসে দেখা দেয়, যেগুলো কমিটি লেভেলে সেটল করার জন্য ফেলে না রেখে কনসার্নড অথরিটির (সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের) সঙ্গে, এমনকি একটা তাৎক্ষণিক অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট (পদ্ধতি মাফিক বৈঠক) করে নিয়ে বসে আলোচনা করে সলভ করতে হয়। কাজকে যদি মেকানিক্যালি অবজারভ করা হয় (যান্ত্রিকভাবে দেখা হয়) তো কী হয়, যেমন কমিটিতে হয়তো বসার ব্যাপার নয়, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারিকে (জেলা সম্পাদককে) একটু জিজ্ঞাসা করে নেওয়া দরকার বা পিসি সেক্রেটারিকে (রাজ্য সম্পাদককে) জিজ্ঞাসা করা দরকার, অথবা ইউনিট ইনচার্জকে (আঞ্চলিক সম্পাদককে) জিজ্ঞাসা করা দরকার, না জিজ্ঞাসা করলে একটু খটকা লাগছে, তাদের একটা মতামত নিতে হবে। — জিজ্ঞাসা করা হল, অমনি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি হোক, ইউনিট ইনচার্জ হোক বা পিসি সেক্রেটারি হোক সে সঙ্গে সঙ্গে নোটবুকের পাতা উল্টোতে লাগল। উল্টে দেখলো আজ তার সময় নেই, কালও নেই, পরশু অনেকগুলো কাজ, তরশু পারা যাবে না;মঙ্গলবার দিন সে সময় বার করতে পারে। ঠিক হল মঙ্গলবার তার সঙ্গে অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে। মঙ্গলবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার পর সে জিনিসটা বুঝে নেবে, তারপর সে কাজটায় হাত দেবে, ততদিন তার কাজ পড়ে রইল। আমি বলছি, এইসব টুকিটাকি কাজের বিষয় নিয়ে, যেগুলো পলিসি মেকিংয়ের (নীতি নির্ধারণের) বিষয় নয়, তার জন্য অফিসিয়াল সিটিং, কমিটি মিটিং — এইসব অকার্যকরী কথা মাথার মধ্যে ঢোকে কী করে! অমনি এ-কথাটাই এসে গেল যে, কমিটির তাহলে কার্যকারিতা কি। কমিটির মিটিং করে সব সিদ্ধান্তই অফিসিয়ালি নেওয়া হবে, এটা কোথাও বলা হয় কি? আমার মুখ্য কথা হচ্ছে কাজটা যেন বসে না থাকে। আন্ডারস্ট্যান্ড ইট (এটা বুঝুন)। এই যে মীমাংসার জন্য একটা আলোচনার কথা যখন উঠল আমি তখন হাজার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখছি। হাজারটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সত্ত্বেও আমি রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি তো, আমি ইন বিটুইন অ্যাপয়েন্টমেন্টস (বিভিন্ন নির্ধারিত কাজের মাঝে) দুটো হাসিঠাট্টা করি তো, কথাবার্তা বলি তো বা একজনকে কি করছ, কেমন আছ বা দু-চারটে কথা বলি তো। সে সময়টাতে আমি তার কথাটা শুনে তার জিজ্ঞাসার মীমাংসা তো করে দিতে পারি; নাকি, আই শুড মেক ইট অ্যান অফিসিয়াল ডিসকাশন?

রুটিন মাফিক কাজ নয়, সৃজনশীল কাজ চাই

মনে রাখতে হবে কোনও বিষয় নিছক মুখস্ত করলে বোঝা হবে না। মুখস্থ করারও অন্য বিপত্তি আছে। যেমন পার্টি বলেছে যে, আগে অপরের গুণ থেকে শুরু কর, তারপর নিজের ত্রুটির দিকে আসবে। মুখস্থ করে এভাবে বুঝলে কী দাঁড়ায়? আগে অপরের গুণ থেকে বা নিজের দোষ থেকে শুরু কর বলে আরম্ভ করলো যে আমার এই এই দোষ আছে কমরেড। আমি জানি আপনার এই এই গুণ আছে কাজেই আমি আপনার গুণ থেকেই শুরু করলাম, আর শুরু করেই বলছি, কমরেড এবার আমার কথাটা আপনার মানা উচিত। কারণ আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি, আমার এই এই দোষ আছে, আপনার এই এই গুণ আছে। এইরকম মেক্যানিক্যাল, যান্ত্রিক হওয়ার কারণ প্রতিটি এগজিকিউটিভ তাদের কর্মীদের ইডিওলজিক্যালি (আদর্শগতভাবে), এথিক্যালি (সংস্কৃতিগতভাবে) ইকুইপ (ঠিক ঠিকভাবে তৈরি) করেনি, অর্গনাইজেশনালি মাসের সঙ্গে পড়ে থেকে মাসকে কীভাবে অর্গানাইজ করতে হয় এবং তারা স্ট্রাগলটা যাতে ঠিকমতো চালাতে পারে এবং চালাবার ক্ষমতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সেই সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারেনি।

যে কর্মী শুধু রুটিন মাফিক কাজ করে, নিজে কাজ সৃষ্টি করতে পারে না, কোটি কোটি মানুষ চারপাশে চলাফেরা করলেও সে ভাবতে থাকে কোথায় যাবো, কী করব; অন্যদিকে খুব পাওয়ারফুল সৃজনশীল কর্মী, যে প্রতি মুহূর্তে কাজ সৃষ্টি করতে জানে, সে আশেপাশে লোক দেখলেই, লোকের পাশে বসলেই কর্ম সৃষ্টি করতে পারে, তাদের কাজ করবার জন্য পাঁচবার ভাবতে হয় না। তাকে ভাবতে হয়, কাজ করতে শুরু করার পর তার পদ্ধতিকে উন্নততর করা নিয়ে। কীভাবে কাজ করবে এটা নিয়ে ভাবতে হয় না। কারণ সে অলওয়েজ রিমেইনস উইথ দ্য মাসেস অ্যান্ড অ্যামাঙ্গ দ্য মাসেস। জনগণের মধ্যে কর্মীটি যদি বিপ্লবী হিসাবে থাকে, ইয়ার অর্থে না থাকে, তার জীবনের লক্ষ্য কী, উদ্দেশ্য কী, সে যে একটা রাজনৈতিক কর্মী তা জাহির না করে সে শুধু তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সে যদি তার নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে তাদের সঙ্গে মিশতে থাকে এবং তাদের না ছাড়ে, তারা না মিশতে চাইলেও তাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে হাজার এক রকমের কাজ সৃষ্টি করতে শেখে। এই কাজ সৃষ্টি করতে শেখা, সৃজনশীল কাজের ক্ষমতা কর্মীদের মধ্যে না থাকলে একদিন ফ্রাসট্রেশন বা নৈরাশ্য জন্ম নেবে। কারণ সে রুটিন ওয়ার্ক করে, সৃজনশীল কাজ করে না, জনসাধারণকে নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করার চেষ্টা করছে না বা জনতার নেতা

হয়নি কোথাও। এক দঙ্গল যুবক হোক, স্টুডেন্টস হোক, কোথাও বস্তির জনসাধারণ হোক বা কারখানার শ্রমিক হোক, গ্রামের কৃষক হোক, তাদের যথার্থ নেতা, ইমোশনাল (আবেগময়) নেতা, যারা তাকে নেতা বলে মনে করে, যাদের কাছে তারই শুধু যাওয়ার দরকার হয় না, সে না গেলেও জনগণ ছুটে ছুটে তার কাছে আসে এমন পরিস্থিতি সে সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই তার হতাশা আসে। আর, এই পরিস্থিতিটি সৃষ্টি করতে পারার নাম হল পার্টির মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

আপনারা জানেন কি, কমিউনিস্ট পার্টিতে পার্টির কনস্টিটিউশনে (সংবিধানে) পার্টি মেম্বারকে বলা হয়, লিডার অফ দ্য মাসেস। যারা কমিউনিজম বুঝেছেন, তারা জানেন যিনি দলের একখানা কাগজ রাখেন, ডাক দিলে পার্টির একখানা মিটিংয়ে আসেন, কাগজ বিক্রি করতে বললে কাগজ বিক্রি করেন এবং চাঁদা তুলতে বললে সারা দিন ধরে চাঁদা তোলেন, পোস্টার লিখতে বললে সারা দিনরাত পোস্টার লিখে পোস্টার মারেন — এগুলো সব রুটিন ওয়ার্ক। এগুলো অনেক সময় সাধারণ ভলান্টিয়াররাও করেন। এর দ্বারাই কি একজন মেম্বারশিপের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেন? পার্টি মেম্বারশিপের মিনিমাম (সর্বনিম্ন) যোগ্যতা হল দ্যাট হি হ্যাজ বিন এবল টু প্লেস হিমসেল্ফ অ্যাজ দ্য লিডার অফ দ্য পিপল, লিডার অফ দ্য মাসেস (জনগণের নেতা হিসেবে তিনি নিজেকে উপস্থিত করতে পেরেছেন)। তা যে কোনও ওয়াক (ক্ষেত্র) অফ লাইফের পিপল হোক না কেন — পাড়ার যুবকরা হোক, বস্তির লোক হোক, আমি যে অফিসে কাজ করি তার কর্মচারীরা হোক বা তার ইউনিয়নের সদস্যরা হোক, মজুর হোক, চাষি হোক, এনি ওয়াক অফ লাইফের একটা গ্রুপ অফ পিপলের (সমাজের যেকোনও একটি অংশের মানুষের) আমি নেতা, যাদের আমি পরিচালনা করি। এই অর্থে নেতা নয় যে, আমি পার্টির লোক এবং পার্টির ইনচার্জ হয়ে আছি, সেইহেতু আইনের নেতা। আমি তা বলছি না। আমি বলছি ওই লোকগুলোর কাছে ইমোশনাল লিডার, ইডিওলজিক্যাল লিডার, আমি তাদের হৃদয় থেকে গ্রহণ করা নেতা। সেটা শ্রদ্ধার আকারে। আমার থেকেও বড় নেতাকে তারা বেশি শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমাকেও তারা মানে, শ্রদ্ধা করে এবং তাদের কার্যকারিতায়, তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা ব্যাপারে আমার নেতৃত্বের একটা ভূমিকা রয়েছে। আমার কাছে না এসে তারা পারে না। আমার পরামর্শ না নিয়ে তারা পারে না। আই হ্যাভ বিকাম দ্য লিডার অফ এ সেকশন অফ দ্য মাসেস। আমি বলছি কর্মীরা মাসেস-এর লিডার হয়ে মেম্বারশিপের যোগ্যতা অর্জন করবে। তারপর তারা হয় পার্টির অভ্যন্তরে নেতা।

এই পার্টির অভ্যন্তরে নেতাও অফিসিয়াল লিডারশিপ। দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম মোস্ট (যেটা ন্যূনতম), যেটাকে চাই। যেটাকে না মানলে চলে না। কিন্তু আইডিয়াল ফর্ম (আদর্শ) হচ্ছে আমি অফিস হোল্ড করি (আমি পদাধিকারী) বলেই নেতা নই, এইজন্য আমাকে সকলে মানে তা নয়। অফিস হোল্ড করি বলে তো মানবেই, কিন্তু অফিস হোল্ড না করলেও আমাকে শ্রদ্ধার চোখে তারা দেখে, মানে। তারা আমাকে মানে আমার ক্ষমতার জন্য। তারা আমাকে মানে আমার শ্রেষ্ঠতার জন্য। ভালবাসা, প্রীতি, আবেগের সম্পর্ক আছে বলে তারা আমাকে ভালবাসে, তারা আমাকে মানে। এই পজিশনটা হচ্ছে প্রত্যেকটি নেতার যথার্থ পজিশন। নেতৃত্বের আর যে পজিশন সেটা হল মেকানিক্যাল (যান্ত্রিক)। আর এই পজিশন থেকেই যত রকমের গন্ডগোল হয়।

সমস্যা ছাড়া জীবনের কল্পনা অলীক, অমার্কসবাদী চিন্তা

কিন্তু যেখানে নেতার পজিশন হচ্ছে ইমোশনাল, সেইখানে খুব বেশি সমস্যা দেখা দেয় না। আবার সমস্যা কোনদিনই দেখা দেবে না এটা একটা অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও অমার্কসবাদী চিন্তা। সমস্যাহীন জীবন হয় না। জীবন সমস্যাসঙ্কুল, রাজনৈতিক আন্দোলন সমস্যাসঙ্কুল। সমস্ত বিপ্লবী কর্মী জানে সমস্যা ছাড়া জীবনের কল্পনা হচ্ছে অলীক, অবাস্তব কল্পনা, অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত হওয়া। সমস্যাকে দু'রকম ভাবে মানুষ দেখে। বিপ্লবীরা দেখে কী করে সমস্যার সমাধান করব, কীভাবে সমস্যার সমাধান করে এগিয়ে যাব। এই হল বিপ্লবীদের ভাবনা। সমস্যা আছে তাহলে কী করে কী করব, —এভাবে বিপ্লবীরা ভাবে না, সমস্যাতে বিব্রত বোধ করে না। কী করে সমস্যাকে ফাইট (মোকাবিলা) করব, কীভাবে রিজলভ করব সেই পথটা খোঁজে। আরেক দল সমস্যার সামনে পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, বিব্রত বোধ করে। তারা সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটাকে এসকেপ করার (সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়ার) উপায় খোঁজে। অর্থাৎ সমস্যার সমাধান না করার যুক্তির অর্থে সমস্যার উপস্থাপনা করে। কিন্তু, যারা সচেতন কর্মী এবং বিপ্লবী, তারা সমস্যার উপস্থাপনা করে কীভাবে কোন রাস্তায় কোন অস্ত্রটি প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় — সেদিক থেকে। ফলে সমস্যা দেখলে তাদের ইনিশিয়েটিভ আরও বাড়ে। সমস্যা দেখলে তাদের ডিটারমিনেশন (দৃঢ়তা), অ্যাক্টিভিটিজ (কাজ) আরও প্রবল হয়। তাদের লড়াই, চেষ্টা আরও বেশি একমুখী হয় ও তীব্র হয়। এই হল দুটো জাত মানুষের মধ্যে।

সমস্ত বিপ্লবীরই সমস্যাকে দেখবার রীতি হচ্ছে — এই ছিল সমস্যা, তাকে ফাইট করবার জন্য আমি এই এই করেছি। কাজেই মোর দ্য (যতবেশি) প্রবলেম, রেভলিউশনারির ক্ষেত্রে ঘটে মোর দ্য ভিজিলেন্স (তত বেশি সজাগতা)। নন-রেভলিউশনারিদের ক্ষেত্রে ঘটে মোর দ্য প্রবলেম, মোর দ্য ফ্রাসট্রেশন, মোর দ্য টেনডেনসি টু এসকেপ (সমস্যা বাড়লে হতাশা বাড়ে, তার থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে)। এই দুটো জাত সব সময় থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান এবং ধারণা থাকলেই মানুষ বুঝতে পারে সমস্যা ছাড়া কোনও গতিধারা নেই। সমস্ত গতিধারাতেই টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন (নানা বাঁক) থাকে। এছাড়া কোনও কিছুর কোনও অস্তিত্বই নেই। যে সমস্যার স্বরূপ ভাল বুঝতে পেরেছে তার কাছে সমস্যা সমাধানের রাস্তাও তত সহজে প্রতিভাত হবে। যে যত পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ নিজের হাতে এবং কমান্ডে রেখেছে এবং যার কাজ করার ধর্ম সৃজনশীল, সে সমস্যা রিজলভ করবার সংগ্রামটা তত ভাল চালাতে পারে।

আবার জানতে হবে, এই দুটি থাকলেই সকল সময়ে সমস্যা রিজলভ করা যাবে, এরকম কোনও কথা নেই। আলটিমেটলি (শেষ পর্যন্ত) হয়ত সমাধান হবে। কিন্তু সব সময়ে তা নাও হতে পারে। যখন এতসব সত্ত্বেও রিজলভ করা গেল না, তখন ধরা যাবে কোনখানে তার লিমিটেশন (সীমাবদ্ধতা) অর্থাৎ রিসোর্স (রসদ) অনুযায়ী, ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর থেকে বেশি একে ফাইট করা যেত না। ফলে না পারলেও তার থেকে ফ্রাসট্রেশন আসবে না। আমরা চেষ্টা করলে শুরুতেই সব পারব এই ধারণাও সঠিক নয়। আমাদের জানা দরকার, কোনও ঘটনাকে প্রভাবিত করা শুধু আমাদের চেষ্টাতেই হবে তা সঠিক নয়। কারণ আরও বহু ফ্যাক্টারস (কারণ) থাকে, মেনি আনসিন (অনেক অজানা) ফ্যাক্টারস এই সোসাইটিতে আছে, যেগুলো সমস্যাগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাবিত) করে। আমরাই শুধু সমস্ত বিষয়ের ডেসটিনি ডিটারমিন (পরিণাম নির্ধারণ) করি না। কিন্তু যখনই আমি পারলাম না, তখনই আদারস ফ্যাক্টারসগুলো ইনফ্লুয়েন্স করে বলে মনমাফিক ফ্যাক্টারসের ঘাড়ে সমস্ত দোষ এবং দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম এই বলে যে — এটা হয়নি, তার কারণ বহু ফ্যাক্টর তো আছে, আমি চেষ্টা করলেই তো সব সমস্যার সমাধান করতে পারি না। না, আগে খুব ভাল ভাবে দেখতে হবে অ্যাভেইলেবল সলিউশনের (আয়ত্তের মধ্যে থাকা সমাধান সূত্রের মাধ্যমে) জ্ঞানের দিক থেকে, সৃজনশীল কর্ম এবং ইনিশিয়েটিভের দিক থেকে আমার যা যা করা সম্ভব এবং করা উচিত ছিল — সেইসব পরখ করে দেখা হয়েছে কিনা এবং তা হওয়ার পরেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়ে থাকে তখনই আদার (অন্যান্য) ফ্যাক্টারসের কথা আসবে। তখন বুঝতে সুবিধা হবে যে এই এই ফ্যাক্টারগুলো এখানে কাজ করছে। যদি আমাদের চেষ্টার শক্তিটা তুলনামূকভাবে আদার ফ্যাক্টারগুলোর থেকে কমজোর থাকে, আমার সাধ্য, শক্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থে কোনও ত্রুটি, জ্ঞানের দিক থেকে কোনও ত্রুটি না থাকলেও টোটাল রিসোর্স (সর্বপ্রকার সম্পদ) এবং ক্ষমতার দিক থেকে বিরুদ্ধ পরিবেশের তুলনায় তা কমজোর থাকলে আমার চেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও ফেলিওর হবে এটা ঠিক।

তাই রিয়েল রেভোলিউশনারি মুভমেন্টে পরিস্থিতি কারেক্টলি অ্যানালাইজ (সঠিকভাবে বিশ্লেষণ) করা, কারেক্টলি ফাইট করা এবং কারেক্টলি স্ট্রাগল শুরু করা সত্ত্বেও প্রথম প্রথম রেভোলিউশনারি মুভমেন্টে ফেইলিওর আসে। এই ফেইলিওরের সঙ্গে সঙ্গে বিচার করতে হয় লাইনের দিক থেকে, ট্যাকটিক্সের (রণকৌশলের) দিক থেকে এবং আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার দিক থেকে কোনও ত্রুটি হয়েছিল কিনা। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে এই ফেইলিওর ওয়াজ দ্য অবজেক্টিভ লিমিটেশন (বাস্তব সীমাবদ্ধতা)। সেইজন্য রেভোলিউশনারি কোর্স কারেক্টলি শুরু করা হলেও বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক ও শক্তির তুলনায় তা প্রথম প্রথম অত্যন্ত নগণ্য থাকে বলে ইট রিপিটেডলি মিটস উইথ ফেইলিওর (বারংবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়)। প্রতিটি স্তরের ফেইলিওর প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিটেইলসে (বিশদভাবে) এক-দুই-তিন-চার করে কোথায় কমজোর, কোন জায়গাটায় কমজোর আর কোন জায়গাটায় কতখানি কিরকমভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা শক্তিশালী তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এইভাবে প্রতিটি ফেইলিওরের মধ্য দিয়ে রেভোলিউশনারি স্ট্রাগল এনরিচড হয় উইথ নলেজ (জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়), এবং তার দ্বারা স্টাইল অফ ওয়ার্ক (কর্মপদ্ধতি), স্টাইল অফ অ্যাক্টিভিটি, স্টাইল অফ স্ট্রাগল সমস্ত কিছুকে কনটিনিউয়াসলি (ক্রমাগত) পারফেক্ট (নিখুঁত) করার রাস্তায় এগোতে থাকে, শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং আলটিমেটলি রেভোলিউশন ভিক্টোরিয়াস (জয়ী) হয়।

তা হলে কী দেখা যাচ্ছে? উল্টো করে আমি ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করি। আমাকে ভাবতে হবে ডু আই ফিল দ্যাট আই ডেয়ার টু বিকাম এ রেভোলিউশনারি (আমার মধ্যে এই ভাব জাগ্রত হয়েছে কি যে আমি বিপ্লবী হওয়ার হিম্মত রাখি)? রেভোলিউশনারি ইন দ্য সেন্স (এই অর্থে) যে রেভোলিউশনের সাথে ইমোশনাল (আবেগপূর্ণ) একাত্মতা অনুভব করি শুধু তা নয়, আমি একজন অ্যাক্টিভিস্ট (বলিষ্ঠ কর্মী), নট এ সিউডো ইন্টেলেকচুয়াল। সিউডো ইন্টেলেকচুয়ালরা নিজেদের সর্বনাশ এইভাবে করেছে। তারাও নিজেদের বিপ্লবী ভেবেছে। বিপ্লবীদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে। একদল ভাবে আমরা বিপ্লবী, কিন্তু বাস্তবে তারা অকর্মা, কিছু করে না। শুধু যুক্তি করে সকলে তো সব করতে পারে না, কিন্তু আমরাও বিপ্লবী, কারণ বিপ্লবটা আমরা বুঝি। আবার আরেক দল যথার্থ বিপ্লবী আছে যাদের ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, দায়দায়িত্ব আছে, তারা হল অ্যাক্টিভিস্ট। নন-অ্যাক্টিভিস্ট রেভোলিউশনারি হল তারা যারা নিজেদের বিপ্লবী বলে ভাবে, কিন্তু কাজ করে না। প্রথমটাকে আমি বলি সিউডো ইন্টেলেকচুয়াল যাদের বিপ্লবী ভাবনা-ধারণা, বিপ্লবী মতাদর্শ ভাল লাগে অথচ বিপ্লবী হতে পারল না। তারা একটা মিথ্যাচারে নিজেদের ঠকালো। আমি বলছি এই মিথ্যাচারটায় ক্ষতি হয়। এটার দরকার নেই। আপনি পারেননি, তাতে যে ক্ষতিটা হয়েছে তা তো হলই, উপরন্তু আপনি মিথ্যাচারটা করার ফলে আরও ক্ষতি করলেন। আপনি যদি এভাবে ভাবতেন — বিপ্লবী হওয়া উচিত, বিপ্লব করা দরকার, কিন্তু আমি বিপ্লবী হতে পারলাম না। কিন্তু যারা বিপ্লবী হল তাদের যতটুকু পারি সাহায্য করা, সহায়তা করা আমার উচিত এবং ততটুকুও যদি আমি না করি তাহলে এই যে বিপ্লবটাকে আমি বুঝেছি এটার প্রতিও আমি কর্তব্য পালন করলাম না। এইভাবে ভাবলে আপনি অনেক বেশি ভাল কাজ করতেন এবং বেশি সাহায্য করতেন। নিজে মডেস্ট (বিনম্র) হতেন এবং হয়তো বা আজ যা পারছেন না, একদিন সেইটাই সম্ভব হত আপনার জীবনে। হয়তো একদিন সত্যি সত্যি বিপ্লবীও হতে পারতেন। কিন্তু এই মিথ্যাচারের ফলে আপনি নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। কারণ সহজ যুক্তি বের করে ফেললেন, একদল পারে, আর আরেক দল পারে না। চয়েস করে (বেছে) নিলেন আমি হলাম সেই না পারার দলে, যে পারার চেষ্টাটাই আর কোনও দিন করব না। কিন্তু না, দিস ইজ রং (এটা ভুল)।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায় না

শুধু বুদ্ধি দিয়ে রেভোলিউশনারি কেউ হতে পারে না। বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগ, বুদ্ধি এবং মন, বুদ্ধি এবং নীতি-সংস্কৃতি এবং তা নিজের সমস্ত জীবনের সাথে মেলাতে হবে। এই ভাবে মেলাতে না পারলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। আবার বিপ্লবী হওয়ার পরও বিপ্লবীর অনেক স্তর আছে। তা হল, বিপ্লবী সংগ্রামের রাস্তায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ ক্ষমতাশালী স্তর। এটা বিপ্লবী হওয়ার স্তরই। আমি বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে ক্রিয়া করছি। তার মানে আই অ্যাম অ্যাক্টিভলি এনগেজড ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস এগেনস্ট ইনজাস্টিস (অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত)। একজন সচেতন কর্মী যে নাকি অতকিছু না বুঝলেও, বিদ্যাবুদ্ধি তেমন না থাকলেও বিপ্লবের জন্য যে কোনও সংগ্রাম করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পার্টির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তাই বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্নরাও তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে। এই দুইজন দুইদিক থেকে যদি এটাকে মেনে নেন, তাহলেই একমাত্র কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে। কাজেই যে কমরেডটি প্রশ্ন করেছিলেন বিপ্লব ছাড়া হবে না বুঝি, অথচ এসব আমি তো করতে পারি না, তিনি আসলে বিপ্লবী হওয়ার জন্য যে মৌলিক দিকগুলোর কথা বললাম — যে পরিষ্কার প্রশ্নগুলো তার সামনে থাকা দরকার, যেটার মধ্যে তত্ত্বের এত ঝঞ্ঝাট নেই, এত আলোচনা করার বিষয় নেই, তাকে সোজা বলতে হবে আমি পারি কি পারি না। আর এই পারি না-র মধ্যে যদি আমার বোঝার গণ্ডগোল থাকে আমি ঠিকঠিকভাবে বুঝে নেব।

অনেক কর্মীর খুব আবেগ থাকে। প্রথমে যখন তারা বোঝেন যে, একটা কিছু করা দরকার, আই শুড ডু সামথিং, আমি কিছু করব। এইরকম ফ্রেস মাইন্ড (তরতাজা মন) নিয়েই তারা প্রথমে আসেন। বহু ঝড় ঝাপটা ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার আছে। তিনি গিয়ে প্রবল উৎসাহে একটা অলীক ভাবনা ভেবে নিলেন যে আমি গিয়ে খুব উৎসাহের সাথে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণ সাড়া দিতে শুরু করবে। আর এই সাড়া না পেলেই ফ্রাসট্রেশন আসে। আসলে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝার স্তরকেও উন্নত করতে হয়। আমি কাজ করে যাচ্ছি এটা বড় কথা নয়। আমি যথার্থই একটা সেকশন অফ পিপলের (জনগণের একটা অংশের) নেতা হতে পেরেছি কিনা — যে সেকশন অফ পিপল আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। আমার নিজের যাই কিছু দুঃখবেদনা, কষ্ট, সুবিধা-অসুবিধা থাকুক, আমার আত্মমর্যাদার জন্য, তাদের কাছে আমার সম্ভ্রম, সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে তাদের জন্য আমার যা করা দরকার তা না করে উপায় নেই। আমার মাথা তাহলে লুটিয়ে যাবে। আমি এইভাবে তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত। তাদের আমি ঘরবাড়ি ছাড়িয়েছি। তাদের আমি অনেক কথা বলে উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামে নিয়ে এসেছি। তারা আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। এই অবস্থাটি সৃষ্টি করা হচ্ছে একটা গ্যারান্টি টু সেভ ইউ ফ্রম ফ্রাসট্রেশন (হতাশা থেকে মুক্ত থাকার গ্যারান্টি)।

এই যে প্রথম প্রথম অনেক আবেগ থাকে, কিন্তু পরের দিকে অতটা থাকে না কেন — এ বোঝার মধ্যে কী এত জটিলতা আছে? থাকে না এই কারণে যে প্রথমে সে যখন আসে তখন সে একটা ভাসাভাসা কল্পনা, একটা রোমান্টিক আবেগ নিয়ে আসে। পরে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে ঘা খেতে থাকে। তার লড়াইয়ের শক্তিকে যদি সে ক্রমাগত তেমন করে বাড়াতে না পারে তাহলে তার আবেগে ভাটা পড়বে। দুটো শক্তি এখানে কাজ করছে, একটা হল তার সাংগঠনিক শক্তি, জনতার মধ্যে থাকা, তাকে সংগঠিত করা, তাকে লিড করবার শক্তি; আরেকটা তার আদর্শ এবং চেতনার স্তর ক্রমাগত উন্নত করা। এই দুটি জিনিসকে যদি সে ব্যক্তিটি তালে তালে তার সঙ্গে বাড়াতে না পারে তাহলে তার ভাটা পড়বেই। এমন নয় যে সকলেরই ভাটা পড়ে। তাহলে না হয় একটা বিচার্য বিষয় ছিল। একদলের ভাটা পড়ে। আর আজকাল দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগেরই ভাটা পড়ে। কিন্তু যে কমসংখ্যক লোকের ভাটা পড়ে না, ক্রমাগত আরও ধারালো হয়, সেটা তাহলে কী করে হয়? সেখানে খুঁজলেই তো উত্তরটা পাওয়া যাবে। এরকমও তো কিছু অল্পসংখ্যক কর্মী আছে যারা প্রবল উৎসাহ নিয়ে এসে দীর্ঘদিন দলে নানা ক্রাইসিসের (সংকটের) মধ্যে, জটিল অবস্থার মধ্যে, ঘা খাওয়া সত্ত্বেও তাদের চেতনা আরও উন্নত হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি আরও পরিচ্ছন্ন হয়েছে, কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগ আরও বেড়েছে এবং ডিটারমিনেশন আরও বেড়েছে। তা এরকম একটা সংখ্যা আছে। কিন্তু বেশিরভাগের ভাটা পড়ছে। ঐ যে অল্পসংখ্যক কর্মীর কথা বললাম যাদের ভাটা পড়েনি, তারা লড়াই করবার সাথে সাথেই, লড়াইয়ে নামবার সাথে সাথেই বাস্তবের ঘা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা

চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে দ্রুত একদিকে রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে, দর্শনগত উপলব্ধির দিক থেকে, রুচি-সংস্কৃতি-মানসিক গঠন পরিবর্তন করার দিক থেকে, নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়া; আর অপরদিকে জনসাধারণের মধ্যে থাকা, তাদের আন্দোলন পরিচালনা করা, তাদের সাথে জীবনটাকে মিলিয়ে দেওয়া, তাদের যথার্থ নেতা হওয়ার চেষ্টা করা — এই দুটো তারা একসঙ্গে প্রবলভাবে করেছে। আর আরেক দল কাজ করতে এসেছে প্রবল উৎসাহে কিন্তু করেছে রুটিন ওয়ার্ক, কখনও পাবলিককে অর্গানাইজ করার চেষ্টা করে তাদের নেতা হতে পারেনি। এই না পারার জন্য তাদের এই ফ্রাস্ট্রেশন, এই ভাটা পড়া। খালি না পারার জন্য নয়, তার সাথে সাথে আদর্শগত, রুচিগত ও মানসিক কাঠামোর মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার নানা দিক যেগুলো থাকে সেগুলো বিপ্লবমুখী করে ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজটিও তার হয়নি। সিম্পলি উপর থেকে বুদ্ধি দিয়ে বিপ্লবটা গ্রহণ করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকদিন ঝড়ের মতন কাজ করল। করে দেখলো কোথাও কিছু হচ্ছে না, শুধু তার পরিশ্রমই সার। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ থিতিয়ে পড়তে শুরু করল। এর মধ্যে তো বিশেষ একটা রহস্যজনক তত্ত্ব নেই যে তার জন্য এর একটা উত্তর করতে হবে। যে মানুষ বিপ্লবী সংগ্রামে কাজ করতে আসবে তাকে একই সঙ্গে জানতে হবে এটা একটা দুরূহ সংগ্রাম, এর উত্থান-পতন, ঘাতপ্রতিঘাত, বহু জিনিস রয়েছে। এই সংগ্রামটাই জীবন। এই জীবনে ফেইলিওর (অসাফল্য) হোক, সাকসেস (সাফল্য) হোক, এর মধ্যেই আমার মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপনের পথ নিহিত, তাছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। আর যতভাবেই তুমি যুক্তি করনা কেন, আর সব হল ফাঁকির রাস্তা। এই হল প্রথম উপলব্ধি।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে টিকে থাকতে হলে শুধু ইচ্ছার দ্বারা, সততার দ্বারা টিকে থাকতে পারবে না। আজ যত প্রবল ইচ্ছাই থাকুক, সততাই থাকুক, ত্যাগ করার ক্ষমতাই থাকুক, দীর্ঘদিন এই কঠিন সংগ্রামে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমাকে টিকে থাকতে হলে আমার রাজনৈতিক চেতনা, চরিত্রের গঠন পাল্টে ফেলতে হবে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। আর আমার সীমিত ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হলেও একটা সেকশন অফ পিপলের যথার্থ নেতায় পর্যবসিত হতে হবে।

একটা ঝোঁকের মধ্যে অন্য একটা ঝোঁক লুক্কায়িত থাকে

কত রকম সব কনফিউশন (বিভ্রান্তি) আছে। আবার কনফিউশন উইদইন কনফিউশন আছে। এই যে ভাবছেন কংগ্রেস সম্পর্কে মানুষের মোহমুক্তি ঘটেছে, পুঁজিবাদ সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটেছে; মানুষ ভাবছে পুঁজিবাদকে ফেলে দিতে হবে, বিপ্লব করতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে, লড়াই ছাড়া হবে না, কংগ্রেসের দ্বারা কিছু হবে না। মার খেয়ে খেয়ে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনে সকলে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে, পড়েছেও অতীতে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সময়ে যা ঘটেছিল, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনও কথা শুনতে চাই না আগে কংগ্রেসকে পরাস্ত কর। ওসব রাস্তা-ফাস্তা সব পরে ঠিক হবে, আগে কংগ্রেসকে হটানো চাই। তাই হল। কিন্তু তাতে কী হল? কংগ্রেসকে হটিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে যে কনফিউশন ছিল সেটা তো দূর হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে আরেকটা কনফিউশন লুকিয়ে রয়েছে। সেই কনফিউশনটা হচ্ছে — কংগ্রেসকে হটালেই যে কিছু হবে না, কংগ্রেসকে এমন রাস্তায় এবং এমন দলের দ্বারা এমনভাবে হটাতে হবে যাতে যে কারণে কংগ্রেসকে হটাতে চাই সেই কারণগুলো দূর হয়। কংগ্রেসকে হটিয়ে দিলাম, এ সেই ইংরেজ হটানোর মত! ইংরেজকে হটিয়ে দাও তারপরে বাকি সব দেখা যাবে। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অবশ্য এদেশের কিছু কিছু লোকের মাথায় প্রশ্নটা ধাক্কা দিয়েছিল। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ওড়িশার একজন কবি বাঞ্ছানিধি মহান্তির একটা গান আছে, আশ্চর্যজনক গান। না শুনলে বোঝা যাবে না। তিনি তখনই বলছেন, এই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার, বন্যার জলের মত আসছে, কোনও কিছু বিচার না করে সেটাকেই পান করবে কি? যদি পান কর তাহলে ঠকতে হবে। সাদা চামড়ার বদলে, সাদা শোষণের বদলে কালো জোঁকেরা দিল্লির মসনদে বসবে। তাতে চাষি মজুরের কী হবে? ফলে এই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার বন্যার মত আসছে, একে অন্ধের মতো গ্রহণ করলে চলবে না। সেই জন্য বলছেন, রাজা-মহারাজা, ধনী, জমিদার এরা সব খদ্দর পরে আর মুখে মিঠিমিঠি বাত করে, ত্যাগের মালা পরে সব বের হয়েছে রাস্তায়। গানটা বড় সুন্দর —

রাজা জমিদার ধনী সাহুকার
ত্যাগ মালা পিন্ধি হেলেনি বাহারা
তাংক মধুর বচন খদড় বসন
তাকু দেখি তমে ভুলিবা কি

রাজা, জমিদার, ধনী, সুদখোর, মহাজনরা খদ্দর বস্ত্র পরে ত্যাগের মালা পরে বাহির হয়েছে। ওদের মধুর বচন শুনে — তোমরা চাষিমুটিয়ারা ভুলবে কি? যদি ভোলো, তাহলে সাদা জোঁকের বদলে কালো জোঁকেরা বসল বলে।

তাহলে ওয়ান কনফিউশন ইজ হিডন ইন অ্যানাদার কনফিউশন। প্রথমে তো একটা কনফিউশন, তার মধ্যে একটা ঝোঁক, তাকে ফাইট করার মধ্যে আরেকটা ঝোঁক আছে। সেই যে আরেকটা ঝোঁক এলো তাকে ফাইট করার মধ্যেও এমন কতকগুলো ঝোঁক থাকে যে ঝোঁকগুলোও ক্ষতিকারক। কিন্তু ওভারঅল ঐ বড় ঝোঁকটাকে ফাইট করতে গিয়ে ছোট ঝোঁকগুলো আর নজরে পড়ে না। যদি নজরে না পড়ে তাহলে কী হয়? তখনও যে দুষ্ট ঝোঁক এটার মধ্যে লুকিয়েছিল, সেটা এসে আবার বিপত্তির সৃষ্টি করে। তখন জনসাধারণ পড়ে বিপদে — এত লড়লাম, এটাকে হটালাম, আবার যাদের বিশ্বাস করে হটালাম সেগুলিই হনুমান হয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে লোকে ভাবে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। কাজেই কাউকে বিশ্বাস করে কিছু লাভ নেই। এই তো মশাই এত লড়লাম, এই তো এত বিপ্লবের কথা বলল, এই তো এত কাণ্ড করল, এই তো সিপিএমও লাল ঝাণ্ডা ওড়ায়, তারাও তো ক্ষমতায় গেল। ওরা মিনিস্টার হয়ে কী হল? একবারও ভাবলো না যে কংগ্রেসকে হটাতে গিয়ে কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্যে আরেকটা সুবিধাবাদ যে ঘাপটি মেরে রয়েছে, যখন কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন করছ, তখন সেই সুবিধাবাদ সম্পর্কে সতর্ক থাকছ না। এ দোষটা কি অন্যের না তোমার অক্ষমতা? এটা তো তোমারই বোঝার কথা। আর তোমাকে বোঝাবার কথা রাজনৈতিক দলের।

সচেতন রাজনৈতিক দল এগুলো আগে থেকে ধরতে পারে। তবে তার শক্তি এবং ক্ষমতার তারতম্যে সে হয়তো মানুষকে বোঝাবার মতো জায়গায় থাকে না। কিন্তু যদি আগে থেকে ধরতেই না পারে তবে তারা যোগ্য রাজনৈতিক দলের পর্যায়ে পড়ে না। তারা যথার্থ বিপ্লবী দল তো নয়ই। যথার্থ বিপ্লবী দল হল, যারা এগুলো ঠিকমতো ধরতে পারবে ও মানুষকে বোঝাবে। যেমন অনেক কথা আমরা বলেছি এবং যেগুলো ঘটছে আমরা ঠিকই ধরেছি। কিন্তু আমরা যে ধরেছি এবং বলেছি, তা আমরা শোনাতে পারিনি। শোনাতে গেলেই শোরগোল করে চাপা দেওয়া হত। যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জনগণের মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কী — এটা বলতে গেলেই কংগ্রেসী লিডাররা, স্বাধীনতা আন্দোলনের সব বড় বড় উদগাতা এবং নেতারা সব একেবারে শোরগোল করে কথাটা চাপা দিত। আর যারা বলতে চেয়েছে তারা এত অকিঞ্চিৎকর শক্তি যে তাদের সেই কণ্ঠস্বর ছিল না। আবার যাদের কিছু শক্তি ছিল তারা এগুলো বলতে চায়নি। তারা লালঝাণ্ডা উড়িয়েও বলতে চায়নি। ফলে যদি কোথাও একটা কণ্ঠস্বর উঠেছে, সে কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেছে। আমরা খবরও রাখি না, বাংলাদেশের লোকেরাও রাখে না, বিদগ্ধরাও রাখে না যে, ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই বাঞ্ছানিধি মহান্তি কীভাবে চিৎকার করে গেলেন — চাষি-মজুরকে

ওয়ার্নিং দিয়ে গেলেন। কিন্তু চাপা পড়লেও, তাঁর ইভ্যালুয়েশনে (মূল্যায়নে) ভুল ছিল না। যাদের চোখ আছে তাদের কাছে ধরা পড়বেই, ইতিহাসে তা রেকর্ডেড (লিপিবদ্ধ) আছে। তাঁর চোখ ছিল, তিনি অন্ধ ছিলেন না, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। ঠিক তেমনি আমরা যদি ঠিক বলে থাকি, পরবর্তী সময়ে ইতিহাসে আমরা যা বলেছি, তার রেকর্ড থাকবে, মানুষ তাকে লক্ষ করবে, বুঝবে।

কাজেই বললেই যে হয় না, তাতো দেখা গেল। আমরা বলেছি কিন্তু কাজ হয়নি। কাজ হয়নি কেন? শক্তি ছিল না বলে। স্ট্যালিন এ জন্যই বলেছিলেন — শক্তি চাই। মিডিয়া একটা শক্তি। যুক্তফ্রন্ট আমলে আমরা যে খাঁটি কথাগুলো বলেছিলাম, মিডিয়ার মাধ্যমে সে কথাগুলো জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দিতে পারলে যে দুর্ঘটনা তখন ঘটলো, তার থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং বামপন্থী রাজনীতিকে হয়তো রক্ষা করা যেত। কিন্তু রক্ষা তো করতে পারিইনি, বরং আমাদের সম্পর্কেই অপপ্রচার করেছে যে আমরা কংগ্রেসের দালাল। কারণ যাদের মিডিয়া ব্যাক করেছে, তারা এই প্রচারই চালিয়েছে। তখন কোনও কথাই শোনানো যায়নি। কে কী বলছে শোনার দরকার নেই, যার প্রেস আছে, পাবলিসিটি আছে, দলবল আছে, মিডিয়া শুধু তার কথাগুলোই শুনিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে কিছু সত্য বলছে, কিছু অর্ধসত্য বলছে, কিছু মিথ্যা বানাচ্ছে;এভাবে বানিয়ে সমস্ত জিনিসটাকে গোলমাল করে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

তাহলে যে কথাটা বলছিলাম যে একটা টেনডেন্সির মধ্যে আরেকটা টেনডেন্সি লুক্কায়িত থাকে। শুধু কংগ্রেসের বিরোধিতা করার যে ঝোঁক, সেই ঝোঁকের মধ্যে আরেকটা টেনডেন্সিও লুক্কায়িত থাকে। এই ঝোঁকটা ওভারঅল (মূলত) প্রগতিশীল, কিন্তু এই সম্পূর্ণ ঝোঁকটার মধ্যে আর যে সমস্ত ঝোঁকগুলো লুক্কায়িত রয়েছে, সেগুলো কংগ্রেসের মতই ডেঞ্জারাস (বিপজ্জনক)। কিন্তু যদি না সেই ঝোঁকগুলো সম্বন্ধে একসঙ্গে লড়ার সময়েই জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা যায়, তাহলে কংগ্রেসের মতো এরাও কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেবে। ক্ষমতায় গিয়ে তারাও ঠিক অন্য নামে, অন্য ঢঙে অন্য বুকনিতে একই অসুবিধার মধ্যে জনসাধারণকে ফেলবে।

বিপ্লবী কর্মীকে শুরুতেই নিজেকে পাল্টে ফেলার সংগ্রাম করতে হয়

যে প্রশ্ন নিয়ে শুরু করে ছিলাম — কোনও কোনও কর্মী নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে এসে তার উৎসাহ আর পরে থাকে না, ফ্রাসট্রেশনের শিকার হয়। আগের দিনে বিপ্লবীরা অন্যভাবে বলত। যেমন সান ইয়াৎ সেন বলেছেন, যে কথা 'পথের দাবী'র মধ্যে আপনারা পাবেন, — 'নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম, সে যেন এ রাস্তা থেকে তত দূরে থাকে'। তাদের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদ ছিল, একথা বলায় তাদের কোনও অসুবিধা ছিল না। দু-চার-পাঁচ-দশ-পঞ্চাশটা ছেলে, সোনার ছেলে সব দেশেই জোটে। একটা সময়ে জুটতে থাকে, যখন চেতনা ও মুক্তির একটা আকাঙ্খা সমাজে আসে তখন পঞ্চাশ-একশ-দুশো-আড়াইশ-তিনশ বা পাঁচশ ছেলের অভাব হয় না। ওই মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের নেতারা মনে করে এরাই কিছু করে ফেলবে। তাই তাদের কাজ হল, যারা যেকোনও অবস্থায় আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনার মতো, তাদের দিয়েই হবে। আর বাকিদের দিয়ে হবে না। কিন্তু, আমরা বলছি ফ্রাসট্রেশনটা কেন আসছে আমাদের দেখাতে হয়। ফ্রাসট্রেশনকে ফাইট করতে শেখাতে হয় কর্মীদের। এরকম উত্তর করে আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না যে, যারা ফ্রাসট্রেশনকে ফাইট করতে পার না, তারা দূরে সরে দাঁড়াও। আমরা অন্য কথা বলি;আমরা সঠিক দিকটা দেখিয়ে তাকে বিচার করতে বলি যে, এবার তুমি ঠিক করে নাও যে কোনটা নেবে, কোনটা নেবে না, কী করবে। এই জন্য ফ্রাসট্রেশন, তোমাদের ফ্রাসট্রেশন আসে এই কারণে। তুমি একটা কল্পনা নিয়ে এসেছো, বাস্তবটা দেখোনি। বাস্তবের সামনে এসে তোমার কল্পনা ভাঙতে থাকে। কিন্তু এই বাস্তবটার সামনে এসে কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে জ্ঞানকে উন্নত করতে হবে। বোঝাটাকে আরও উন্নত করতে হবে। নিজের মানসিক গঠনটাকে পাল্টাতে হবে। যতক্ষণ তোমার ফ্রাসট্রেশন তোমাকে চেপে ধরেনি, তখনই এই কাজটা করতে হবে। যেমন একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। অনেক আগে প্রথম যখন ফার্স্ট গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, কিছু কিছু ক্যাডার তৈরি হচ্ছে, কিছু স্টাডি ক্লাস হচ্ছে, তখন ভাল ভাল ছেলে যাদের সব ভাল কেরিয়ার হতে পারে, লেখাপড়া শিখছে;আমি বলতাম — দেখ, এখন তো তেজ আছে, এখন আমরা না খেয়েও থাকতে পারি, লড়তে পারি। আমরা বুঝছি যে ফেলিওর হোক, সাকসেস হোক, এটাই মানুষের রাস্তা। আমরা লড়বো, কিন্তু এ ভুল যেন না হয় যে এ অবস্থা চিরকাল থাকবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকমটা থাকবে না। বহু কারণে থাকবে না, যদি না আমরা এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে লড়বার সময়, অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের এই তেজটা রয়েছে তারই মধ্যে দ্রুত নিজেদের তৈরি করে ফেলতে পারি। কী তৈরি করে ফেলতে পারি? মনের দিক থেকে, রুচি-সংস্কৃতির দিক থেকে একেবারে খোলনলচে পাল্টে নিজেকে তৈরি করে ফেল। আর জ্ঞানকে এমন ধারালো করে তোল যে নিজেকে অজ্ঞানতার শিকার হতে দেবে না। কোনও অবস্থাতেই তোমাকে এদিক-ওদিক করতে দেবে না। জ্ঞান একটা সবচেয়ে বড় শক্তি এবং অস্ত্র। যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা কর যাতে নিজের অজ্ঞাত মন, নিজের কুপ্রবৃত্তি ও নীচতাগুলোও র‍্যাশনালাইজ (যুক্তিগ্রাহ্য) করার সুযোগ না পায়। তুমি ঠিক ধরতে পার যে, যুক্তির আড়ালে আমার নীচ প্রবৃত্তিটা আমাকে চালাতে চাইছে। আমি তাকে বরদাস্ত করব না। জ্ঞান থাকলে তুমি ধরতে পারবে। ফলে এই সময়টা হল তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়ার সময়।

আর একটি জিনিস হচ্ছে এগজিস্টিং এই সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে বা কেরিয়ার গঠনের সঙ্গে যে যোগসূত্রটি আমাদের থাকে সময় থাকতে তার সঙ্গে ব্রেক ঘটানো খুবই জরুরি — যেমন ধর, তুমি এমএ পাশ করছো, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হচ্ছো। আজকে হয়তো তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পরও রাস্তায় নেমে এলে। কিন্তু আমি বলি তার দরকার কী? ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার দরকার কী? তোমার তো খাঁটি বিপ্লবী হওয়া দরকার। তাই তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়াটা কেটে দাও। একজন বিপ্লবী তৈরি করার জন্য তাদের বলি — কাঁচি দিয়ে এই লেজটি কেটে দাও। এইটি হচ্ছে ফিতা। ফিতা কি? যখন ফ্রাসট্রেশনে পড়বে তখন এই ফিতায় একটি সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়ে আছে তোমার পিছনে ফেরবার, পিছনে দৌড়াবার। চাইলেই কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার হয়ে যেতে পারবে। আর তা না হলে কোথাও একটা মাস্টারি বা প্রফেসারি জুটবে, না হয় একটা সরকারি চাকরি জুটবে। আর না হয় যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে থাক, একটা ফার্মে একটা ভাল চাকরি জুটে যাবে। তুমি এটা তো বোঝো জ্ঞান অর্জনের জন্য ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার দরকার নেই। বিজ্ঞানের কোনও শাখা প্রশাখায় ঘোরবার জন্য এটার দরকার নেই। সমস্ত বিপ্লবীদের লেখা পড়লে বুঝতে পারবে, আর আমার মত আকাট মুর্খের লেখা পড়লেও তোমরা খানিকটা বুঝতে পারবে। কিছু অসুবিধা নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনও শাখায় ঘুরতে কোনও অসুবিধা নেই চেষ্টা থাকলে। ফলে জ্ঞানের জন্য এই ডিগ্রিটা দরকার আমার — এই বাজে কথাটি বোলো না। তবে এটি বিপ্লবের জন্য দরকার হতে পারে কখনও, যদিও এখন আমাদের সেই কাজেরও দরকার নেই। এখন তোমার বিপ্লবী হওয়া দরকার। আর বিপ্লবী হওয়ার রাস্তায় কোনও ফাঁকি রেখো না। দাও লেজ কেটে। স্বেচ্ছায় কেটে দাও যখন বুঝে গেছ।

যারা বিপ্লবী — হয় তারা পরিবারকে প্রভাবিত করে, না হয় বিচ্ছেদ হয়

অর্থাৎ এমনভাবে নিজেকে তৈরি কর যাতে মন ফিরতে চাইলেও তুমি ফিরতে পারবে না। আর যদি না তা কেটে দাও, তোমার বাড়িঘরটা ঠিক রইল, এমএ-টা ঠিক পাশ করে রাখলে, বিলিতি ডিগ্রিটা ঠিক নিয়ে রাখলে, ব্যবসা-বাণিজ্যটাও করার পথ খোলা থাকল, আবার বিপ্লবটাও করতে থাকলে। যখনপার্টির কাজে মনে হল সুবিধা হচ্ছেনা, তখন সুট করে পিছনের দিকে হাঁটা শুরু করে দিলে। কারণ, ওই যে রাস্তাটি খোলা রেখেছিলে। যেমন, সৌমেন ঠাকুর রাজনীতি করেন। যে সংস্কৃতি নিয়ে তিনি মহা আনন্দে আছেন — তিনি এই আনন্দে থাকতে পারতেন না যদি ঠাকুরবাড়ির সব কিছু — তার স্ত্রীর সম্পত্তি, ব্যবসা,

কলকারখানা এবং বাড়িটি পর্যন্ত বিপ্লবের হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে কর্মীদের সাথে বস্তিতে বা কমিউনে না হয় মেসে এসে উঠতে পারতেন। যদি পয়সা কড়ি না থাকতো, আর এই ব্যাকগ্রাউন্ড তিনি তৈরি না রাখতেন তাহলে এই সংস্কৃতিপূর্ণ সাহিত্যিক জীবনযাপন করা কি সম্ভব হতো? তা রেভোলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি হলো না তো কি হলো? রবীন্দ্রনাথ করে বক্তৃতা চলতে পারে। জীবনভোর তাই করে গেছেন। এই রাস্তাটি খোলা রেখে বিপ্লবী হয়ে তুমি গোড়াতেই ফাঁকি রেখেছো। রেভোলিউশন ছাড়া বড় জিনিস নেই এবং তুমি তো এইরকম রেভোলিউশনারি না, যে শুধু রেভোলিউশনকে সমর্থন করো । ইউ ডেয়ার টু বি দ্য লিডার অফ দ্য রেভোলিউশন, সিমবলিক্যাল এক্সপ্রেশন অফ দ্য রেভোলিউশন লাইক লেনিন। (তুমি তো বিপ্লবের তেমন নেতা হতে চাইছ, যেমনটা লেনিন ছিলেন বিপ্লবের জীবন্ত প্রতীক)। তুমি পার্টির নেতা, পার্টিকে চালাবে। তুমি তোমার সর্বস্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কেরিয়ার সমস্ত নির্দ্বিধায় বিপ্লবের হাতে দিয়ে দাওনি কেন? ভয়টা কিসের? না, বিপ্লবটা যদি শেষ পর্যন্ত না হয়, আমি শেষ পর্যন্ত ভিক্ষে করে খাবো নাকি? বিপ্লব হলে ভাল, তাহলে আমি লিড করব তাকে, বক্তৃতা টক্তৃতা দিতে হয়, জেলে-টেলে যেতে হয় তার জন্য কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি বিপ্লব না হয় তখন? তখন তো মহা মুশকিল। সেই জন্য এটা থাক। বিপ্লব না হলে আমার তখন মোটামুটি সংস্কৃতিপূর্ণ জীবনযাপন করার একটা রাস্তা খোলা রইল। এই যে ফাঁকি — বিভিন্ন নেতাদের জীবনে ফাঁকি; নেতাদের জীবনযাত্রাটা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাইভেসিটা (একান্তভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির গোপনীয়তা) পার্টি থেকে আলাদা। বিপ্লব থেকে আলাদা একটা প্রাইভেসি তারা রেখেছেন। এইখানে আমার আপত্তি। এই দিকটা ছাড়া কীভাবে তারা থাকেন এটা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। নিজের পরিবারকে প্রভাবিত তারা করেন না, যেগুলো নিয়ে আমার আপত্তি। যে কারণে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন এত কমজোর। বিপ্লবী যারা হতে চায় আপনারা দেখতে পাবেন তাদের জীবন ঘেঁটে, হয় তারা পরিবারকে প্রভাবিত করেছেন, না হয় তাদের পরিবারের সাথে বেদনাময় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছে। দুটোর একটা ছাড়া রাস্তা ছিল না। হয় তারা পরিবারকে প্রভাবিত করেছেন বিপ্লবের দিকে - যেমন করেই হোক, যে রাস্তায় হোক বিপ্লবের অনুগামী করতে পেরেছেন, না হয় পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। সংঘর্ষ হয়েছে পরিবারের সঙ্গে। আপস, কোএগজিস্টেন্স (সহঅবস্থান) তারা আবিষ্কার করেননি।

কিন্তু ভারতবর্ষের এইসব বড় বড় বিপ্লবী কমিউনিস্ট (!) নেতাদের জীবন কী? বাইরে সব ছেলেমেয়েদের বলছেন বিপ্লবী হওয়ার চেয়ে বড় আর কিছু নেই, আর নিজের মেয়েকে বলে পার্টির ছেলেদের সাথে মিশো না, তাহলে চরিত্র খারাপ হয়ে যেতে পারে। আবার পার্টির ছেলেদের বলে, কমিউনিস্ট হওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ। আর অন্যদিকে ভয়, মেয়ে যদি কি জানি বাবা একটা উটকো বস্তির ছেলের সাথে প্রেম করে বসে। তখন আমি কমিউনিস্ট নেতা হয়ে বলতে পারব না যে কেন একটা বস্তির ছেলেকে বিয়ে করেছে। মহাফ্যাসাদ। তাই মেয়েকে বলব আগে লেখাপড়া শেখো, এখন তোমার পার্টি করার সময় হয়নি। তোমার যখন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে তখন তুমি পার্টি করবে। তারপর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দিল। ব্যাস, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, তুমি নিশ্চিন্ত। পুত্রকে কনভেন্টে রেখে পড়াচ্ছে বা ঐরকম একটা কিছু করছে। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে বক্তৃতা করছে। ঐসব পার্টিগুলোতে ব্যতিক্রম যে একটা দুটো নেই তা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রম তো আলোচনার বিষয় নয় — এটা একটা ধারা। নেতৃত্বের এটা ধারা। সেখানে কর্মীদের মধ্যে, দেশের লোকদের মধ্যে, কমিউনিজমের আদর্শের নামে এই রকম নানা কারচুপি আসবে না কেন?

কারণ মার্কসবাদীদের তো জানা কথা, সমস্ত তাত্ত্বিকের খুব ভাল জানা উচিত, মানুষের যেটা ইমোশনাল দিক — সংস্কৃতি ও চরিত্রের ওপর তার বিরাট প্রভাব পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বুদ্ধিগ্রাহ্য জিনিসগুলোকে রস এবং ইমোশনের আকারে চরিত্রে গ্রহণ করে, ততক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা আহরিত জিনিস চরিত্রকে প্রভাবিত করে না। ঐগুলি বাইরে সারফেস লেভেলে সাজানো থাকে। থাকে বই লেখার জন্য, বক্তৃতা করার জন্য, বলার জন্য। চরিত্রকে তা প্রভাবিত করে না। বড় কথাগুলো যতই আমার আয়ত্ত থাকুক, তখনই আমাকে প্রভাবিত করে আমার জীবনকে পাল্টে দেয় যখন তা ইমোশনের আকারে, রসের আকারে আমার মধ্যে ঢুকে যায়, ঢুকে গিয়ে আমাকে পাল্টে দেয়। তাহলে ইমোশনাল ভেহিকিলটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, মান-অভিমান — এগুলো সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, বড় জিনিস। এগুলো যেমন মানুষকে বড় করে, মহৎ করতে সাহায্য করে, আবার এইগুলি মানুষকে একেবারে নিম্নগামী, অধঃপতিত করবার রাস্তায় নিয়ে যায়। এটা যেমন একদিকে স্বর্গদ্বার, আবার না বুঝে এটাই অন্ধের মতন পদক্ষেপ করলে অন্যদিকে নরকের দ্বার। এটাই তো বাস্তবতা, সমস্ত জ্ঞানীরই তো জানা উচিত। তাহলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব, আমার সঙ্গে হৃদয়াবেগ, আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, আমার সঙ্গে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক আদানপ্রদান মানে হল আমার মধ্যকার বিপ্লবী সংস্কৃতির ভাবনাধারণা, রুচি-রসবোধ এইগুলো এই আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে গিয়ে বর্তাবে বুদ্ধিকে টপকে। শুধু বুদ্ধির তো দরকার নেই। বুদ্ধির জন্য তো যুক্তি করছি, বোঝাচ্ছি, বই পড়াচ্ছি। কিন্তু এই মেলামেশা আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে, ডায়ালগের (কথোপকথনের) মধ্য দিয়ে, রসের বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে হয় আমার রসটা, আমার মনোভাবনা, আমার সংস্কৃতিটা, রুচিটা অন্যদের প্রভাবিত করবে;আর তা না হলে বুঝে হোক না বুঝে হোক, আমি বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করি আর না করি, আমার অজ্ঞাতসারেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, মানসিকতা, স্নেহের ধারণা, রসবোধ তার মধ্যে রয়েছে, যার সঙ্গে আমার এই কারবার সে আমার স্ত্রী হোক, আমার ভাই-বোন হোক, যেগুলি তার চরিত্রের মধ্যে, তার নীতিনৈতিকতার ধারণার মধ্যে খাদ হয়ে মিশে থাকে তার দ্বারা আমি প্রভাবিত হবো। ফলে হয় আমি প্রভাবিত করব, না হয় তারা আমাকে প্রভাবিত করবে। কেউ কাউকে প্রভাবিত করবে না এরকম হয় না। আর কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে পারলাম না — এর মানে হল একটা স্ট্রাগল এবং কনফ্লিক্ট থেকে দুজনেই দূরে থাকলাম। রিলেশন (সম্পর্ক) আছে, আবেগ আছে, মান অভিমানও আছে, ঝগড়াও আছে, আপসে মিলও রয়েছে অথচ আমিও তাকে প্রভাবিত করছি না, সেও আমাকে প্রভাবিত করছে না — এটা কি বিজ্ঞান? এর মানে হল, আমি প্রভাবিত করতে পারছি না মানে সে প্রভাবিত করতে পারছে না, তা নয়। আমি প্রভাবিত করতে পারছি না মানে সে নিশ্চয় প্রভাবিত করছে আমাকে। কীভাবে করছে? মোটা অর্থে মানুষের চোখে ধরা না পড়লেও ক্রিটিক্যাল অবজার্ভেশনে (বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণে) - ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং মাই ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি (আমার বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে) — এই ভাবেই গোটা প্রক্রিয়া কাজ করে। তাই একজনের বিদ্যাবুদ্ধি ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি হাজার পাওয়ারফুল হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি তেমন ক্ষুরধারসম্পন্ন হন না — অনেক সময় আমরা তা বুঝতে পারি না। এইগুলোই তার কারণ। অতি সাধারণ কথা, দেখা যায় একজন মানুষ যার ত্যাগের অভাব নেই, যার ডেডিকেশন, মেথড (পদ্ধতি), ডিসিপ্লিনের (শৃঙ্খলার) অভাব নেই, সচেতন মানসিক ক্রিয়ার দিক থেকে যিনি কঠিন পরিশ্রমী, ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল একটা অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ডের, বিলো লেভেল (খুব নিচু মানের) নয়। এগুলির কোনওটারই অভাব নেই। যে স্ট্যান্ডার্ড থেকে যেকোনও উন্নত স্তরে যাওয়া যায়, এইরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। অথচ ক্রিটিক্যাল অবজার্ভেশন ডেভেলাপ করছে না। আসলে সূক্ষ্ম অর্থে নিজের ক্ষতি করে বসেছেন। তিনি মোটা অর্থে ক্ষতিটা রুখতে পেরেছেন, কিন্তু রুখতে পারেননি তাঁর চিন্তা প্রক্রিয়ার অবনতি। ধরতে এবং রুখতে পারেননি ইন্টেলেকচুয়াল পাজল (বৌদ্ধিক জটিলতা) কোথায় সৃষ্টি হয়েছে এবং কেন সৃষ্টি হয়েছে। আমার বুদ্ধির মধ্যে, আমার ইন্টেলেকচুয়াল এবিলিটির (বৌদ্ধিক ক্ষমতার) মধ্যে, আমার কালচারাল অ্যান্ড এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলাপ (সংস্কৃতিগত ও নৈতিক মান উন্নত) করার ক্ষেত্রে যা বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে। চিরকাল আমি লড়াই করেছি, জনসাধারণের মধ্যে থেকেছি, বিপ্লবের মধ্যে এসেছি বলেই আমার অধঃপতন হবে না — তা তো নয়। আবার অধঃপতন হলে একটা সোজা যুক্তি মার্কসবাদীরা দিয়ে থাকেন, নো ম্যান ইজ ইনফলিবল (কোনও মানুষ ভুলের ঊর্ধে নয়)। যেকোনও মানুষেরই পতন হতে পারে। কাজেই লিউ শাও চি-রও পতন হয়ে গেল এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে? কিন্তু পতনটা জীবনভোর বিপ্লবের

মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেন হয় ভেবে দেখেছ কি? বহু দিন বিপ্লবী আন্দোলনে থেকেছে ট্রটস্কি, দীর্ঘদিন বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে থেকেছে বুখারিনরা, লিউ শাও চি-রা। এ কথাতো বলতে পারবে না যে বিপ্লবটাকে এরা ফাঁকি দিয়ে গেছে চিরকাল। লড়েছে, পার্টির শীর্ষস্থানীয় অবস্থায় এসেছে, সবসময় পার্টি নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে, স্ট্রাগল নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, হাতেকলমে সামনে থেকে স্ট্রাগল করেছে, তবু তাদের এই পতন হল কেন? অ্যাক্সিডেন্ট নাকি? অজানা ফ্যাক্টর একটা বাইরে থেকে এসে তাদের এরকম করে দিয়েছে — এ-তো মিস্টিসিজম (অতীন্দ্রিয়বাদ)। কতগুলো জিনিস যেগুলো এরা কেয়ার করেনি (গুরুত্ব দেয়নি), যার ফলে ক্ষতি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং যেকোনও একটা সময়ে গিয়ে সেটার প্রকাশ ঘটে। সেজন্য একদিনের রেভোলিউশনারি হয়ে পড়ে রিভিশনিস্ট (সংশোধনবাদী) — চিন্তায় বিকৃত, ধিক্কৃত, নোংরা। একদিনের একজন আর্ডেন্ট ফাইটার (উদ্দীপ্ত যোদ্ধা) অফ মার্ক্সিজম হয়ে যায় সাঁইবাবার চেলা। এইভাবে কেউ কেউ সাঁইবাবার চেলাও হচ্ছে আজকাল কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টির ভেতরে। ওনার নাকি বিভূতি বেরোয় হাত-নাক-চোখ দিয়ে। আর এইসব কমিউনিস্টরা সব তার চ্যালা হচ্ছে।

পার্টি কাউকে বিপ্লবী বানিয়ে দিতে পারে না

এখন আমাকে আবার প্রথম দিকের প্রশ্নগুলি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করতে হচ্ছে, কারণ কিছু কিছু প্রশ্ন এসেছে ক্লারিফিকেশন (ব্যাখ্যা) চেয়ে। এই ব্যাখ্যা চাওয়াই ইন্ডিকেট করছে আমাদের বেশিরভাগ কর্মীর চেতনার মান কোন স্তরের। আমি বলতে চেয়েছি আমাদের কর্মীদের বহু গুণ থাকতে পারে, চেতনার স্তরও কিছুটা উন্নত থাকতে পারে, কিন্তু আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গিয়ে, সংগ্রাম করতে গিয়ে, পার্টিকে বাড়াতে গিয়ে, জনসাধারণের আন্দোলনের নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে, আমাদের সামনে যে সমস্ত সমস্যাগুলো সংগঠনগত এবং রাজনীতিগতভাবে দেখা দিচ্ছে, সেই সমস্যার মোকাবিলা করার যোগ্যতার অর্থে আমাদের কর্মীদের যোগ্যতা, চেতনা এবং কর্মশক্তি কোন স্তরে আছে — এইটে হবে আমাদের কাছে বিচার্য বিষয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আমাদের সম্মুখীন সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে পারি কিনা। এই পারার ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে একজন বলল যে, পার্টিরও তো একটা কর্তব্য রয়েছে, নেতাদেরও তো একটা কর্তব্য রয়েছে কর্মীদের যোগ্য করে গড়ে তোলার। হ্যাঁ, রয়েছে বলেইতো দলের মধ্যে অনেক কর্মী তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পার্টি চাইলেই একতরফাভাবে তোমাকে গড়ে দিতে পারে না, কোনও লোককে বিপ্লবী বানিয়ে দিতে পারে না। যে বিপ্লবী হওয়ার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, পার্টি তাকে সাহায্য করতে পারে মাত্র। যে বিপ্লবী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করবে, নিজের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ানো, নিজের চরিত্রকে সেই অনুযায়ী গড়ে তোলা এবং নিজের ওয়ার্কিং স্টাইল জনতার মধ্যে থেকে কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভ (ক্রমাগত উন্নত) করার জন্য ক্রমাগত কাজ, রাজনৈতিক চর্চা, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ইমপ্রুভ করবার চেষ্টা করবে, তাকে নেতৃত্ব দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে দল সাহায্য করতে পারে। কিন্তু দল গাইডেন্স দিক, পরামর্শ দিক, যা কিছু করুক, যে কর্মী কাজের মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে বিপ্লবী সংগ্রাম এবং জনগণের মধ্যে নিবিষ্টভাবে ঢুকল না — পার্টি তাকে সাহায্য করলেও সে গড়ে উঠবে না। জনগণের সাথে থেকে লড়তে লড়তে কোনও কোনও কর্মী পার্টির সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায় কেউ জনগণকে নিয়ে লড়ছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত পার্টির সাথে একাত্ম হতে পারছে না। এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের সঙ্গে থেকে লড়েও কিছু লাভ হয় না; কিছু দিন লড়ে, তারপর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একে জনতার মধ্যে থাকা এবং জনগণের একজন হওয়া বা নেতা হওয়া বোঝায় না।

যেমন একজন প্রশ্ন করেছেন, জনগণের নেতা হওয়া বলতে কী বোঝায়? নেতা হওয়া বলতে বোঝায়, জনগণ আমাকে রাজনীতি, চরিত্র, কর্মক্ষমতা, পরিকল্পনা, প্রভৃতি প্রশ্নে নেতার ভূমিকায় পাবে। তারা আমাকে ছাড়তে চাইলেও অ্যাভয়েড করতে (এড়িয়ে যেতে) চাইলেও আমি তাদের ছাড়ছি না। আমাদের দেশে যে প্রবাদ আছে, হিন্দুস্থানী প্রবাদ — কমলি নেহি ছোড়তি, আমি ছেড়ে দিতে চাইলেও কমলি ছাড়ে না, সে ধরে বসে থাকে। হোক তারা দশটা লোক, হোক তারা ছোট একটা কারখানার কয়েকজন মজুর, হোক তারা কোনও একটা গ্রামের কিছু চাষি, বা কোনও একটা এলাকার অল্প কিছু লোক অথবা কোনও একটা পাড়ার অল্প কিছু যুবক, কিছু পাবলিক, কিছু ওয়ার্কার (শ্রমিক) যাদের সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্ব নয়, এমন একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট (গভীর আবেগের সম্পর্ক) আছে, যাদের সমস্ত কাজে আমাকে দরকার এবং তারা আমাকে নিজেদের লোক বলে মনে করে। আবার একই সাথে তাদের চেয়ে সুপিরিয়ার (বড় মাপের) বলে মনে করে। কখনও প্রথম প্রথম সমালোচনাও করে, হয়তো বিদ্রুপও করে, আবার আমার প্রভাবটাকে অস্বীকারও করতে পারছে না, কারণ আমি অস্বীকার করতে দিচ্ছি না। যখন আমি তাদের যথার্থ নেতা হয়ে গেলাম, তখন তাদের কাছ থেকে ভালবাসা পেলাম, শ্রদ্ধা পেলাম। বাস্তবে তখন কিন্তু তারা আর বিদ্রুপও করে না, সমালোচনাও করে না। তারা তখন আমাকে মেনে চলে। এই যে সমালোচনা-বিদ্রুপের স্তরটি — এটা হচ্ছে আমার নেতা হওয়ার সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। আমার নেতা হওয়ার সংগ্রামের পথটায় ট্রানজিশনাল ফেজ, অন্তর্বর্তী সময়। রেভোলিউশনারি ক্যাডারদের মাস সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি হবে। নেতৃত্ব বলতে আমি এটাকেই বলছি।

তাহলে যে কাজ সাধারণত কর্মীদের দিয়ে করানো হয়, সেটা রুটিন ওয়ার্ক (বাঁধাধরা কাজ)। নেতারা যা কাজ দিচ্ছে শুধু তাই করছি, নিজে কিছু সৃষ্টি করছি না। অথচ নেতৃত্ব ২৪ ঘণ্টা বলছে, পার্টি বলছে, কাজ সৃষ্টি করতে হবে। সেটা তো দল তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিতে পারে না। এইখানেই তো প্রতিটি বিপ্লবী কর্মীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। একটা হচ্ছে, দল তাকে যে কাজ যতটুকু করতে দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ প্রতিদিন সে তার আশেপাশের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করছে। এইখানে হচ্ছে বিপ্লবী কর্মীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর একটা হচ্ছে, দল কাজ দিচ্ছে না, তাই করছি না। এর ফলে কর্মীরা যে কাজগুলো করে, সেগুলো রুটিন কাজ, অর্ডার মাফিক কাজ, নিজের সৃষ্টি করা কাজ নয়। কাজ যে সৃষ্টি করতে পারে না, কাজের আনন্দও তার অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় উৎসাহের সাথে আনন্দে দলবল মিলে সে কাজটা করে। তাও আবার দেখা যাবে একা একা করতে গেলে তার সেই ইমোশন থাকে না। এই যে প্রশ্নটা কমরেডরা করছেন আমরা প্রথমে এসে খুব উৎসাহে কাজ করি। ভেবে দেখেছেন? প্রথমে এসে খুব উৎসাহে আপনি যে কাজটা সকলের সাথে শুরু করলেন, তাকে যদি দলবল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন একটা জায়গায় একা দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেখানে এরকম বন্ধুবান্ধব, দলের কর্মী এবং পার্টির একটা জমজমাট অবস্থা নেই, সেখানে পার্টির কোনও কাজ নেই, তাহলে দেখা যাবে দুদিনেই তাদের অনেকেই ওখান থেকে চলে আসছে। লোকজন, বন্ধুবান্ধব, দলের কর্মীদের মধ্যে কাজ করতে উৎসাহে ভাটা পড়তে যে সময় লাগে, ঐরকম একটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় পাঠালে দু-চারদিন বা দশ-বারোদিন বা একমাসের মধ্যে তার উৎসাহে ভাটা পড়ে যাবে। এর মানেটা কী? এর মানে হচ্ছে এই যে — রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক মতবাদ যেমন করে গ্রহণ করা দরকার, কর্মীটি যখন প্রথমে পার্টিতে যুক্ত হয় তখন তেমনভাবে তা গ্রহণ করার উদ্যোগ থাকে না। গ্রহণ করাটা খানিকটা ভাসাভাসা ওপর ওপর থেকে যায়। একটা আবেদনে সাড়া দিয়েই সে আসে। যুবক বয়সের এনার্জি (জীবনীশক্তি), খানিকটা রোমান্টিক (ভাবপ্রবণ) উন্মাদনা, খানিকটা তার মধ্যে ইউটোপিয়ান (কাল্পনিক) ধারণা, কল্পনা কাজ করে; তার মধ্যে তখনও বাস্তব সম্বন্ধে কোনও ধারণা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু জ্ঞান যত বাড়তে থাকে, তখন বিপ্লব সম্বন্ধে খানিকটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। এ একটা কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, ফেলিওর-সাকসেস আছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই কর্মীটির জীবন, এইখানেই তার আনন্দ। এই আনন্দ ও জীবনের উপলব্ধিগুলি তিল তিল করে তার মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। সেই জন্যেই যে নাকি প্রথম উৎসাহে এসে কাজ করতে নামার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তৈরি

করে নেয় না এবং সৃজনশীল কাজ করতে অভ্যস্ত হয় না, নিজে কাজ সৃষ্টি করে জনতার নেতা হওয়ার মতো পজিশনে (অবস্থানে) যাওয়ার চেষ্টা করে না বা যেতে পারছে না, তাদের জীবনেই এইরকম বিপত্তি ঘটে ও উৎসাহে ভাটা পড়ে। এমন কোনও হোমিওপ্যাথিক রেমিডি (প্রতিষেধক ঔষধ) সিলেক্ট করে দেওয়ার উপায় নেই যে যারা উৎসাহ নিয়ে শুরু করল, যেন তাদের কারোরই কোনও দিন কাজের উৎসাহে ভাটা পড়তে না পারে। না, এরকম কোনও দাওয়াই অন্তত আমার জানা নেই। কার কখন ভাটা পড়বে, এটা নির্ভর করে মূলত তার নিজস্ব ইনিশিয়েটিভের ওপর। যখন তার উৎসাহ রয়েছে সেই সময়টুকু তার কাছে কত যে মূল্যবান, এ বিষয়ে যদি তার বিন্দুমাত্র সচেতনতা থাকে, তাহলে সেই সময়টুকুকে সে সযত্নে ব্যবহার করবে। কীভাবে ব্যবহার করবে? রাজনৈতিকভাবে, সংস্কৃতিগত দিক থেকে, রুচি-মানসিকতার দিক থেকে এবং সংগঠন পরিচালনা ও জনগণের নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দিক থেকে নিজেকে তৈরি করে ফেলবে। এইটে যদি সে তৈরি করতে দেরি করে, গাফিলতি করে, রুটিন ওয়ার্কে দলবদ্ধতার মধ্যে হৈ হৈ করে দিনগত পাপক্ষয় করে, দিনের পর দিন হেলায় ফেলায় নষ্ট করে দেয়, তারপর একদিন তার বয়স বাড়তে থাকে, সামর্থ্য কমতে থাকে অথচ চেতনা তার পাকা হয়নি, রুচি-মানসিক গঠন তার পাকা হয়নি;দল এবং জনগণের সঙ্গে তার এমন ধরনের একাত্মতা হয়নি যে ভেতর থেকে এই সমাজের মানসিকতা, এই সমাজ থেকে আহরিত বহু ফিলদি ফিলিং (নোংরা অনুভূতি), ঘৃণ্য হীনমন্যতা এবং স্বার্থবোধ যখন তাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় — হোক তার যৌনজীবনের আকর্ষণ, ভালবাসা পাওয়ার আকর্ষণ, আর্থিক স্থিতির আকর্ষণ, ঘর বাঁধার আকর্ষণ, কি অন্য যাই কিছু হোক অথবা নিজেদের মধ্যে কোন্দল বা আমিরি করার ঝোঁক এবং কষ্ট স্বীকার করতে না পারা, যেগুলো এই সমাজ থেকে আসে — এই সমস্ত বহু কারণে যখন সে পিছিয়ে পড়তে থাকে যে ভাবনা চিন্তাগুলো আবার সমাজ থেকেই আসে, তখন এইগুলির বিরুদ্ধে ফাইট করে নিজের বিপ্লবী জীবন রক্ষা করতে পারে না।

মানুষে মানুষে সম্পর্ক উৎপাদন সম্পর্ক

এই বিষয়টা ঠিক ঠিক ভাবে বোঝার জন্য মার্কসবাদের একটি বুনিয়াদী কথা বোঝা দরকার। মার্কসবাদ বলছে,— এই যে আমাদের সমাজ, এই যে আমরা সোস্যাল বিইং, এখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হল উৎপাদন সম্পর্ক। অনেকে মনে করেন, বেশ কিছু পণ্ডিতেরা মনে করেন, মার্কসবাদের এই কথাটা ঠিক নয়। কারণ, বাবা-মার সাথে সন্তানের সম্পর্কটা কি উৎপাদন সম্পর্ক? উৎপাদন সম্পর্ক বলতে এই সব মূর্খ পণ্ডিতরা মনে করছেন শুধু আর্থিক সম্পর্ক। না, তা নয়। মার্কসবাদ যখন উৎপাদন সম্পর্ক বলেছে, তখন নিছক আর্থিক সম্পর্ক বলেনি। কারণ মার্কসবাদ যখন উৎপাদন কথাটা বলেছে, তখন দুই উৎপাদনের কথাই বলছে। একটা হল মেটিরিয়্যাল উৎপাদন বা বস্তুগত উৎপাদন এবং অপরটি হল, স্পিরিচুয়াল উৎপাদন বা ভাবগত উৎপাদন। মানুষের উৎপাদন সৃষ্টির দুটি দিক আছে — একটি তার ব্যবহারিক জীবনে লাগে, তাকে আমরা বলি মেটিরিয়্যাল প্রোডাকশন;আর একটি মনের খোরাক সৃষ্টি করে, যাকে আমরা বলি ভাবগত উৎপাদন। যার থেকে শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি, ভাবধারা, নীতিনৈতিকতা, ধর্ম, ঐতিহ্য, আদর্শবাদ, বিপ্লববাদ এই সবের জন্ম। এই সবই তো মনুষ্য সৃষ্ট। তাহলে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাঁচার তাগিদে হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে দুরকম উৎপাদন করেছে, একই সঙ্গে মেটিরিয়াল প্রোডাকশন আর স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন। এই দুটি উৎপাদনই সে করেছে একদিকে নিজে তা ভোগ করার জন্য এবং অন্যদিকে নিজের বিকাশের জন্য — ব্যক্তির এবং সমাজের বিকাশের জন্য, সভ্যতার বিকাশের জন্য, সমাজের অগ্রগতির জন্য। কাজেই উৎপাদন হচ্ছে মানুষের ক্রিয়ার ফল, মস্তিষ্কের চিন্তাগত ক্রিয়ার ফলে ভাবগত উৎপাদন এবং শারীরিক ও চিন্তাগত ক্রিয়ার সংমিশ্রণের ফলে মেটিরিয়াল উৎপাদন।

যাই হোক, উৎপাদন সম্পর্ক বলতে মার্কসবাদ বলতে চেয়েছে একটি মূল্যবান কথা — এই সমাজ উৎপাদন করার প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। সকল মানুষ বাঁচার তাগিদে উৎপাদন করতে গিয়ে পরস্পর সম্বন্ধিত হয়েছে, তবেই আমরা সমাজবদ্ধ হয়েছি, তবেই আমরা সামাজিক জীব হয়েছি। তা না হলে আমাদের সাথে জন্তু-জানোয়ারের কোনও পার্থক্য নেই। আমরা একসঙ্গে থাকি বলে আমরা সামাজিক জীব নই। তাহলে পিঁপড়েকেও তো সামাজিক জীব বলা যেত। আমরা কি পিঁপড়েকে সোস্যাল বিইং বলি? হাতিরাও একসঙ্গে থাকে, তাই বলে কি হাতিকে আমরা সোস্যাল বিইং বলি? একসঙ্গে থাকার জন্যই আমরা সামাজিক জীব নই। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচার তাগিদে সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করছি;এক সঙ্গে উৎপাদন করছি এবং একত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সচেতনভাবে লড়াই করতে গিয়ে উৎপাদনের জন্ম দিচ্ছি, উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলছি;এই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই আমরা সামাজিক জীব।

তাই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইতিহাসের বিকাশের কোনও স্তরেই এবং কোনও সময়েই মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজে বাস করবে আর উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না, তা হলে এই সম্পর্কটা তার কী ধরনের? সে সক্ষম হতে পারে, অক্ষম হতে পারে, আংশিক বুঝতে পারে, অর্ধসত্য আবিষ্কার করতে পারে, পুরো সত্য আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু সে বুঝুক আর না বুঝুক, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা না বোঝার উপর নির্ভর করবে না। ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ হিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এটি তার উপলব্ধি নিরপেক্ষ) । হি ক্যান নট বাট এস্ট্যাব্লিশ সাম সর্ট অফ রিলেশন উইথ এগজিস্টিং প্রোডাকশন সিস্টেম (প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে কোনও না কোনও সম্পর্ক গড়ে না তুলে পারে না)। সে জন্যই বলছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য অনারেবল ওয়ে অফ লিডিং আওয়ার লাইফ? কেউ যদি মনে করে আমি মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করব, আমি কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কাউকে শোষণও করব না, জুলুমও করব না, আমি শুধু ডাক্তারি করব, না হয় শুধু মাস্টারি করব; তা হয় নাকি? এ হয় না, হতে পারে না। আমি কি জানি মেডিকেল প্রফেসনে কাউকে ঠকাবো না ভেবে ডাক্তারি করতে গেলেও আমি মানুষকে না ঠকিয়ে প্রফেসনে এক পাও এগোতে পারি না? কাজেই অনারেবল ওয়ে অফ লাইফ লিড করার এসব উপায় নয়। আবার এই সবগুলোই মানব কল্যাণের কাজে আমি লাগাতে পারি। মাস্টার তার শিক্ষা দেওয়ার কাজটাকে, ডাক্তার তার চিকিৎসা করার কাজকে, ইঞ্জিনিয়ার তার যন্ত্রবিজ্ঞান ব্যবহার করার কাজকে হিউমিলিয়েশন (অবমাননা) থেকে মুক্ত করে সমাজপ্রগতির কাজে লাগাতে পারে যখন বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতির সহায়ক ও পরিপূরক অর্থে তার ব্যবহার হবে। তখনই সে এটা একমাত্র পারে। বাকিটা হল সে চাক বা না চাক, কনশাসলি বা আনকনশাসলি, (সচেতন বা অবচেতনভাবে) ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) সার্ভিং দ্য এক্সপ্লয়টেটিভ সিস্টেম, প্রফিট মেকিং মোটিভ অফ দ্য সোসাইটি (শোষণমূলক ব্যবস্থাকে, সমাজের মুনাফালাভের উদ্দেশ্যকে মদত দিচ্ছে)। এগজিস্টিং সোসাইটির সোস্যাল সেটআপ, মেন্টাল মেকআপ, তার মানসিকতা;তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার ধ্যানধারণার যত বিচিত্র রকম রূপ — তা হল মানুষকে অ্যাপলিটিক্যাল (রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন) করার জন্য। যে সংগ্রামে সমাজ একমাত্র পাল্টাতে পারে, যে সংগ্রামের দ্বারা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাল্টাবে, এই জগদ্দল পাথর হটানো যাবে, যে সংগ্রাম দ্বারা সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হতে পারে, প্রগতি আসতে পারে, সেই সংগ্রামটাকে বুর্জোয়ারা যেমন সরাসরি বিরুদ্ধতা করে, আবার অন্য নানা কৌশলেও বিরুদ্ধতা করে। রাজনীতির কথা সে একদম বলছে না, কিন্তু এমন সব ধ্যান ধারণা সে চালু করছে, এমন সব দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিচ্ছে, এমন সব নীতিনৈতিকতার ধারণা সৃষ্টি করছে, এমন সব ফিলানথ্রপিক (পরোপকারী) সমাজসেবার ধারণা সৃষ্টি করছে, যার দ্বারা মানুষের সমাজের প্রতি কল্যাণ করার মনোভাব বিপ্লবমুখী না হয়ে ফিলানথ্রপিক রামকৃষ্ণ মিশন বা মিশনারীদের মূর্তি হয়ে বিপ্লবের পথটাকে আটকে দেয়। তেমনি ডাক্তারের, ইঞ্জিনিয়ারের, মাস্টারমশাইদের মনোভাব কিছু সমাজসেবা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আটকে পড়ে থাকে, অর্থাৎ সমাজবিপ্লবে যেন না

যায়। যেখানে সরাসরি সমাজবিপ্লব খারাপ বলা চলে সেখানে তাই বলছে, যেখানে সমাজবিপ্লবের কথা খারাপ বলে লোকজনদের আটকানো যাবে না, সেখানে বলছে মানুষের সেবা করাওতো একটা কাজ। এটা না হয় না পারো, ওটা করো। অর্থাৎ আসল কথা হচ্ছে, যে বিপ্লবের মাধ্যমে, যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন হবে, যেকোনও কৌশলে যেকোনও নীতি, যেকোনও আদর্শের কথা বলে, যেকোনও তত্ত্ব আউড়ে মানুষকে যতদূর সম্ভব তার থেকে বাইরে রাখার কৌশল। কাজেই, এই যে সব থিওরি, আমি সেবা করব, আমি মড়া পোড়াবো, আমি দুঃস্থ মানুষকে খেতে দেব, আমি যদি পয়সা-টয়সা রোজগার করি তবে আর কিছু পারি না পারি গ্রামের গরিব মানুষদের মুখে তো দুটো অন্ন তুলে দিতে পারি। এটাও তো একটা কাজ। হ্যাঁ, খুব বড় কাজ। আমরাও করি, কিন্তু বিপ্লবীরা এই কাজটা করে মানুষকে বাঁচাবার জন্য বিপ্লবের সহায়ক সংগ্রাম অর্থে। বিপ্লবকে কাউন্টারপোজ (বিরুদ্ধতা) করে নয়। বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি একটা আন্দোলনের অর্থে নয়। সেই জন্য বিপ্লবীদেরও অনেক সময় রিলিফ ওয়ার্ক (ত্রাণ সাহায্য) করতে হয়। এই ধরনের কাজ বিপ্লবীরা করে এই অর্থে। আবার অনেকেই করে, ছেলেদের একটা স্পোর্টসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া, লাইব্রেরি করে দেওয়া, ডনখানায় শরীরচর্চা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তা শরীর ভাল হয়ে কী হয়, তারপর গোপাল পাঁঠার দল তাদের টেনে নেয়। ডনবৈঠক করে সব যখন তাগড়াই হল, বুকের ছাতি মেপে দেখলো তৈরি হয়েছে, তখন আমাদের দেশে সব ক্ষমতাশীল দল রয়েছে তারা সব টেনে নিচ্ছে — তাদের দিকে যাও, কিছু পয়সা পাবে। তার দ্বারা কী-কাজ হচ্ছে? বুকের ছাতি বেড়েও কিছু লাভ হয় না। আসল কথা হচ্ছে, যে কারণের জন্য সবল সুস্থ করে যুবকদের গড়ে তুলতে হবে, সেটাতো বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। তাহলে সেই বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে খানিকটা পথভ্রষ্ট করার জন্য অনেক রকমের রাস্তা ওরা বের করে। কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজ মানে সেবাধর্ম, কোথাও স্কুল, কোথাও ভূদান, কোথাও এটা, কোথাও সেটা। কোথাও একজন মনে করল আর কিছু না পারি অন্তত একটা দানখয়রাত করে কিছু গরিব মানুষের কিছুটা উপকার করছি, লোকগুলো বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে বিনা পয়সায় তাদের চিকিৎসা করছি। আমি তো আর কিছু পারছি না, এই কাজটা করছি। একবারও ভাবছেন না যে আপনি অন্য কিছু করতে পারছেন না, এ কথাটা এভাবে ধরলেন কেন? যে লোকের এতখানি ত্যাগ করার শক্তি, তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে সে কি বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক কাজ করতে পারত না? না আপনি ধরে নিয়েছেন, এই দান খয়রাত করাটা একটা মহৎ কাজ। হ্যাঁ, এটা একটা মহৎ কাজ। এইভাবে গরিবদের সঙ্গে থাকা, তাদের কথা শোনা, তাদের উপকার করা মহৎ কাজ, যদি এই কাজের দ্বারা তাদের এডুকেট (শিক্ষিত) করতেন যে তোমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার দরকার। তোমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে এই সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার জন্য বিপ্লবী দল গঠন করা দরকার। গরিব মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে, সেবা করতে গিয়ে যদি এই কথাগুলো বলতেন এবং এই সংগঠন জনতার মধ্যে গড়ে তুলতেন, তাহলে এই কাজটা ছিল যথার্থ কাজ। তাহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা নয় — বিপ্লবের সহায়ক কাজ, বিপ্লবের উপকারী কাজ হতো। তা এই সমাজে আমরা চাই বা না চাই, উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে আমরা কোনওমতেই চলতে পারি না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাদের খাওয়া-পরা, নীতিনৈতিকতা, ধ্যান ধারণা যা কিছু আমরা লালন পালন করি, শোষকশ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে যেগুলো এই সমাজে রয়েছে, আমরা যদি সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হই এবং সেগুলোকে নিতে থাকি উইদআউট অ্যাটেম্পটিং টু ব্রিং অ্যাবাউট এ চেঞ্জ অফ দ্য সোসাইটি (সমাজকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা না করে), তবে আমরা জেনে হোক, না জেনে হোক, পুঁজিবাদী স্বার্থেরই পৃষ্ঠপোষকতা করি। ফলে এখানে আমি কমপ্রোমাইজ (আপস) করছি। আমি এইরকম মনে করি না যে, মালিক আমাকে যে পয়সাটা দিচ্ছে গোলামের মনোভাব থেকে আমি সে পয়সাটা নিচ্ছি। আমি জানি, আমি ডিপ্রাইভড (বঞ্চিত)। আমি জানি আমাকে এক্সপ্লয়েট (শোষণ) করা হচ্ছে। আমি জানি আমার ন্যায্য হক চুরি করে, ফাঁকি দিয়ে, নানা কৌশলে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আমি সেইজন্য এনগেজড ইন পুটিং অ্যান এন্ড টু দিস এক্সপ্লয়টেশন। এই সংগ্রামে আমি যদি নিয়োজিত না থাকি তবে আমি একজন আনকনসাস (অসচেতন) ওয়ার্কার, যে ওয়ার্কার হয়েও, এক্সপ্লয়েটেড হয়েও ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন মেনটেইনিং এন্ড স্ট্রেংদেনিং দ্য ক্যাপিট্যালিস্ট সিস্টেম (শোষিত হয়েও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করা ও শক্তিশালী করার হাতিয়ার) হয়েছি। ওয়ার্কার হয়ে কাজ করে আমি শোষিত বলেই যে পুঁজিবাদী সমাজকে সার্ভ করছি না, তা নয়। একমাত্র ক্লাস কনসাস ওয়ার্কার যে এক্সপ্লয়টেশনের স্বরূপ আন্ডারস্ট্যান্ড করে এবং তাকে দূর করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করে, সেই মজুর গোলামির মনোভাব থেকে মুক্ত। সে মজুর বাস্তবে মালিকি ব্যবস্থার অবসানের সংগ্রামে নিয়োজিত আছে বলে সে কিন্তু হিউমিলিয়েশন থেকে মুক্ত। সে ক্যাপিটালিজমকে সার্ভ করছে না। সে সমাজ প্রগতির আন্দোলনকে সার্ভ করছে। ফলে সে ক্লাস কন্‌সাস (শ্রেণি সচেতন)।

তা হলে এই সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যখন সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়, তখন সেই সম্পর্ক স্থাপনার রীতিটা আমার কী হবে? এমন রীতিতেই কী আমি সম্পর্ক স্থাপন করব, এমন মানসিকতা এবং এমন ধরনেই কী আমার সম্পর্কটা থাকবে, যেখানে আমি এই সমাজ থেকে নেবো কিন্তু এই সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করব না? তাহলে কী হল? যারা এই সমাজের পরিবর্তনকে রুখতে চায়, যারা বর্তমান অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান, যারা যেকোনও উপায়ে হোক নানা মিথ্যাচার দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির তত্ত্ব, দর্শন, নীতিনৈতিকতা সৃষ্টি করে, সমাজের বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামগুলোকে রুখতে চায়, আমি তাদের হাতকেই শক্তিশালী করছি। হতে পারে আমি তাদের দলে যোগ দিইনি। হতে পারে হয়তো পাঁচটা কথায় তাদের বিরুদ্ধেই গালাগালি করছি। কিন্তু আসলে আমি ফিলানথ্রপিস্ট। এই ফিলানথ্রপিজম তো বুর্জোয়া ক্লাস ইন্টারেস্টকেই সার্ভ করছে (এই লোকহিতৈষণা বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থকেই শক্তিশালী করছে)। আমি হয়তো কংগ্রেসকে গালাগালি করছি, পুঁজিপতিদের গালাগালি করছি, বক্তৃতা করছি, ঠিক তারপরই বলছি মানুষকে সেবা কর, চরিত্র তৈরি কর। চরিত্র কিসের জন্য তৈরি করব, সেবা কিসের জন্য? কাকে সেবা করব, কিসের জন্য সেবা করব? সেবা করব মানুষগুলোকে মেরে ফেলবার জন্য তো নয়, মানুষগুলোকে বাঁচবার রাস্তা দেখাবার জন্য। তাদের এডুকেশন দাও, বাট এডুকেশন ফর হোয়াট? গোলাম হওয়ার জন্য? পয়সা কামাবার জন্য, মালিকের মুনাফা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য? আর তার বিনিময়ে একটা টেরিলিনের শার্ট আর বৌ নিয়ে ঘর করবার জন্য? নিজেকে যৌনদাস বানাবার জন্য? নাকি লেখাপড়া শিখবো এইজন্য যাতে লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করার মধ্য দিয়ে এই পুঁজিবাদী সমাজটাকে ভাঙতে পারি, প্রত্যেকটা মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারি। ফলে রিয়েল এডুকেশন ফর হোয়াট? ফর ইম্যানসিপেশন, টু ফেসিলিটেট অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেট দ্য স্ট্রাগল ফর রেভোলিউশন (মুক্তির জন্য, বিপ্লবের জন্য সংগ্রামকে সুগম করা ও ত্বরান্বিত করা জন্য)। নাকি গোলামদের মানুষ যেমন দেয়, অ্যালসেসিয়ান কুকুরকে মানুষ যেমন দেয়, আমার যোগ্যতার নাম করে সে কিছু দেবে তার বিনিময়ে তাকে আমি সার্ভ করব। ইজ এডুকেশন ফর দ্যাট? হ্যাঁ এডুকেশন দিতে হবে মানুষকে, উই স্ট্যান্ড ফর এডুকেটিং দ্য মাসেস, (মানুষ শিক্ষিত করার পক্ষে আমরা) কিন্তু এডুকেশন ফর হোয়াট (শিক্ষা কিসের জন্য)? গিভ দেম এডুকেশন সো দ্যাট (এমন করে সেই শিক্ষা দাও যাতে) তারা সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করে, বুঝতে পারে তাদের সত্যিকারের সমস্যা কোথায়, বুঝতে পারে যে উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সে জড়িয়ে আছে তাকে পরিবর্তনের জন্য যদি সে সংগ্রামে নিয়োজিত না হয় তাহলে এই গোলামি ব্যবস্থাটাকেই টিকিয়ে রাখতে সে নানা যুক্তির অবতারণা করে সাহায্য করছে। বিপ্লবী আন্দোলনে সরাসরি সহায়তা না করলে তাকে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বারা দেখিয়ে দিতে হবে যে বিপ্লবের দ্বারা এই সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বা আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে শোষণ দূর করা সম্ভব। এইটা যদি তিনি দেখাতে পারেন তবে বিপ্লবের দরকার নেই। তাহলে যে রাস্তায় তা সম্ভব, সেই রাস্তাতেই তাকে এগোতে হবে। কিন্তু যখন ক্রাইসিস আফটার ক্রাইসিস (সংকটের পর সংকট) আসবে, রিসেসনের (মন্দার) ধমকি

আসবে, আনসার্টেনটি অফ লাইফ (জীবনের অনিশ্চয়তা) বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকবে, আর তার প্রতিফলন নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি করবে, আনসারটেনটি নিয়ে আসবে ভাবনাধারণায়; চিন্তায়, নৈতিকতায়, পারিবারিক আদর্শে সর্বত্র ঘুণ ধরবে, তার হাত থেকে বাঁচবার রাস্তা কি তোমরা বাতলাতে পারো? একেই আমরা বলি সর্বাত্মক সঙ্কট, আর এই সর্বাত্মক সঙ্কট ইঙ্গিত করছে এই ব্যবস্থায় সমাজের আর অগ্রগতি সম্ভব নয়। এর আমূল পরিবর্তনসাধন দরকার। আর বিপ্লবের রাস্তাই এসবের হাত থেকে বাঁচার একটি মাত্র উপায়। তাহলে বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যতিরেকে এই পরিবর্তন আসতে পারে না। অন্য সমস্ত রাস্তা প্রতারণা আর বুর্জোয়াদের সেবা করার রাস্তা।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমরা এই সমাজের মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করে বাঁচতে পারি না। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক সেটাও উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই সম্পর্ক এবং তার উদ্দেশ্যেই আমরা সোস্যাল বিইং, তার উদ্দেশ্যেই মানুষে মানুষে স্নেহ, মমতা, প্রীতি সব কিছু সম্পর্কের ধারণা গড়ে উঠেছে। উৎপাদন সম্পর্ক বলতে এটা অর্থকরী সম্পর্ক নয়। কেন আমরা দুজন মিলছি? এই দুজন মিলছি মানে দুটো চিন্তা মেলে, দুটো মানুষ মেলে। তা মেলে কিসের জন্য? মেলে প্রোডিউস করার জন্য, সৃষ্টি করার জন্য — ভাবগত এবং বস্তুগত। এই হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পেছনকার কথা।

আমরা যে সমাজে বাস করছি তার একদিকে মালিকগোষ্ঠী, যারা উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক এবং তাদের মুনাফা ও স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য থেকে সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। অপরদিকে বেশিরভাগ মানুষ যারা এই উৎপাদন যন্ত্রে জীবনধারণের তাগিদে যুক্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তারা শোষিত সম্প্রদায়। একদিকে মালিক শ্রেণি অপর দিকে শোষিত শ্রেণি, এই হচ্ছে একটা সমাজের চেহারা। এই দুই শ্রেণির ক্লাস স্ট্রাগল নিয়েই এই সম্পর্ক। আর এই ক্লাস স্ট্রাগলের মধ্যে মার্কসবাদের এই ধারণা যুক্ত যে মানুষের ভাবনাধারণা, রীতিনীতি, নৈতিকতা, মানসিক ধাঁচা, চাওয়া-পাওয়া এই সমস্ত কিছু প্রভাবিত হয় শ্রেণিসংগ্রামের দ্বারা।

আমরা যারা বুদ্ধির দ্বারা এইসব বুঝে শ্রমিক শ্রেণির দল করতে এগিয়ে এলাম, যারা বুঝলাম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির, প্রতিটি শোষিত মানুষের এবং দেশের সর্বাঙ্গীন প্রগতি এবং উন্নতির জন্য সমাজ বিপ্লব করতেই হবে, তারা তো এই বিপ্লব তথা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছায়, ভলান্টারিলি পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছি। সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশের রাস্তা খুলে দিতে হলে, পরিবারগুলোকে মুক্ত করতে হলে, এমনকি আমাদের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মমতা-ভালবাসা— এগুলোকেও যদি সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয় এবং রক্ষা করতে হয়, তাহলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করতে না পারলে, সেই লড়াইটি সাকসেসফুল (সফল) হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সকলের মুক্তির প্রশ্নটি, অগ্রগতির প্রশ্নটি, সমাজ বিকাশের প্রশ্নটি, সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের প্রশ্নটি আমরা চাই বা না চাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এইটি বুঝতে পেরে আমরা শ্রমিক বিপ্লবের অনুগামী হয়েছি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুগামী হয়েছি, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আয়োজন এবং সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আমরা সর্বহারার দল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সাম্যবাদের ঝাণ্ডা ঊর্ধে তুলে ধরেছি। লেনিনের কথা অনুযায়ী— যে শ্রমিক শোষিত হচ্ছে, তার ইম্যানসিপেশনের পথেই সমাজের মুক্তি। যে শ্রমিক এই সচেতনতা অর্জন করতে পারে, সে-ই পুরনো সভ্যতা ভেঙে নতুন করে এই সভ্যতার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু যে শ্রমিক কূপমন্ডুকতায়, কুসংস্কারে, অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, পুঁজিবাদী নানা পচাগলা ভাবধারার শিকার হয়ে গোলামির মনোভাব নিয়ে মালিকের দাসত্ব করছে, সে পারে না। তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলছে, সে মজুরের সন্তান এবং সে শোষিত, শুধু এই চিন্তার মধ্য দিয়েই তার মধ্যে শ্রমিক বিপ্লবের চেতনা অটোমেটিক্যালি (আপনা-আপনি) গড়ে ওঠে না, মজুরের মধ্যে সেই চেতনা নিয়ে যেতে হয়। কে নিয়ে যায় এই চেতনা সমাজের মধ্যে?

মালিক-মজুরের মধ্যে চলছে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে লেবার এবং ক্যাপিটালের, (শ্রম ও পুঁজির) গ্রোয়িং প্রোডাক্টিভ ফোর্স (ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তি) আর এগজিস্টিং প্রোডাকশন রিলেশনের (প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের) মধ্যে যে অ্যান্টাগনিস্টিক দ্বন্দ্ব (বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব), এই দ্বন্দ্বের থেকে সমাজচেতনায়, সমাজের ভাবগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই ধারণা আকাশে ঘুরে বেড়ায় না। সঙ্গে সঙ্গেই পারসোনিফায়েড (ব্যক্তিকৃত) হচ্ছে এই সমাজের কতকগুলো শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। শিক্ষিত মানুষগুলো যে কোনও অবস্থায় থাকুক না কেন, তারা বুঝতে পারে এবং ফিল করতে পারে যে, আমি এক্সপ্লয়েটেড ও হিউমিলিয়েটেড (অপমানিত) কন্ডিশনে রয়েছি। আমার বিবেক, মনুষ্যত্ব পদদলিত হচ্ছে। আমার মধ্যে যে মানুষটা রয়েছে, সে মাথা উঁচু করে তার স্বাভাবিক বিকাশের রাস্তা পাচ্ছে না। এই উপলব্ধির জন্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতির জ্ঞান থাকা দরকার। আবার এদের ডি-ক্লাসড (শ্রেণিচ্যুত) হতে হবে। এরাই শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবের চেতনা নিয়ে যাবে। এটাই লেনিন দেখিয়েছেন। এভাবে এই সব মানুষের মধ্যে মুক্তির চেতনা ধাক্কা দেয়, বিপ্লবের চিন্তাটা ধাক্কা দেয়। দেওয়ার পর সেইখান থেকে তৎক্ষণাৎ তারা সেটা সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করে। এভাবেই সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট, যাকে আমরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা বিপ্লবী আন্দোলন বলি, সেই আন্দোলনের জন্ম হয়।

এই আন্দোলন — যার একটা হচ্ছে ইনজাস্টিসের বিরুদ্ধে, প্রতিদিনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দৈনন্দিন দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে লড়াই করা, আর তারই মধ্যে দিয়ে সমাজচেতনা এবং বিপ্লবী চেতনা মজুরের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাই মার্কসবাদ লেনিনবাদ আর একটি কথা বলছে, ওয়ার্কারদের মধ্যে যাবে ওয়ার্কারের গোলামির মানসিকতা, কুসংস্কারগুলো আয়ত্ত করার জন্য নয়, ওয়ার্কারের মধ্যে যে গোলামির মনোভাব রয়েছে, দাসত্বের মনোভাব রয়েছে সেগুলোর শিকার বনে থাকার জন্য নয়, ওদের যেসব রাস্টিক হ্যাবিট (অমার্জিত অসুন্দর অভ্যাস) রয়েছে, কুসংস্কার রয়েছে, বুর্জোয়া ভাবধারা এবং ব্যক্তিবাদের যে প্রভাবগুলো রয়েছে সেসবের শিকার বনবার জন্য নয়; তাদের মধ্যে যাবে তাদের কমিউনিস্ট বানাবার জন্য, তাদের কমিউনিস্ট চেতনায় উন্নীত করার জন্য। আর তখনই তোমরা এবং তারা মিলে যে শক্তির সৃষ্টি হবে সেই শক্তি সমাজবিপ্লব এবং সমাজ পরিবর্তন সাধন করবে।

তাহলে এই যে সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণিদ্বন্দ্ব-শ্রেণিসংগ্রাম, আমরা লক্ষ্য করি বা না করি, তা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অজ্ঞাতসারেই, আমাদের বুদ্ধির এবং বোঝবার কোনও তোয়াক্কা না রেখেই, আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাস, আচরণ, রুচি, নীতি-নৈতিকতা, মানসিক ঢঙ ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। ওয়ার্কিং ক্লাস (শ্রমিক শ্রেণির) পার্টিটাও তো এই অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছে — এই কথাটা কমরেডদের মনে রাখতে হবে। এই ইনটেনস (তীব্র) ক্লাস ব্যাটল মানে শ্রেণি সংগ্রাম যেটা সমাজে চলছে, যার মধ্যে সে আছে, সে তো এই শ্রেণি সংগ্রামের পরিবেশে বাইরের একটা সত্তা নয়। তাই যেহেতু এই পরিবেশেই কিছু লোকের উদ্যোগে একটা শ্রমিকশ্রেণির দল গড়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই দলের মানুষগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুঝে ফেললো, শ্রমিক শ্রেণির আদর্শ বুঝে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণি সংগ্রামের প্রভাব তার উপরে বর্তালো না বা এই সমাজ পরিবেশের প্রভাব থেকে সে একেবারে মুক্ত হয়ে গেল, তা তো অলীক কল্পনা। তাই যেটাকে আমরা বলি সমাজ পরিবেশের প্রভাব, সেটাও পাশাপাশি থাকবে। তাই এই বুর্জোয়া সোসাইটি যেটা ডমিনেন্টলি (মূলত) ক্যাপিটালিস্ট বা বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থের ভাবনাধারণার দ্বারা প্রভাবিত — পরিবার থেকে, পারিবারিক সম্পর্ক থেকে, স্কুল কলেজের নীতিনৈতিকতার ধারণা থেকে, মাস্টারমশাইদের কর্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত কিছু থেকে যে ধারণাগুলো প্রতিনিয়ত আসছে সমাজে, তা মূলত বুর্জোয়াশ্রেণির ভাবনাধারণা। এই

ভাবনাধারণাগুলো ক্রমাগত শ্রমিকশ্রেণির দলের কর্মীদের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কাজেই কোনও কর্মী সে শ্রমিকশ্রেণির দলের সভ্য হয়েছে, বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করেছে, বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছে, অনেক স্বার্থত্যাগ করে জেলে যাচ্ছে, লড়ছে, কাজেই তার আর বুর্জোয়া ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই — এ হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা, ইলিউশন। রেভোলিউশনারি পার্টির কর্মীদের প্রতিনিয়ত এবং প্রতি মুহূর্তে সতর্কতার সঙ্গে বুঝতে হয়, আমার কোন মানসিক ঢংটা, চিন্তাটা, ফিলিংটা এই পুঁজিবাদী সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণির ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, অথবা শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি আকাঙ্খাজনিত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এই বিচারটি তার প্রতিটি ভাবনাধারণা গড়ে ওঠার সময় করতে হবে। কারণ, তাকে মনে রাখতে হবে ক্লাসস্ট্রাগলের প্রভাব কর্মীদের জীবনে, নেতাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে পড়ছে।

শ্রেণি সংগ্রামের দুটো দিক আছে

ক্লাস স্ট্রাগলের দুটো দিক আছে। একটা হল, শ্রমিক আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলন তার শক্তির তারতম্য অনুসারে সমাজের মানুষগুলোর ওপর তার ভাবনাধারণার প্রভাব ফেলতে চায়। আর অপর দিকটা ঠিক তার বিপরীত। বুর্জোয়াশ্রেণিও তার শক্তির তারতম্য অনুসারে এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া শাসন থাকার ফলে বুর্জোয়া সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার নিয়মকানুন, শৃঙ্খলাবোধ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, ন্যায়নীতিবোধ — এই সমস্ত কিছুর সহায়তায় সে সবসময় বিপ্লবী কর্মীদের মানসিকতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। ফলে, বিপ্লবী দলের কর্মীদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শুধু জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে, বিপ্লবের শ্লোগান নিয়ে, বিপ্লবের তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করছি আর চুপিসারে আমারই আন-অ্যালার্ট (অসচেতন) অবস্থায়, অসতর্ক মুহূর্তে যখন আমি মহা উৎসাহে প্রবলভাবে জনগণের সংগ্রামে ব্যস্ত তখনই ভিতরে ভিতরে অতি সংগোপনে আমার মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের প্রচলিত ভাবধারা নানা উপায়ে, কোথাও সরাসরি, কোথাও ফ্রাসট্রেশনের রূপে, কোথাও বিভ্রান্তির রূপে, কোথাও কমপ্লেক্সের (মানসিক জটিলতার) রূপে, কোথাও নানারকম ফর্মে আমার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমার ভিতর ঢুকে আমাকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে নেয়, আমার বিপ্লবী ফারভার (উদ্দীপনা), চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যা নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম তাকেই গ্রাস করতে চায়। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণিশত্রুরা বিরুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির সচেতন অবস্থাটা, আবার অসচেতন অবস্থার আসল জায়গাটা ধরতে পারে। যেটাকে আমরা শ্রেণি ইনস্টিংক্ট (স্বভাবসিদ্ধ শ্রেণি চেতনা) বলি, তাদের সেটা ভালই আছে। তারা বোঝে কোন জায়গাটায় ঘা দিলে মারাত্মক ঘা দেওয়া হবে। তেমনি শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে যারা সচেতন কর্মী, যারা সবচেয়ে অ্যাডভান্সড ক্যাডার, তারাও ঠিক বুঝতে পারে বুর্জোয়াদের প্রভাব খর্ব করতে হলে কোন জায়গায় এবং কীভাবে মোচড় দিলে, ঘা দিলে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মানুষগুলোকে অতি দ্রুত আমরা বের করে আনতে পারি, মানবিক আবেদনে সাড়া জাগাতে পারি। এই তো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, এই তো হচ্ছে শিক্ষা এবং এরই জন্যই তো আমাদের লড়াই। আবার শুধু এইটি শিখবার জন্যই আমরা লড়ছি না; লড়ছি, পড়ছি, আলোচনা করছি, নানা রকম যুক্তি-তর্ক করছি এবং নানা রকম অভিজ্ঞতা মিলিয়ে মিশিয়ে শিখবারও চেষ্টা করছি।

অসুন্দর না থাকলে সুন্দরের মূল্যই নেই

মনে রাখবেন, এই বিপ্লবের সংগ্রামটাতে অনেক কাঁটা রয়েছে, অনেক রক্তক্ষয়ী কষ্ট রয়েছে, অনেক দুঃখ-বেদনার ঘটনা রয়েছে, অনেক ভাল লাগা মন্দ লাগার বিষয় রয়েছে, তবু বিপ্লবের রাস্তাই আপনার সঠিক রাস্তা — এইভাবে আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি যদি এইভাবে বোঝেন যে এই বিপ্লবের রাস্তাটায় কোনও কাঁটা নেই, কোনও দ্বন্দ্ব নেই, কোনও সংঘাত নেই, কোনও অসুবিধা নেই, কোনও রকমের ভুল ত্রুটি নেই, কোনও রকমের অন্যায় নেই, তা হলে ভুল বোঝা হবে। আবার অন্যায় আছে বলে এ রাস্তাটা পরিত্যাগ করা যায় না। কারণ এই অন্যায়ের দোহাই দিয়ে যদি আপনি এই রাস্তাটা পরিত্যাগ করে গতানুগতিক জীবনে ফিরে যান, তাহলে আপনি একটা বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, যেটা কোনও রাস্তাই নয়। সেটা হচ্ছে, পুঁজিবাদের গোলামির রাস্তা। আপনি বিপ্লবের রাস্তায় যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় হচ্ছে — সেগুলি কারেকশন করার জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। এটার মধ্যে থেকেই আপনার সংগ্রাম। কাজেই আপনার এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে বিপ্লবের রাস্তাটা খুব সহজ সরল। না, তা নয়, এই রাস্তাটা সোজা রাস্তা নয়, সরল রেখাও নয়, এটা একটা নির্লিপ্ত আরামের রাস্তাও নয়, কিন্তু অসুন্দর নয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা কথা ভাল করে বোঝা দরকার। সুন্দর, আনন্দময় এই কথাগুলোর কোনও মানে নেই যদি ভাবি শুধু সুন্দরই থাকবে; তবে তো সুন্দরের কোনও গুরুত্ব থাকে না। অসুন্দর পাশাপাশি এসে কনস্ট্যান্টলি (ক্রমাগত) সুন্দরকে মারতে চায়, আর তার জন্যই তো সুন্দরের এত কদর। সেই কারণে তো সুন্দরকে গ্রহণ করার জন্য মানুষের এত আকুলতা। শুধু যদি সুন্দরই থাকত তাহলে সুন্দর নিয়ে কেউই মাথা ঘামাত না। তাই যখনই সুন্দরের কথা বলবেন তখনই মনে রাখতে হবে বিপ্লবী আন্দোলনে সুন্দরই আছে, অসুন্দর নেই — এটা বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে কোনও চেতনাই নয়। কোনও আন্দোলন সম্বন্ধেই এ কোনও চেতনাই নয়, কোনও কিছু সম্বন্ধেই সত্যিকারের চেতনা নয়। যেখানেই সুন্দর আছে সেই পরিবেশে তার মতো করে সেখানে অসুন্দরও আছে। তাই বিপ্লবী আন্দোলনেও নিয়ত সুন্দর অসুন্দরের লড়াই রয়েছে, ন্যায় অন্যায়ের লড়াই রয়েছে, ভালমন্দের লড়াই রয়েছে, উচিত অনুচিতের লড়াই রয়েছে। নাহলে উচিতও থাকত না, অনুচিতও থাকত না। উচিত সম্বন্ধিত ধারণা সর্বসময়ে সর্বকালে এক নয়। ন্যায় সম্বন্ধিত ধারণা সর্বকালে সবসময়ে এক নয়। অন্যায় সম্বন্ধিত ধারণাও তাই। অন্যায়ের প্রকৃতিও সর্বসময়ে সর্বসমাজে এক নয়। তাই বিপ্লবের মধ্যে অন্যায়ের যে ধারণা বা অন্যায় যেটা ঘটে বলে ভাবি,পুঁজিবাদের বহু ন্যায় ধারণার চেয়ে তা অনেক উন্নত স্তরের। এই কথাটা সবসময়ে মনে রাখতে হবে। কিন্তু, বিপ্লবী আন্দোলনের ন্যায়ের মাপকাঠিতে সেখানেও বারবার অন্যায় এসে ন্যায়ের পথ আটকাতে চাইবে। কতটা আটকাতে পারবে, কত কম আটকাতে পারবে, কত কম বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারবে এটা নির্ভর করে নেতৃত্ব কত যোগ্য, কর্মীরা কত অ্যালার্ট ও সংহত — এই তিনটি ফ্যাক্টারের ওপর। কিন্তু অন্যায় ঘটতেই পারে না, বিপ্লবী আন্দোলন এত ইউটোপিয়ান ধারণা নিয়ে চলে না। কোনও একটা অন্যায় দেখলেই সাথে সাথে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, যারা তখন ভাবতে বসে তাহলে আর কী হবে — এ মানসিকতায় তার তো বিপ্লবী আন্দোলনকে বোঝা হবে না। হ্যাঁ, নেতারা কোনও প্রশ্নে ভুল করেছে, অমুক নেতা অন্যায় করেছে, অমুক জিনিসটা ঠিক হয়নি, এই প্রশ্নগুলো পার্টির মধ্যে জোরের সঙ্গে তুলতে হবে, বলতে হবে এবং ফাইট করতে হবে। কিন্তু নীতিবিগর্হিত উপায়ে নয়, পার্টির শৃঙ্খলা এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার যে রীতিপদ্ধতি রয়েছে তাকে লঙ্ঘন করে নয়। কারণ সেটা গড়ে উঠেছে সকলের সর্বাত্মক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে। পার্টির আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সামগ্রিক সর্বাত্মক স্বার্থবোধ তার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো নীতি, ধারণা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার রীতি আমাদের নির্ধারিত হয়েছে। তাহলে সেই রীতির মধ্যে এই অন্যায় ও ভুল-ত্রুটিগুলো যখন যার চোখে পড়বে, তাকে জোরের সঙ্গে বলতে হবে। হোক ভুল, ভুল হলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভুলই যখন বুঝেছি, ভুল ভাবেও যদি আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠে থাকে, আমি যা মনে করি তা বলাই উচিত। শুধু আমি চাই, বলাটা যেন এলোমেলো না হয়, বিশৃঙ্খলভাবে যেন না হয়, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সর্বাত্মক স্বার্থবোধ থেকে যে রীতি-নীতি নির্ধারিত হয়েছে তাকে যেন লঙ্ঘন করা না হয়। তাহলেই আমি খুশি হবো। বরং, ভয় পেয়ে না বললে আমি অখুশি হবো। আমি চাই পার্টির সকল এগজিকিউটিভ (কর্মকর্তা) এবং নেতারাও যেন তাই মনে করেন। সর্বসময় সকলে ঠিক মতো সমস্ত প্রবলেম ট্যাকল (ফয়সালা) করতে পারেন কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু চিন্তাগত ক্ষেত্রে আমার এই কথার বিরোধিতা কেউ করতে পারেন না। কাজেই একটি কমরেড বা একজন নেতা এই রকম আচরণ করেছেন, পার্টি প্রিন্সিপলের

সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই বলে তোমার মনে হচ্ছে, প্রথমত এই মনে হওয়াটা ঠিক কিনা সেটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির সঙ্গে বিনিময় করে প্রথমে জেনে নিতে হয়। কারও সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে আগে তার সাথেই আমি কথা বলি। বোঝার চেষ্টা করি আমি ভুল কিনা। কারণ আমার মনে হওয়া সব সময়ে সঠিক না হতেও পারে আবার ঠিকও হতে পারে, এমনকি যা চোখে দেখলাম তাও সবসময় সত্য হয় না। তুমি যদি বিজ্ঞানের কথা বুঝে থাকো, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কিছুমাত্র বুঝে থাকো, তাহলে তোমার মনে হওয়া এবং দেখার মধ্যেও অনেক না বোঝা জায়গা থাকে। সেইজন্য সেটা আগে বুঝে নিতে হবে। প্রপার মাইন্ড অফ এ রেভোলিউশনারি হচ্ছে (একজন বিপ্লবীর সঠিক মানসিকতা হচ্ছে), আমার যখন স্ট্রাইক করল (মনে ধাক্কা দিল), স্ট্রাইক করায় অন্যায় হয়নি, কিন্তু ধারণা তৈরি করার আগে আমি প্রথমে বুঝে নেব, যেটা আমি দেখলাম এবং আমি যা ভাবলাম, ব্যাপারটা যথার্থ এরকমই কিনা। এমন কিছুও তো হতে পারে যা আমি চিন্তা করিনি বা ভাবিনি, আগে শুনিনি বা আমার জানা ছিল না। এখন জানার পরে, শোনার পরে যদি দেখি যে আমি যা ভেবেছিলাম সেটাই ঠিক, আমি তৎক্ষণাৎ সেটা বলব। কিন্তু আমি যে পয়েন্টটা আপনাদের বলছিলাম, সেটা হচ্ছে, যে জিনিসটা আমাকে খেয়ালে রাখতে হবে যে, যদি আমি ধরেও নিই যে আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটাই ঘটেছে, তাহলে আমি সেটা তুলব, ফাইট করব। কিন্তু আমি এমন ভাবব না, এরকম একটা আইডিয়া রিফ্লেক্ট (ধারণা প্রতিফলিত) করব না যে এইরকম যখন হচ্ছে তাহলে কী হবে? এটা আমার ইগনোরেন্সকেই (অজ্ঞতাকেই) রিফ্লেক্ট (প্রতিফলিত) করে। কী ইগনোরেন্স? আমি মনে করি বিপ্লবী আন্দোলনে কোনও ঝঞ্ঝাট, কোনও সমস্যা, কোনও ক্ষেত্রে কোনও রকমের কোথাও কোনও অন্যায় নেই ।

বাস্তব জীবনের চাপে বিপ্লবের কাজ করতে না পারার অর্থ কি

আমরা যখন অপরের অন্যায় নিয়ে আলোচনা করি, তখন তার মেইন ট্রেন্ডটা (মূল ধারাটা) এবং ফিচারটা (বৈশিষ্ট্য) নিয়েই আলোচনা করি। একটা বিচ্ছিন্ন অন্যায়ের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি না। আর কী নিয়ে আমরা আলোচনা করি? অন্যায় বা অধঃপতন যে ঘটছে, তা রুখবার জন্য পার্টি নেতৃত্ব তার বিরুদ্ধে লড়ছে কিনা! কারণ, প্রতি মুহূর্তে পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে, নেতৃত্বের চরিত্রের মধ্যে অধঃপতন ঘটাবার জন্য সমাজপরিবেশে যে শক্তি কাজ করছে, সেই শক্তিটা প্রবল। সেটা বারবার এসে নেতা-কর্মীদের আঘাত করছে। সমাজপরিবেশ বা বাস্তব জীবন যেগুলোকে আপনারা বলেন লাইফের উপর তার ইমপ্যাক্ট (ধাক্কা), তার ফলে আপনারা বলেন, বাস্তব জীবনের চাপে পড়ে আমরা করতে পারি না। এই কথাটার মানে কী? এই কথাটার মানে বুর্জোয়া সমাজের আক্রমণ শ্রমিক আন্দোলনের ওপর পড়ছে — এটা কি আপনারা বোঝেন না? এই যে বাস্তব জীবনের চাপে আমি কাজ করতে পারি না, আসলে আপনি আপনার ভাষাটাকে ভদ্রভাবে বললেন। কিন্তু আসলে বুর্জোয়া সমাজের চক্রান্ত এবং শ্রমিক আন্দোলনের ওপর তার আক্রমণের একটা রূপ হল বাস্তব জীবনে চাপ সৃষ্টি করে আপনাকে দুর্বল ও পর্যুদস্ত করা, আপনার মনোবল ভেঙে দেওয়া। বুর্জোয়ারা বারবার এই চেষ্টা করে। তাহলে আপনি বাস্তব জীবনের চাপে — একথা বলছেন কেন? বলুন বুর্জোয়াদের এই আক্রমণটা প্রতিরোধ করার কথা। আসলে আপনি ভাবেনই না যে এটা বুর্জোয়াশ্রেণির একটা আক্রমণ। ক্লাস স্ট্রাগলে বুর্জোয়াদের আক্রমণের ফলে বুর্জোয়া ভাবের যে ইমপ্যাক্ট, বুর্জোয়া সমাজের ষড়যন্ত্রের যে প্রভাব, সেইটাই আপনার ওপর বর্তাচ্ছে। আপনার অ্যালার্টনেস থাকলে এটা আপনি বুঝতে পারতেন যে এটা একটা ষড়যন্ত্র যেটা আমাকে কাবু করতে চায়। তাই মনে রাখতে হবে যে, অনেক কথা আমরা বুঝি, কিন্তু এইভাবে বুঝি না। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, বোঝাগুলো সারফেস লেভেলে (ওপর ওপর) হচ্ছে, গভীরভাবে হচ্ছে না। সেই জন্য একটা কথা বলেছিলাম যে, বুদ্ধি দিয়ে মার্কসবাদ বুঝলেই বা বই পড়ে কতগুলো কথা বললেই মার্কসবাদ আয়ত্ত করা যায় না। হৃদয় দিয়ে, রক্ত মাংসের সাথে তাকে মেলাতে পারলেই পুঁজিপতিদের ছলনার অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা বুঝতে পারি, সেটা বাইরের কথা থেকে আমাকে বুঝতে হয় না। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আমার যে কোনও মানসিকতা বা ভাবনা-ধারণা তা তো কোনও শ্রেণিস্বার্থবোধহীন এবং শ্রেণিউদ্দেশ্য মুক্ত ধারণা-ভাবনা হতে পারে না। এমনকি যৌন অনুভূতি পর্যন্ত যেটা সম্পর্কে মানুষের মনে হবে একটা টেনডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশন (বংশবৃদ্ধির প্রবণতা) — একটা দৈহিক কামনা, এর মধ্যে আবার বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থবোধ কী? যখন বুর্জোয়ারা ছিল না তখনও তো মানুষের কামের বোধ ছিল। কামের বোধ পশুরও তো আছে। ফলে, তার মধ্যে আবার বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থবোধ কী আছে? হ্যাঁ, মানুষের কামের বোধেও শ্রেণিস্বার্থবোধ আছে। সেক্স ইজ নট ফ্রি ফ্রম প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স (ব্যক্তি সম্পত্তির মানসিক জটিলতা থেকে যৌনতা মুক্ত নয়)। সেই জন্য ফাইট ফর দ্য ফ্রিডম অফ সেক্স, ফ্রিডম অফ লাভ (যৌনতা ও প্রেমের মুক্তির জন্য সংগ্রাম) আছে, ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইট টু ফ্রি ইওর এনটায়ার মেন্টাল ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড প্রোডাকশন ফ্রম প্রাইভেট প্রপার্টি কার্বস (উৎপাদন ও সমগ্র মননশক্তিকে ব্যক্তিসম্পত্তির নানা প্রভাব থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম আপনাকে করতে হবে)। যখন প্রাইভেট প্রপার্টিকে অ্যাবলিশ (অবলুপ্ত) করতে সক্ষম হলাম তৎক্ষণাৎই সুপারস্ট্রাকচারে (উপরিকাঠামোতে) মানসিক গঠনে প্রাইভেট প্রপার্টির আধারের ওপর, বুনিয়াদের ওপর যে মানসিক গঠন, সেক্সের চাওয়া পাওয়ার গঠন, সেক্স ইমপালসের কার্ভ (যৌন অনুভূতির বিভিন্ন ধরন) এবং রীতিনীতি, ইমোশন, ভালবাসা, ভাললাগা, মন্দলাগা, ন্যায়নীতির ধারণা, যেগুলোকে আমরা সুপারস্ট্রাকচার বলি, স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন বলি, স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশনে অর্থাৎ মানুষের ভাবগত জগতে প্রাইভেট প্রপার্টিকে ভিত্তি করে যে মনোভাবগুলো গড়ে উঠেছে, যে ধাঁচাটা গড়ে উঠেছে, প্রাইভেট প্রপার্টির মেটিরিয়্যাল কন্ডিশন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিদায় নেবে না। অর্থাৎ প্রাইভেট প্রপার্টি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যখন বিপ্লব করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল, সেই মেটিরিয়্যাল কন্ডিশনে আমরা প্রথম অবস্থাতেই সুপারস্ট্রাকচারে আমাদের যে মানসিক গঠন এবং মেন্টাল কমপ্লেক্সের সমস্ত জিনিস সাথে সাথেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে না।

একটা কথা এখানে বোঝবার আছে যে, উৎপাদন এবং বন্টন সংক্রান্ত প্রশ্নে আমাদের মধ্যে যে বিরোধ, ঈর্ষা এবং কম্পিটিশনের মনোবৃত্তি রয়েছে তা যতক্ষণ না অবলুপ্ত হবে, ততক্ষণ ক্লাসলেস সোসাইটি (শ্রেণিহীন সমাজ) হবে না, স্টেটলেস (রাষ্ট্রহীন) সোসাইটি হবে না। সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেলেই সুপারস্ট্রাকচারের ভাবনাগত ক্ষেত্রে এবং সম্পত্তিবোধ থেকে উদ্ভুত ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধারের ওপর যে মানসিক কাঠামো এবং ধাঁচা গড়ে উঠেছে, তার সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে না। অনেক দেরিতে ঘটবে, তার হ্যাংওভার (অবশিষ্টাংশ) সুপারস্ট্রাকচারে থাকবে, নতুন সুপারস্ট্রাকচার যেটা গড়ে উঠবে তার মধ্যে পুরনো সুপারস্ট্রাকচারের অনেক হ্যাংওভার থাকবে। এইটি যারা ভাল করে বোঝে না, তারাই বুঝতে পারে না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে যাওয়ার পরও, শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখল করার পরও, বুর্জোয়া মনোবৃত্তিগুলো কীভাবে এসে শ্রমিক বিপ্লবকে এবং শ্রমিকরাষ্ট্রকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে, কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেতর থেকে খেয়ে দেয়, তার নেতৃত্বকে রিভিশনিস্ট করে তোলে, তাকে বিপ্লবের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। সেইজন্য এটা একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

আমরা এইসব বিচারগুলো করি না। এই বিচারগুলো যদি আমাদের খুব ভাল থাকে, আমরা যদি বুঝি যে আমরা বিপ্লব করতে এসেছি কারও জন্য নয়, আবার সকলের জন্য। এটা একটা কথার কথা, এভাবে বুঝলে চলবে না। উই আর ফর অল বাট উই আর ফর নো বডি আলটিমেটলি (আমরা সবার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা বিশেষ কারো জন্য নয়)। এ কথার মানেটা হল, আমরা মানুষের জন্য, জনসাধারণের জন্য। একথার মানে আমি রামের জন্য বা শ্যামের জন্য নই। মানুষ থাকবে, জনতা আছে, জনগণের সংগ্রাম আছে। বিপ্লব আছে, তার সঙ্গে মানুষের মুক্তি ও বিকাশের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই আমি যে সচেতন মানুষ, কানট বাট অ্যাক্ট কনসাসলি ইন দ্যাট প্রসেস (সেই প্রক্রিয়ায় আমি সচেতনভাবে কাজ না করে পারি না)। তা না হলেই আমি বিবেকের কাছে দোষী হবো, আমি

মনুষ্যত্বের কাছে অপরাধী হবো। আমি বিপ্লবী সংগ্রামে এসেছি এজন্যই তো?

বিপ্লবী পার্টি সেবা প্রতিষ্ঠান নয়

আর একটা বিষয় এখানে প্রশ্ন হিসাবে না হলেও মনের মধ্যে আসতে পারে যে — এই তো অমুক কমরেড ভাল আছে, এই সব লিডাররা বেশ আছে, অথচ আমি খেতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, লিডারদের এবং সকল কর্মীর উচিত যেকোনও কর্মী কষ্টের মধ্যে পড়লে তার প্রতি সাধ্যমত নজর রাখা, চোখ রাখা। এটা একটা কালেক্টিভের (যৌথ জীবনের) স্বাভাবিক নীতি-নৈতিকতাবোধ। এই অ্যালার্টনেসটা, উইসডমটা (জ্ঞান), লিডার থেকে শুরু করে সকল কর্মীর মধ্যে থাকা উচিত। এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আবার আমার তেমন ভাল অবস্থা নেই বলে আমার আক্ষেপ থাকবে কেন? আমি কী আমাকে কেউ দেখবে বলে বিপ্লবে এসেছিলাম, নাকি আমি আমার নিজের মুক্তির রাস্তাটি বিপ্লবী সংগ্রামে নিহিত আছে বলে এসেছিলাম। তাতে যদি বিপ্লবের মধ্যে এই রকমের অ্যালার্টনেসের অভাব, হীনমন্যতা কিছু কিছু এসে যায়, বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যেই তো সেটা আমার ফাইট করার বিষয়। আমার তরফ থেকে অ্যাটিচিউডটা কনসাস (দৃষ্টিভঙ্গি সচেতন), না হলে এই রকম ভাবনা আসবে। অর্থাৎ ঘটনাটা এইরকম — কোনও একটা কর্মী বিপদগ্রস্ত হয়ে ভাবছে আমাকে দলের কর্মীরা দেখছে না, নেতারা দেখছে না। না, এটা রং পোজিং অফ দ্য কোয়েশ্চেন (প্রশ্নের ভুল উপস্থাপনা)। ইট রিফ্লেক্টস (এটা বোঝায়) সে বিপ্লব ভাল বোঝেনি, কেন বিপ্লবে এসেছিল সেটাও বোঝেনি। তার অ্যাটিটিউড হবে, আমার যে প্রবলেম সেটা একান্তই আমার। আমরা পার্টিকে সাহায্য করব। আমরা সকল কর্মীকেই সাহায্য করার চেষ্টা করব। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়েছি মানে, সকল কর্মীকে বিপ্লবী হতে সাহায্য করব। তার মানে, সকল কর্মীর বাড়ি-ঘরের সমস্যা দেখবার জন্য আমরা সকলে বিপ্লবী দলের মেম্বার হইনি। আমার মানসিকতা হবে, আমার সমস্যা আমি নিজে মোকাবিলা করব, বরং অন্যান্য কর্মীরা যদি দিতে চায় আমাকে, আমি সচেতন কর্মী হলে বলব যে না না আমাকে দেওয়ার দরকার নেই। আই ক্যান উইথস্ট্যান্ড ইট (আমি নিজে মোকাবিলা করতে সক্ষম)। গিভ হেল্প টু আদার কমরেডস (অন্য কমরেডদের সাহায্য করুন)। ঐ কমরেডটি দুর্বল, সে পারছে না ফাইট করতে, তাকে সাহায্য কর, আমাকে করার দরকার নেই। ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর এনার্জি (আপনার অহেতুক শক্তি ক্ষয় করার দরকার নেই), আই ডোন্ট নিড ইওর হেল্প (আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন নেই) — এই হবে তার যথার্থ মানসিকতা। দলের অন্যান্য কর্মীদের মানসিকতা হবে তার পাশের কর্মীটি ডাউনট্রডন (দুস্থ), ফলে এই অবস্থায় কীভাবে তাকে হেল্প করতে পারি। এই হচ্ছে যথার্থ দিক। যদি সেটা না করে, তাহলে এদের যেমন অ্যালার্টনেসের অভাব, উইসডমের অভাব ঘটল, তেমনি আবার কোনও কমরেড যদি মনে করে যে আমাকে হেল্প করল না, তাহলে আর আমার এই দলে থেকে কী হবে, কেউ তো এখানে আমাকে দেখল না তাহলে কি! আমাকে দেখবে এই জন্যই আমি বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিলাম? সে তো ফান্ডামেন্টাল (মূল) প্রশ্নটাকে গন্ডগোল করে ফেলেছে। আসলে সে একটি রং অ্যাপ্রোচ (ভুল দৃষ্টিভঙ্গি) মনের মধ্যে, চিন্তার কাঠামোর মধ্যে গড়ে তুলছে। সে অ্যাপ্রোচটি হচ্ছে যে, বেশিরভাগ কমরেড আসবে দুর্বল ঘর থেকে, না খাওয়া ঘর থেকে, খুব কম কমরেডই আসবে যাদের হয়ত খাওয়া-পরার দিক থেকে তেমন অসুবিধা নেই। তারা আসলে আমরা খুশি হই কারণ তারা এসে আমাদের সাহায্য করে। আমি না খেয়ে আছি বলে তো আমি এরকম মনে করব না যে, আমার মতো সেও কেন না-খেয়ে থাকবে না। এটা কী? এতো বুর্জোয়াদের ব্যবসায়ী কম্পিটিশনের খারাপ মনোবৃত্তি। এটা কী বিপ্লবী কর্মী হওয়ার ভাবনা? আমার বিপ্লবের কাজে সে সাহায্য করবে, এটাইতো আমার দরকার। আমি বরং তার পার্টির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আর তারই সাথে আমার মহত্ত্ব-উদারতা-সেল্ফ লেসনেসের (নিঃস্বার্থ মানসিকতার) দ্বারা তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করব, যাতে সে নিজেই একদিন আমার মতো একটা কর্মী হতে পারে। যতটুকু সে এখন পারছে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেন তাকে আঘাত করব। কেন ভাববো, হয় সে আমার মতো সর্বস্ব দিয়ে করুক, না হয় সে চলে যাক। তাতে পার্টির কী লাভ হবে? আমার কাজে সে যতটুকু হেল্প করছিল সেইটুকু তো আমি কাজে লাগালাম না। এই রকম কোনও শ্রেণিসচেতন কর্মীর ভাবনা হতে পারে না। আর একটা কথা কর্মীটি ভুলে যাচ্ছে যে, দল যদি এইরকম প্রতিটি দুর্বল কমরেডের হেল্প করার জন্যই হয়, তাহলে দল বলে আর কোনও জিনিস থাকবে না। ইট উইল বি ট্রান্সফরমড ইনটু এ সোসাইটি ফর হেল্প, সেবাসদনে পর্যবসিত হবে। আর এই সেবাদলগুলি কোনটাই চলে না মালিকের টাকা ছাড়া। মালিকশ্রেণির টাকা ছাড়া, সিআইএ-র টাকা বা আমেরিকার টাকা ছাড়া কোনও সেবাসদন চলে না। রেভোলিউশনারি পার্টিকে তো সেবাসদনে ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমরা দলে আসিনি। এখানে সমস্ত ক্যাডাররা এসেছে ভলান্টারিলি (স্বেচ্ছায়) বিপ্লবী কর্মী হবে বলে, বিপ্লব করবে বলে। প্রত্যেক কর্মীর মানসিকতা এইরকম হবে যে, প্রতিটি কমরেড পার্টিকে হেল্প করবে, আমরা পার্টিকে হেল্প করবো। সেখানে আমার অসুবিধা হচ্ছে বলে পার্টির কি রিসোর্স নষ্ট হচ্ছে সেটা আমার আলোচ্য বিষয় হবে না, পার্টির পরিকল্পনার অর্থে, পার্টির সামগ্রিক স্বার্থে রিসোর্সের কি ওয়েস্টেজ হচ্ছে সেটা আমার আলোচ্য বিষয় হবে। কারণ তা না হলে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে দুষ্ট ক্ষত থেকে গেল। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ থেকে আমি পার্টির ক্রিটিসিজম (সমালোচনা) করছি, আমি ক্ষুব্ধ বলে ক্রিটিসিজম করছি। নট দ্যাট আমি ক্ষুব্ধ নয়, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু তবু কতগুলো পয়েন্ট যেগুলো পার্টির স্বার্থে পার্টির অগ্রগতির জন্য সমালোচনা করা দরকার, আমি সেইগুলো সমালোচনা করছি। কিন্তু আমি সেভাবে করছি না। তাই একটা রাইট (সঠিক) পয়েন্টও যদি আমি ক্ষোভ থেকে বলে থাকি, তাহলে রাইট পয়েন্টটাও দূষিত হয়ে যায়। কারণ রাইট পয়েন্টটাও আমি তুলেছি পয়েন্টটা রাইট বলে নয়, আমি ক্ষুব্ধ বলে। আমি ক্ষুব্ধ না হলে হয়তো আমার উত্থাপিত এই রাইট পয়েন্টটা অগ্রাহ্য হতো না। অনেক সময় একজন ক্ষুব্ধ ক্যাডারও যে রাইট পয়েন্ট তোলে সেই রাইট পয়েন্টটাও অগ্রাহ্য হয়ে যায়। তবে নেতাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে ক্ষুব্ধ পজিশন (অবস্থান) থেকেও যদি কেউ প্রশ্ন তুলে থাকে, প্রশ্নটা যদি রাইট হয়, এনটারটেইন করা (শোনা) উচিত। কিন্তু সাথে সাথে সেই কমরেডটিকে পয়েন্ট আউট করা দরকার যে, ইউ হ্যাভ নো রাইট টু রেইজ ইট (তোমার এই প্রশ্ন তোলার কোনও অধিকার নেই)। কারণ, তুমি পয়েন্টটা রং বলে তোলনি, তুমি ক্ষুব্ধ বলে তুলেছ। সো ইউ অ্যানালাইজ ইওরসেল্ফ (তুমি নিজেকে বিশ্লেষণ কর)। তবে তুমি তুলেছ একটা সত্য জিনিস, ক্ষুব্ধ বলে হয়তো তোমার চোখে পড়েছে, কিন্তু সেটাও আমাদের কাজে লাগবে বলে আমরা এনটারটেইন করছি। সেটা তো হচ্ছে আমাদের কাজ। কারণ কোনও দোষ ত্রুটি; কোনও দিক থেকে এমনকি শত্রুপক্ষও যদি তুলে ধরে, শত্রুতার মোটিভ (উদ্দেশ্য) নিয়েও যদি সে তুলে ধরে, যদি সেটায় খানিকটাও সত্য থাকে, তাহলে শত্রু বলছে বলে আমরা ফেলে দেব না। আমরা যেমন শত্রুপক্ষ যে শত্রুতার মনোভাব নিয়ে বলেছে সে সম্বন্ধে ক্যাডারদের অ্যালার্ট করব, সাথে সাথে যেটা বলেছে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকলে, সেটা অত্যন্ত সিরিয়াসলি ডিসকাস (গভীরভাবে আলোচনা) করব, প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব।

আর একটি পয়েন্ট, যেমন অনেকে বলে যে ও কিছু হবে না, ও-মশাই অনেক করে দেখা গেল কিছু হবে না। আমরা ঘর-দোর ছেড়েছিলাম, অনেক লড়েছিলাম, হারমোনিয়াম গলায় নিয়ে অনেক গণসঙ্গীত করেছিলাম, পরে বুঝেছি মশাই এসব করে-টরে কিছু হবে না। সিপিআই এবং সিপিএম-এর পুরনো আইপিটিএ'র সব মহারথীরা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিরা বলেন, বাপু হে, এসব যৌবনের উৎসাহের প্রাবল্যে করছ, কিন্তু দেখো এসব করে হবে না। ফলে তাদের পরামর্শ, মহাজনের পন্থা অনুসরণ কর। আমরা হারমোনিয়াম-টারমোনিয়াম নিয়ে অনেক গানটান করেছি। কিছু হল কি আমাদের? তার মানে ওনাদের হওয়ার জন্য ওনারা বিপ্লবে এসেছিলেন। প্রথম গলদই হচ্ছে, তাদের কিছু হবে বলে তারা সব বিপ্লবে এসেছিলেন। তাদের কিছু হল না, তাই এখন

প্রফেসনাল নাটক, হিন্দী ফিল্ম বা এনিথিং তারা করে বেড়াচ্ছেন। কারণ কিছু একটা হওয়া চাই। আমি বলি, তার জন্য বিপ্লবে আসার দরকারটা কি? আমি এর মাথা-মুন্ডু কিছু বুঝতে পারি না। আমাদের কিছু হবে বলে কি আমরা বিপ্লবে এসেছি নাকি? আর তা যদি না হয়, তাহলে তো আমাকে দেখার প্রশ্নটা হচ্ছে ফলস (ভুল) প্রশ্ন। প্রত্যেকের অ্যাটিচিউড যদি সঠিক হয়, তার ভাবনা হবে আমার কথা নিয়ে পার্টিকে ভাবাবো কেন, ভাবাতেই যদি হয় অন্য সমস্যা নিয়ে ভাবাবো। আমি পার্টিকে ভাবাবো রাজনীতি নিয়ে, সংগঠনের সমস্যা নিয়ে। আমার সমস্যাকে সংগঠনের সমস্যা করে কেন আমি পার্টিকে ভাবাবো। আর তা নিয়ে পার্টিকে ব্যস্ত করব কেন? মাসকে (জনগণকে) নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা, পার্টিটাকে আগে বাড়ানো, প্রোপাগান্ডাটাকে বেটার (প্রচার আরও উন্নত করা) করা, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটির ইনিশিয়েটিভ কিভাবে বাড়ানো যায় এবং আরও কতরকমভাবে পার্টির ওয়ার্ক স্প্রেড করানো (ছড়িয়ে দেওয়া) যায়, আমার ভাবনা হবে পার্টি নেতৃত্বকে এসব নিয়ে ভাবানো। যদিও আমি জানি উইক (দুর্বল) কমরেডদের যে প্রবলেম হয় তার সলিউশনের জন্য নেতাদের হেল্প দরকার হয়। কিন্তু সেখানে কোনও সময়েই সেই কমরেডদের এই কনফিউশন (সংশয়) থাকবে না যে এটা অর্গানাইজেশনাল প্রবলেম। এটা তাদের পার্সোনাল প্রবলেম। এক্সপিরিয়েন্সড (অভিজ্ঞ) লিডার এবং ক্যাডারদের কাছ থেকে তারা বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে তাদের সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য চেষ্টা করবে। আর সেটা সকল কমরেডই করবে, যেমন করে ছাত্র টিচারের সাহায্য নেয়, যেমন রোগমুক্তির জন্য মানুষ ডাক্তারের সাহায্য নেয় বা নানা ক্ষেত্রে নানা লোকের সাহায্য নেয়, সেইভাবেই দলের নেতাদের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু তারা এই প্রবলেমটা সংগঠনের একটা সমস্যা বলে ভাববে কেন? এই ভাবনার রীতিটি তার ভুল, কারণ সে বিপ্লব সংক্রান্ত ধারণাই গোলমাল করে ফেলেছে।

বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তি কী

আর একটা জিনিস কিছু কমরেডদের মধ্যে খুব অদ্ভুতভাবে কাজ করে এবং কিছু লিডিং (নেতৃস্থানীয়) কমরেডদের মধ্যেও সেটা দেখতে পাই। পার্টির চেতনাসম্পন্ন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, শ্রমিকশ্রেণির দলের কর্মপদ্ধতি এবং কার্যধারা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা আছে যে কর্মী বা নেতাদের, তাদের মনে রাখতে হবে — পার্টির নেতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণা, কর্মী সংক্রান্ত ধারণা, পার্টির তত্ত্বগত নেতৃত্ব বা সংগঠনগত নেতৃত্বের আধারের ওপরই হয়, জনগণের আন্দোলনের নেতৃত্বের আধারের ওপরই হয়। এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী হওয়ার ওপর তা হয় না। আমি দেখি একটা বিচিত্র কমপ্লেক্স কারও কারও মধ্যে আছে। অনেক সময় ইলেকশন রাজনীতিতে আমাদের এমন অনেক লোককে আমরা ক্যান্ডিডেট (প্রার্থী) করে দিই বা দিতে বাধ্য হই, যাদের মাসের কাছে অ্যাপিল (আবেদন) আছে, ড্যাসপুশ আছে (বাহ্যিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে সামনে এসে যাওয়ার ক্ষমতা আছে)। অথচ দেখা গেল শ্রমিকশ্রেণির দলের ন্যূনতম মেম্বারের যোগ্যতাও সে লোকটি অর্জন করেনি। তাকেও অনেক সময় ইলেকশন ব্যাটল-এ ক্যানডিডেট করতে হয়। হয়ত তারা কখনও কখনও ইলেকশনে জিতেও যায়। আর জিতে গেলেই এরা জনগণের কাছে একজন নেতা হয়ে ওঠে। পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মীর তুলনায় সে সাধারণ মানুষের কাছে নেতা হয়ে যায়। কিন্তু এই নেতা হওয়ার অর্থ কি সে যথার্থই একজন নেতা? নেতৃস্থানীয় কর্মী না হয়েও সে জনগণের নেতা বনে যায়, যেহেতু জনগণ পশ্চাদপদতার জন্য এইভাবেই ভাবে। প্রকৃত নেতৃস্থানীয় কর্মী কিনা তা নির্ভর করে সংগঠনের কতখানি দায়িত্ব সে পালন করে এবং দলের তত্ত্বগত আন্দোলন এবং নেতৃত্বে তার ভূমিকা কী? এই দুটির আধারে বিচার করতে হয় যে, এই হচ্ছে নেতা, যাকে আমরা নেতা বলে মানছি এবং জনগণও যাকে নেতা বলে মানে, যার নাম কাগজ-পত্রে ছাপুক কি না ছাপুক, যথার্থই পার্টির ভেতরে কতখানি নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকা তার রয়েছে, তার মাপকাঠিতে তাকে বিচার করতে হয়। সে নেতৃস্থানীয় কমরেড কিনা, অথবা সে একজন সাধারণ স্তরের কর্মী, বা সেই এলাকার অন্য একজন যোগ্য কর্মীর চেয়ে অনেক তলার স্তরের — এইসব ধারণাগুলো নতুন নতুন কমরেডদের মধ্যে অনেক সময়ে গোলমাল হয়। এসব গোলমাল হয় বলেই তারা বুঝতে পারে না যে, যে লোকটাকে নেতা বলে ভাবছি, নেতৃত্ব দেবে বলে মনে করি অথচ সে দলের নির্ধারিত নেতাদের করণীয় যা কাজ তার কোনওটাই করেনি। সেই এম এল এ-ও তো চোখের সামনেই পার্টির অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মীদের দেখছে। আবার সে যদি ভাবে যে আমি এম এল এ, আমার এতখানি ক্ষমতা আছে, আমার এই এই কাজগুলো করার যোগ্যতা আছে, অথচ আমাকে নেতৃত্বের পজিশন দেওয়া হচ্ছে না, অমুকের কোনও যোগ্যতাই নেই, তার মাসের মধ্যে ড্যাশ পুশ (বাহ্যিক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে নেতা বলে তুলে ধরার ক্ষমতা) নেই, আমার মত লোক জড়ো করতে পারে না — সেটা কি ঠিক? তৎক্ষণাৎ যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় যে শ্রমিকশ্রেণির দলের নেতা হতে গেলে ব্যক্তিগত জীবনে যে জিনিসগুলো মানা দরকার, তুমি সেগুলো পেরেছো কি? তুমি তোমার সম্পত্তি, পরিবার, ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পেরেছো? তুমি কি পেরেছো যেভাবে একজন বিপ্লবী কর্মীর আচরণ করা দরকার, তেমনভাবে সর্বস্ব পার্টির কাছে আনন্দের সঙ্গে বিসর্জন দিতে? না, তা তুমি পারোনি। কিন্তু নেতৃত্ব অ্যাসার্ট করার সময় তুমি নিজেকে যোগ্য ভাবছো, তোমার আচরণের ক্ষেত্রে যখন প্রশ্নের সামনে পড়ছো সঙ্গে সঙ্গে তুমি আর্গুমেন্ট (যুক্তি) করছ — আমি তো এর যোগ্য হইনি। তাহলে, যদি সে স্তরে না পৌঁছে থাকো তবে তোমার তো এ বিনয়টুকু থাকবে যে, তুমি এখনও নেতা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারনি। তাহলে তুমি নেতৃত্বে যাওয়ার জন্য ফাইট (ব্যক্তিস্বার্থে লড়াই) করবে কেন? তুমি তো নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করোনি। নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্যতা তারই তো রয়েছে যে এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তার আন্ডারে (তার তত্ত্বাবধানে) কাজ করার তোমার মানসিকতা নেই কেন? তুমি তো বিপ্লবী হতে চাও। এ মানসিকতা না থাকলে কী করে তুমি নিজে বিপ্লবী হবে? না, তখন আবার কুযুক্তি কর, ওটাতো আমার দুর্বলতা। আমি তো নতুন, তেমন শিক্ষা আমার এখনও হয়নি। তুমি যদি সেই ভাবে শিক্ষিতই না হয়ে থাকো তবু নেতৃত্বের আকাঙ্খা তো তোমার মধ্যে জেগে বসে আছে। আসলে, এগুলি এগজিস্টিং ক্লাস স্ট্রাগলের (চলমান শ্রেণি সংগ্রামের) প্রভাব, সমাজ পরিবেশের মানসিক গঠনের ওপর প্রতিনিয়ত তারই প্রভাব। তাই দশম কংগ্রেসে চিনের পার্টি এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে — যতদিন সমাজে শ্রেণিসংগ্রাম বর্তমান, এমনকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও দলকে পর্যুদস্ত করার জন্য, দলের কর্মীদের পলিউট (দূষিত) করার জন্য, নেতাদের ভেতর থেকে সর্বনাশ করে দেওয়ার জন্য, বুর্জোয়াশ্রেণি ক্রমাগত বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব ছড়াতে থাকে অর্থাৎ শ্রেণিসংগ্রামে তার প্রভাব বর্তাতে থাকে। তাই যতক্ষণ সমাজে শ্রেণিসংগ্রাম বর্তমান, ততক্ষণ মনে রাখতে হবে যে এইসব সমস্যাগুলো এসেও নানা দিক থেকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে নানা জায়গায়।

তাই প্রতিমুহূর্তেই আমার প্রতিটি মানসিক ট্রেইট (বৈশিষ্ট্য) কোন শ্রেণির ভাবনাধারণাকে প্রতিফলিত করছে, শ্রমিক আন্দোলন, পার্টির সংহতি, ঐক্য, ডিসিপ্লিনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে;নাকি নানা যুক্তির ও প্রশ্নের আড়ালে পার্টি নেতৃত্ব, পার্টি সংগঠন, পার্টির রাজনীতি এবং শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করছে, আমাকেও শক্তিহীন করে তুলছে — এগুলি বিচার করতে হবে। যে প্রশ্নগুলো দেখা দিয়ে আমাকে বিপ্লব থেকে সরে যেতে বলে, বুঝতে হবে সেই প্রশ্নগুলো হল বুর্জোয়া সমাজের এবং শ্রেণিসংগ্রামে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবের ফল। অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণি শ্রমিকশ্রেণিকে এবং শ্রমিক আন্দোলনকে আক্রমণ করার ফল। শ্রমিক আন্দোলনকে সে যে আক্রমণ করছে, সে আক্রমণের আমি শিকার হয়েছি। কারণ এর দ্বারা আমি শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি এবং টু দ্যাট এক্সটেন্ট (ততদূর পর্যন্ত) শ্রমিক আন্দোলনকে আমি দুর্বল করছি। শুধু সরে দাঁড়াচ্ছি না, সরে দাঁড়াবার সময় যেসব যুক্তিগুলো করে যাচ্ছি, তার দ্বারা আরো হাজারটা দুর্বল কর্মী এইভাবে পুঁজিপতিদের চক্রান্তে যারা পর্যুদস্ত হচ্ছে, তাদেরও সরে আসার রাস্তা প্রশস্ত করে যাচ্ছি। আবার আমি ফাইট (সঠিক

লড়াই) করে যদি জিতি, শুধু আমিই জিতলাম না, আমার ক্ষেত্রেই শুধু বুর্জোয়া চক্রান্ত ব্যর্থ হল না, তার আক্রমণ পরাস্ত হল না, অন্য আর পাঁচটা কমরেডকে বুর্জোয়া আক্রমণকে পরাস্ত করার সংগ্রামে এটা সাহায্য করল। ফলে শুধু আমিই জিতলাম তা নয়, আর পাঁচজনকে জেতাবার রাস্তায় আমি শক্তি জোগালাম। কাজেই আমাদের প্রশ্নগুলো এইভাবে দেখা উচিত।

বিপ্লবকে সারা জীবন ধরে বুঝতে হয়

ফলে যে প্রশ্নগুলো এসেছে তার যেটা মূল দিক সেটা হচ্ছে, রেভোলিউশনকে ক্রমাগত বুঝতে হবে। এই বোঝাটা শুধু আলোচনা করে, বই পড়ে, তর্ক করে আমাদের পাকা হয় না। বিপ্লব সংক্রান্ত, বিপ্লবী তত্ত্ব সংক্রান্ত যতই আমরা আলোচনা করি না কেন, তার দ্বারা আমাদের বিপ্লব বোঝা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বোঝা এবং তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জটিলতা এবং দ্বন্দ্বসমন্বয় বোঝা সঠিক হয় না। কারণ আমরা এক একজন এক একটা এনটিটি (ভিন্ন ভিন্ন সত্তা)। আমরা যখন বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে আছি, তখন আমাদের নিজস্ব মানসিক গঠন, প্রকৃতি, সুবিধা-অসুবিধা, ধ্যানধারণা, এইসব নিয়ে আমাদের নিজস্ব একটা পরিবেশ — এই সমস্তগুলির সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজন, বিপ্লবী আন্দোলনের সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজন এবং বিপ্লবী আন্দোলনে সব সময় ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধগুলির প্রকৃতি কী এবং কেন দেখা দেয়? বিপ্লবী আন্দোলনে বিরুদ্ধ মানসিকতাগুলো এইসব কাজের বিরুদ্ধে যখন আসে, সেগুলো যে বুর্জোয়া সমাজের ভাবধারা নানা রূপে আমার মধ্যে কাজ করছে এবং তার জন্য এইগুলি ঘটছে এর সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করতে না পারার ফলে। শুধু বই পড়ে, আলোচনা করে এর প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারা যায় না। তাই মাও সে তুং লং-রুট মার্চের পর সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর ওপর ইয়েনানের বক্তৃতায় একটা খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন। চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি তখন বিরাট শক্তিশালী পার্টি। বিপ্লবী যুদ্ধে বহু বিজয় সংগঠিত করেছে এবং তখন ফাইনাল ভিক্ট্রির (চূড়ান্ত বিজয়ের) মুখে। তখন পার্টির এগজিকিউটিভদের, লিডারদের, মিলিটারি জেনারেলদের, ক্যাপটেনদের একত্রে একটা ক্লাস হচ্ছে। সেই ক্লাসে তিনি বলছেন যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বই পড়ে, তর্কবিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা করে, নানা রকমের তত্ত্ব চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা যে মার্কসবাদ বোঝার চেষ্টা করি, এক্ষেত্রে বিপ্লবকে ভাল করে উপলব্ধি করা হয় না। সেটা মার্কসবাদ সম্পর্কে চৌখস জ্ঞান হয় না। চৌখস জ্ঞান বলতে তিনি বলতে চাইছেন যে জ্ঞান ডিসাইসিভ (অমোঘ), যে জ্ঞান সর্বাত্মক ক্রিয়াধর্মী সেই জ্ঞান আমাকে সমস্ত বিপত্তি থেকে রক্ষা করে। তাই মনে রাখবেন, বুর্জোয়া সমাজের সমস্ত রকম আক্রমণ, সরাসরি যে বুর্জোয়া ভাবধারার আক্রমণ অনেক কর্মীই এটা বুর্জোয়া প্রেজুডিস, এটা পেটিবুর্জোয়া প্রেজুডিস, এটা দুর্বলতা, এগুলো বুঝে ফাইট করতে পারে। এগুলো বুঝেও যারা পারে না তাদের তো আলাদা সমস্যা। কিন্তু চোরাগোপ্তা আক্রমণ, নানারকমভাবে ইমপ্যাক্ট অফ লাইফ, বাস্তব অবস্থা, আমি তো দুর্বল, সকলে যদি আমাকে না দেখে একা আমি কি করব, আমাকে কেউ হেল্প করল না, এইরকম সব নানা বিভ্রান্তিকর চিন্তা — এগুলোকে আমি বলি বুর্জোয়াদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ, যার শিকার হয়ে যায় অনেকে ধরতে না পারার ফলে।

যে কথাটা আমি আগেই বলেছি যে, আমরা এই পথে কেন এসেছি। আমার কথাই ধরুন। আমি প্রথম এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হই, বোমাপিস্তল হাতে নিয়ে আমার রাজনীতিতে দীক্ষা। তা, আমি অনুশীলন সমিতিতে যাদের দ্বারা এসেছিলাম দেশকে স্বাধীন করতে হবে, মুক্ত করতে হবে বলে, পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা সব কে কোথায় ছিটকে চলে গেছেন। যারা সেদিন আমাকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসেছিলেন — বাবা-মা, পরিবার, লেখাপড়া অন্য সমস্ত কিছু কেরিয়ার যেখানে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল যাদের কথায়, যাদের তখনকার আমার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রায় মহামানব মনে করতাম, সে মানুষগুলোর কী অধঃপতন চোখের সামনে দেখেছি। কিন্তু তাতে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি যে অনেকের হয়নি তা নয়। যারা তাদের ধরে চলতে চেয়েছে অর্থাৎ এইভাবে ভেবেছে যে, বাপ-মাও তো যেটা চোখে আঙুল দিয়ে বোঝায়, দেখ, ঐতো অমুকের কথায় গেলি, এখন দেখ উনি কেমন ঘর করছেন, উনি কেমন সংসার করছেন, ঐ তো দেখনা উনি কেমন পয়সা কামাচ্ছেন। আমার বাবা আমাকে বলতেন রাজনীতি তো সকলেই করে কিন্তু তোর মতো উটকো রাজনীতি করতে কাউকে দেখছি না। এই তো সব কংগ্রেস করছে, ও অমুক করছে, ও তমুক করছে। রাজনীতি করলেই কী মানুষকে ঘরবাড়ি সব ছেড়ে দিতে হয়, সংসার দেখতে হয় না, বাবা-মার প্রতি দায়িত্বের ব্যাপার থাকে না, স্ত্রী-পুত্রের ব্যাপার থাকে না, কিছু থাকে না — এ কী রকমের রাজনীতি? এই তো কমিউনিস্টদের দেখছি, সোস্যালিস্টদের দেখছি, ফরওয়ার্ড ব্লককে দেখছি, সকলকেই দেখছি; প্রত্যেকেরই তো ঘরসংসার আছে, টাকাপয়সা রোজগারের ব্যাপারও আছে, কিন্তু তোর মতো এই বিশ্বছাড়া রাজনীতি কোথাও দেখিনি। বলতেন, এ তুই কোথা থেকে পেলি? বলতাম, এ আমার দুর্বুদ্ধি, আমার উপর অভিশাপ; এ ছাড়া ওনাকে আর কী বলব? তা এই রকম করে সব দুর্বল করে দেয়। যারা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন এখন তিনি করছেন না, যেন তার জন্যই আমি বিপ্লবী ছিলাম, যে এরকম ভাবে তারই ক্ষেত্রে এই ধরনের বিপদ দেখা দেয়। কিন্তু যে লড়াইয়ের পথ ধরালো, রাস্তাটা আমাদের দেখিয়ে দিল, যেই দেখিয়ে থাকুক, আমি যদি সত্যটা পেয়ে থাকি, বুঝে থাকি, এটাই আমার রাস্তা, এটাই আমার মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের রাস্তা, রাস্তা যে দেখিয়েছিল সে যদি হটেও যায়, আমি হটবো কেন? আমি তো রাস্তার সন্ধানে, সত্যের সন্ধানে লোক খুঁজে ছিলাম। যে কোনও লোক যদি আমাকে সত্যের রাস্তায় নিয়ে এসে থাকে, তারপর সে সত্য রাস্তায় নাও থাকতে পারে। কিন্তু এটা কী যুক্তি যে, সে ভুত হয়েছে বলে আমাকেও তার সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ভুত হতে হবে? আমাকে যে রাজনীতিতে এনেছিল সে চোর হয়েছে বলে আমারও সাথে সাথে চোর হতে হবে, এটা কি যুক্তি? রাজনীতির রাস্তাটা কি খারাপ? আমি যে সংগ্রামে নিয়োজিত সেটা কি ভুল? আমি যে আদর্শের রাস্তায় চলছি সেটা কি ভ্রান্ত? তা যদি ভ্রান্ত হয় তবে তা পরিত্যাজ্য, এই মুহূর্তে পরিত্যাজ্য। কিন্তু তা যদি সত্য পথ হয়, মনুষ্যত্বের পথ হয়, মর্যাদার পথ হয়, বিবেকের পথ হয় এবং মানবমুক্তির একমাত্র পথ হয় তো গোল্লায় যাক যারা পথ দেখিয়ে এখন সরে গেছে! তারা বসে গিয়েছে বলে আমি বসে যাব কেন? আমি সত্যপথচ্যুত হব কেন? এই তো আসল কথা। এ কথাটা বিপ্লবীদের একেবারে গোড়ার কথা।

সেইজন্য বলেছিলাম যে আমরা সকলের জন্য রাজনীতি করি একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা রাম শ্যামের মুখ চেয়ে রাজনীতি করি। জনতা আছে, মানুষ আছে, তার মুক্তির প্রশ্নও আছে, তাই আমার মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণও আছে। তাই বড় বড় বিপ্লবীরা একে ভাষা দিয়েছেন যে, এর শেষ হবে সেইদিন, যেদিন আমার দেহেরও লয় হবে। অর্থাৎ আমি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো, যেদিন চিতায় যাব, তার আগে নয়। সেইজন্য মৃত্যুভয় দেখিয়েছে যে ফ্যাসিস্টরা, তারা কারাগারে বিপ্লবীদের ঐ কণ্ঠস্বর শুনেছে। জুলিয়াস ফুচিক বলছেন তুমি ভয় দেখাচ্ছো, মৃত্যুভয় দেখাচ্ছো? আরে বাবা, যেদিন বিপ্লবী হয়েছি সেদিনেই মৃত্যুর টিকিটটি কেটে রেখেছি। কাকে ভয় দেখাচ্ছো? আমরা আন্‌কন্‌সাস এলিমেন্ট (অসচেতন মানুষ) নই। আমরা মৃত্যুকে অগৌরবের মনে করি না। শুধু কুকুরের মত মৃত্যু, অমানুষের মত মৃত্যুকে অগৌরবের মনে করি। ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি — যদি আমার মরতেও হয়, গুন্ডার হাতে যদি মরতে হয়, তাতে আমার বেইজ্জত নেই, অপমান নেই, সেটা আমার অনার (সম্মান), গৌরবের। কাজেই আমাকে ভয় দেখাচ্ছো কী? আজ যারা ভুল বুঝে বিপ্লবীকে মারবে, তাদের যদি কিছুটা বিবেক থাকে, কাল আত্মগ্লানিতে, নিজের অপরাধ ভেতরে ভেতরে তাদের কুরে কুরে খাবে;আজ না হোক কাল খাবে, তাদের না খাক

তাদের সন্তান-সন্ততিদের খাবে। আমার ভয়টা কিসে? সেই জন্য ফুচিকের ঐ কণ্ঠস্বর এবং সব বিপ্লবীদের এইধরনের কণ্ঠস্বর। তুমি যদি আমার ভুল দেখাতে পারো, কাজ হবে। আমার বিচারে ভুল দেখাতে পারো, কাজ হবে। আমার রাস্তা ভুল দেখাতে পারো, কাজ হবে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। কারণ মৃত্যুর টিকিট আমরা কেটেই রেখেছি। ও আমাদের কাটা হয়েই আছে। এখন গেলেই হয়। তবে তার জন্য কি অ্যাডভেঞ্চার করে (হঠকারিতা করে) গলাটা বাড়িয়ে দেব, যে গেলেই যখন হয়, তখন আমাকে মারো। না, আমার করার অনেক কিছু আছে। আমি চেষ্টা করব যে কয়দিন পারি বেঁচে থাকতে এবং বেঁচে থেকে বিপ্লবের কাজ করে যেতে। এই বিপ্লবের কাজ করে যেতে গিয়ে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি আমি বাঁচতে না পারি, বাঁচার জন্য আলাদা করে চেষ্টা করব না, বিপ্লবের কাজ করার জন্য চেষ্টা করব, তারই মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা নিহিত থাকবে, তাতে যদি মৃত্যু আসে, মরে যাব। কিন্তু ইন দ্যাট কেস, উই স্যাল ডাই উইথ অনার (সে ক্ষেত্রে আমরা মর্যাদার সাথে মৃত্যুবরণ করব)। তাই সমস্ত বিপ্লবীদের বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই না। শুধু কুকুরের মতো মরতে, অনুযোগ-অভিযোগ করে মরতে, ক্লীবের মতো মরতে আমরা ভয় পাই। তাই শুধু অভিযোগ-অনুযোগ করে কুঁকড়ে কুঁকড়ে কুকুর বেড়ালের মতো মোরো না। ফাইট টু ব্রেকথ্রু (প্রতিবন্ধকতা চূর্ণ করে এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম কর), স্ট্রাগল কর। তারপর মরো। সেই জন্য বলেছিলাম, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান সিয়োরেস্ট ওয়ে টু কিপ ইয়োর হেড হাই (তাই মাথা উঁচু রাখার একটি মাত্র পথ আছে), দ্যাট ইজ টু এনগেজ ইওরসেল্ফ ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস এগেনস্ট অল সর্টস অফ ইনজাস্টিস অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন ফর ব্রিংগিং অ্যাবাউট এ রেভোলিউশনারি ট্রান্সফর্মেশন অফ দ্য প্রেজেন্ট-ডে এক্সপ্লয়টেটিভ সিস্টেম (তাহল আজকের দিনের শোষণ ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের জন্য সমস্তরকম অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত কর)। এই হচ্ছে আমাদের কাজ। এইভাবে যদি মৃত্যু আসে, দ্যাট ইজ অ্যান অনারেবল ডেথ। সমাজে বিপ্লবী পরিবর্তন আনার জন্য, মানব সমাজের মুক্তির জন্য কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রাগল করে না খেয়ে মরাও অনারেবল।

গোড়ার দিকে কমিউনিজম নিয়ে এদেশে যে চর্চা হয়েছে বা ধারণা ছিল তা সব অদ্ভুত অদ্ভুত। আমাদের সেই অনুশীলন সমিতির ফাউন্ডার পুলিন দাশ, তিনি বলতেন, মানুষের ইচ্ছে আলাদা থাকেই, তোমার একটা চিংড়ি মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, আমার তখন তেলাপিয়া মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, কী করে কমিউনিজম হবে? সকলেই একসঙ্গে তেলাপিয়া খাবে না, কারও তখন চিংড়ি মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হবে। এসব কথা শুনে আমরা হাসতাম। বুড়ো মানুষ, তার কমিউনিজম সম্বন্ধে ধারণা হল এই। এই যে কমরেডরা প্রশ্ন করেছে সেগুলো অনেকটা এই রকম যে, সমস্ত কমরেডদের জীবনযাত্রা একরকম হবে, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এক রকম হবে। এই যে সব ধারণা, এটা একটা অবাস্তব কল্পনা। একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ রিয়ালিস্টিক (বাস্তব কেন্দ্রিক) প্রশ্ন, আর বাকিটা আনঅবজেক্টিভ (বাস্তবতা বর্জ্জিত)। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি একরকম হয় না, রাজনৈতিক আন্দোলনে তার কার্যকারিতা ও অবস্থান একরকমের নয় বলেই তার ভূমিকার তারতম্যের জন্যই তার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা অ্যাপারেন্টলি (জীবনযাত্রার মান আপাতভাবে) দেখা যাবে বিভিন্ন প্রকারের। যে কোনও একটা বেটার কন্ডিশনে (তুলনামূলক ভাল অবস্থায়) যদি কোনও কমরেড পড়ে যায় তার কর্মক্ষমতা বা কর্মঅবস্থানের জন্য, যেমন একজন লিডার, তিনি লিডার বলে এক ধরনের অফিসে থাকছেন, এক ধরনের জায়গায় থাকছেন, এক ধরনের জায়গায় যাচ্ছেন, পাবলিক তাকে একভাবে নিচ্ছে, তার জামাকাপড় একরকমভাবে অনেক বন্ধু-বান্ধব দিচ্ছে, তিনি মোটরগাড়ি করে যাচ্ছেন, তাকে নানা জায়গায় একরকমভাবে রিসিভ (আপ্যায়ন)করছে, তার অটোমেটিক্যালি একরকমের লাইফ আসছে। অ্যাকর্ডিং টু ইমপর্ট্যান্স (গুরুত্ব অনুযায়ী) এবং কার্যকারিতা *থেকে* একরকমের লাইফ আসছে। এই লাইফটায় দেখবার প্রশ্ন যে এইসব কন্ডিশনগুলোতে তার মোহ সৃষ্টি হচ্ছে কি না, আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে তার দোষ বর্তাচ্ছে কিনা, সে এগুলোর ঘাটতি হলে বিব্রত বোধ করে কি না, অসুবিধা বোধ করে কি না। নাকি সে যেকোনও অবস্থায় হাসি মুখে চলতে পারে। তার অভাববোধ জন্মায় না বা জমতে দেয় না। কিন্তু যদি এই দুষ্ট ট্রেইটগুলো ডেভেলাপ করে থাকে তবে বলতে হবে, তার লোভ ডেভেলাপ করেছে, সে তার শিকার বনেছে, এসবের ভিক্টিম হয়েছে। এইসব জিনিসে যেন ভিক্টিম না হয়ে যায়, কোনও কন্ডিশন অফ লাইফের ভিক্টিম (বিশেষ জীবনযাত্রার শিকার) না হয়, এটাই দেখার বিষয়। যেমন সিক্রেট ওয়ার্ক (গুপ্ত কাজ) করার জন্য একটা কমরেডকে ঐরকম একটা কন্ডিশনে (পরিবেশে) একটা জায়গায় দেওয়া হল। সাধারণ কর্মীর তো এটা জানার বিষয় নয়। এখন পার্টিই তাকে এমন সব জামাকাপড়, এমন কন্ডিশন, এমন ফ্ল্যাটে, এমন সব জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করে দেয় যেটা খুব অ্যাফ্লুয়েন্ট (প্রাচুর্যময়) কন্ডিশন। আমার সাথে সাথে মনে হল কমরেডটি এমনভাবে থাকে কেন? এটা কি বিচারের রীতি নাকি? যেটা অনেক আগে আমি বহুবার আলোচনা করেছি কোনও কমরেডের এইভাবে বিচার করা ঠিক নয়। এইসব প্রশ্নগুলো আসে কোথা থেকে যে, আমি এইভাবে নেই অথচ সে কত আরামে আছে। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আসে বলেই শুরুতে ত্যাগ ধর্মের ওপর এত আলোচনা আমি করেছি যে ত্যাগ ধর্ম এক মারাত্মক পরিণতি আনে। তার কত রকমের সব প্রবৃত্তি, নানা ধরনের বিকৃতি হয়। আসলে এটা বুর্জোয়া কনসেপ্ট। সেইজন্য আমি বলেছি বিপ্লবীরা যখন না খেয়ে থাকে, উপোস করতে বাধ্য হয়, বনে জঙ্গলে থাকে, জামাকাপড়ের অভাব, গাছের পাতা খেয়েও জীবনযাপন করতে হয়, তখনও তারা মনে করে না জনসাধারণের জন্য, দেশের জন্য, তারা এত ত্যাগ স্বীকার করছে। এই ধরনের ভাবনা মনের মধ্যে ঢোকার অর্থই হল বুর্জোয়া ত্যাগ ধর্মের ভাবধারার দ্বারা সে প্রভাবিত। কারণ সে জানে আজ এই সংগ্রাম করতে গিয়ে যে পরিস্থিতিতে সে পড়ে থাকুক, স্বেচ্ছায় যে জীবনটি সে গ্রহণ করেছে সেটি মর্যাদার জীবন। তার উপলব্ধিতে বিপ্লবীর জীবন উন্নত, সুন্দর ও আনন্দময় জীবন। কিন্তু আরাম আয়েস বলতে যে বাড়ি-ঘরটি, জামা-কাপড়টি, ভাল ফ্ল্যাটটি, টাকাপয়সা সে ছেড়ে এসেছে, সেটির সম্বন্ধে তলে তলে যদি তার আকর্ষণ বেশি না থাকে, সেটাকেই যদি সে ভাল জীবন বলে মনে না করে, বিপ্লবী জীবনের চেয়ে উন্নত জীবন বলে তলে তলে মনে না করে, তাহলে সেইটি ছেড়ে আসাকে সে ত্যাগ বলবে কেন? যার জন্য আমি তুলনা দিয়ে ঐ 'হোয়াই এস ইউ সি আই ইজ দ্য ওনলি কমিউনিস্ট পার্টি'-র ভেতরে দেখবেন কী বলেছি। একটা ঝুপড়ি ছেড়ে একটা মানুষ যখন অট্টালিকায় এসে বাস করে, তখন কি সে লোকটা ভাবে যে আমি মহা ত্যাগ করে এসেছি। একজন প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে এই প্রচলিত আরাম আয়েসজনিত যে জীবনযাত্রা, সেটা একটা হিউমিলিয়েশনের জীবন, ঘৃণ্য, জঘন্য, নোংরা, অবমাননাকর জীবন বলেই সে মনে করেছে। তাই সে স্বেচ্ছায় এই সংগ্রামের রাস্তা বেছে নিয়েছে। এই সংগ্রামে তার আনন্দ, দুঃখ, বেদনা সবই আছে। কিন্তু এটা উন্নত জীবন। তাহলে যদি একটা অবমাননাকর জীবন — যেটা আরাম আয়েসের জীবন, সেটা ছেড়ে এসে একজন বিপ্লবী জীবনকে উন্নত জীবন বলে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তার কিছু শারীরিক কষ্ট হচ্ছে খাওয়া থাকার জন্য, তার জন্য কি সে সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে থাকবে যে আমি মহাত্যাগ করেছি। কী ত্যাগ করেছি? তাহলে তো ঐ বাড়িঘরকে বিপ্লবের চেয়েও উন্নত জীবন বলে তুমি মনে কর, ঐ আরাম আয়েসটাকে তার চেয়ে উন্নত জিনিস মনে কর। আর যদি ঐ হিউমিলিয়েটেড জীবনটাকে, জড় জীবনটাকে বড় বলে মনে না কর, তা হলে ত্যাগ বলে ভাবছ কেন? ফলে এইগুলো তোমার প্রধান বিভ্রান্তি।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হচ্ছে — ত্যাগের থেকে আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব। এত ত্যাগ করলাম, পেলাম কী? দেখছেন না, কংগ্রেসী নেতারা, এমনকি বহু পুরনো গান্ধিবাদী নেতারা, এইসব মেকি কমিউনিস্ট নেতারা, স্বদেশী আন্দোলনের লোকেরা তাদের ভাবখানা এরকম যে, দেশের জন্য কত ত্যাগ তারা করেছেন ফলে এখন তাদের কিছু পাওয়ার সময়। এত ত্যাগ করেছি আমি তাই এখন আমি কিছু চাই আমার জন্য। ত্যাগের বিনিময়ে কেউ টাকা-পয়সা চায়, কেউ চায় প্রতিপত্তি, কেউ চায় পাওয়ার পজিশন, কেউ চায় ক্ষমতা। ইভ্‌ন কেউ চায় লিগ্যাসি (খেয়ালখুশি মত চলবার সুযোগ)। এই ত্যাগের থেকে চাওয়ার মনোবৃত্তি

আসে। আর না হয় যারা কিছুই চাইলো না, এমন লোকও কিছু গান্ধিবাদীদের মধ্যে পাবেন যারা পাওয়ার পজিশনও চায়নি, টাকাপয়সাও চায়নি, শুধু ত্যাগ করে গেছে ধর্মীয় মনোভাবের মতো, কিন্তু ত্যাগের মনোভাব আছে বলেই যখন ফেলিওর (ব্যর্থ) হল, যখন কিছু হল না দেখছে, যখন যা চেয়েছিল তা করতে পারেনি বলে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রচেষ্টার প্রতি তাদের বিশ্বাস চলে যায়। তখন তাদের ভাবনা হল, ও কিছু হবে না। তারা হতাশার শিকার হয়। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ওপর, গতির ওপর, সমাজ প্রগতির আন্দোলনের প্রতি তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে। কাজেই এগুলো কোনওটাই আমাদের সাহায্য করে না। এগুলো সবই বুর্জোয়াশ্রেণির ভাবনাধারণার নানা রূপ।

দুঃখবেদনার মধ্যেও বিপ্লবের রাস্তা আনন্দময়

একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে, এই কন্টকাকীর্ণ বিপ্লবের রাস্তাটায় দুঃখ-বেদনা আছে, কিন্তু এ আনন্দময়। অর্থাৎ দুঃখ-বেদনার রক্তাক্ত রাস্তার মধ্যেই এর পরিধিটা, পরিমণ্ডলটা আনন্দময়। আমি আগেই বলেছি, নিরঙ্কুশ আনন্দ হল ম্যাটমেটে ভ্যাদভেদে টাইপের (ধরনের), তাতে কোনও রস থাকে না। সেই আনন্দেরও কোনও মানে থাকে না। কিন্তু, দুঃখ-বেদনার মধ্যেও তার পুরো রসটা, ডমিনেন্ট ক্যারেক্টারটা (প্রধান বৈশিষ্ট্য) হল আনন্দময়। তার মধ্যে টারময়েল (প্রবল ভাঙাগড়া) আছে, কিন্তু এটা উন্নত জীবন, মর্যাদার জীবন। এই জীবনে যে আনন্দ — শুধুই কি তা কর্তব্যবোধকে কেন্দ্র করে? আনন্দের রূপে মানুষ যদি এটা না পায়, মর্যাদার রূপে যদি না পায়, তাহলে কর্তব্যের চাপে কিছুদিনের মধ্যেই লড়াই শেষ হয়ে যায়। তার বেশি নয়, তারপরেই হাঁপিয়ে ওঠে। কর্তব্যবোধ থেকে শুরু, তারপর তাকে রক্তমাংসের সাথে মিলিয়ে একেবারে রসের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে — এটাই জীবন। এর বাইরে বিপ্লবীদের আর জীবন কী? এইভাবেই জীবনকে সত্যিকারের বিপ্লবী গ্রহণ করে বলেই কোনওদিন তার মনোবল ভাঙা যায় না। বিপ্লবীদের পেটানো যায়, গুলি করা যায়, কিন্তু কেনা যায় না। তাই ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবই সর্বত্র জয়যুক্ত হয়। এই কারণেই বিপ্লব অজেয় এবং এর শক্তি অমোঘ। এই দিক থেকে জিনিসটাকে দেখতে হবে।

কর্মীদের রাজনৈতিক যোগ্যতা বাড়াতে হবে

পার্টির সর্বস্তরে রাজনৈতিক বক্তব্য উন্নত করতে হবে। রাজনৈতিক বক্তব্য পাবলিকের পক্ষে বোঝার মতো করে বলতে পারলে তবেই তাদের মনের ওপর প্রভাব ফেলা আরও কার্যকরী হয়। এর জন্য দুদিক থেকে চর্চা দরকার। জানা জিনিসগুলোকে সেইজন্য বারবার রিইটারেট (পুনরাবৃত্তি) করতে হয়, বারবার আলোচনা করতে হয়। যে কথাগুলো ভাল, যে কথাগুলো সুন্দর, যে কথাগুলো কারেক্ট, সে কথাগুলো একবার বুঝলাম, আর ভাবলাম বারবার এতে জানার কি আছে? না, বারবার সে কথাগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হয় দুটি প্রয়োজনে — প্রথমত যতটা আমি বুঝেছি তার থেকে আরও বেশি কিছু বোঝার এর মধ্যে আছে কিনা, সেইটা খোঁজার জন্য। দ্বিতীয়ত, যতটা সুন্দর বুঝেছি সেই সুন্দরটাকে আরও সুন্দর করার দরকার আছে কিনা সেইটা বোঝবার জন্য। আমি যতটুকু দেখি, দলের সকল কর্মীরা তা করে না। অথচ এই কাজটা না করলে আমরা যাকে পলিটিক্যাল কমপিটেন্স (রাজনৈতিক দক্ষতা) বলি, আমাদের কর্মীদের সেই ক্ষমতা ধারালো হয় না। যেমন, সিপিআই একটা লাইনে প্রোপাগান্ডা নিয়ে যাচ্ছে, সিপিএম তার পলিটিক্যাল লাইনে প্রোপাগান্ডা নিয়ে যাচ্ছে, তারা তা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার দ্বারা কীভাবে জনগণকে ঠকাচ্ছে, কোন কথা দিয়ে কোন কথাটাকে চাপা দিচ্ছে, মাসের মধ্যে যে সেন্টিমেন্ট (আবেগ) আছে সেটাকে প্লে করে (কাজে লাগিয়ে) আসল কথাটাকে কীভাবে চাপা দিয়ে দিচ্ছে, আসল কথাটাকে সে কী ট্রিকে (চালাকি করে) চাপা দিচ্ছে, এসবের মধ্যে আমাকে যেভাবেই হোক আসল কথাটাকে তুলে ধরতে হবে। আসল কথাটা কী সেটাকে বোঝবার এবং তুলে ধরার ক্ষমতা অর্জন না করতে পারলে, ভাল করে বুঝতে না পারলে, জনগণকে তো এইসব মেকি বিপ্লবীরা বিফুল করবে (বোকা বানাবে)। সেজন্যই নিজেদের পলিটিক্যাল লাইন ভাল করে বুঝতে হবে এবং ভিজ-আ-ভিজ (বিপরীতে) অপর পার্টি কী বলছে না বলছে সেটাও বুঝতে হবে; সেইগুলি নেতৃত্বের সঙ্গে একসঙ্গে বসে আবার কখনও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নিয়ে বুঝতে হবে। এটাও জানা থাকা দরকার, আলাদা করে সবসময় নেতৃত্বের সঙ্গে বসা সম্ভব না হতেও পারে। সেজন্য, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা মারফৎ বোঝাটাকে পাকা করে নিতে হবে। কন্টিনিউয়াসলি (লাগাতার) অপরদের বোঝা এবং নিজেদের বোঝাটাকে ইমপ্রুভ (উন্নত) করতে হবে। শুধু অ্যাসোসিয়েশন (মেলামেশা করে) নয়, অ্যাসোসিয়েশন ততটুকু করা যতটুকু আমার দরকার; বাকি সময়টা আমাকে ম্যাক্সিমাম ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের টাচে (সর্বাধিক সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে) থাকতে হবে। কাজের বাইরে যে সময়টুকু আমি পাচ্ছি সেইটা নিশ্চয়ই আমি বাজে জায়গায় কাটাবো না, বাজেভাবে কাটাবো না। আই স্যাল ট্রাই টু রিমেইন ইন দ্য পার্টি অ্যাসোসিয়েশন (পার্টি পরিবেশে থাকার চেষ্টা করব)। আমি যা কাজ করেছি, কাজ করার পরে আমার যতটুকু বিশ্রামের সময় হয়েছে, সেই বিশ্রামটা পার্টি অ্যাসোসিয়েশনে আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে নেওয়াই ভাল। বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্রাম এবং বিশ্রামের সুখ গ্রহণ করলে বিপ্লবীর কোনও উপকার হয় না। ভিড়ের মধ্যেই তার উপকার হয়। অনেকে কমিউনে বা সেন্টারে থাকলেও তার নাড়ির সঙ্গে ইমোশনের সঙ্গে লিঙ্ক থাকে না। তারা থাকছে, কখনও হয়তো আলোচনাতেও বসছে, তর্কাতর্কি করছে, কাজও করছে কিন্তু তাদের মতো থাকছে। একটা লিভিং অর্গানিজমের (শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের) মতো সকলকে থাকতে হবে। না থাকলে ক্যারেক্টারের ওপর, ক্যারেক্টারের ট্রেইটগুলোর ওপর, বহু জিনিসের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা হয় না, কত জিনিসের আমাদের ঘাটতি আছে তা চোখে পড়ে না। এক জায়গায় থাকা, কমিউনে, সেন্টারে বা অফিসে থাকা, কমন অ্যাসোসিয়েশনে কাটানো — এর মানেই হল বহু জিনিস আমাদের মধ্যে এসে যায়, ধরা পড়ে, পরীক্ষা হয়, কনফ্লিক্ট (দ্বন্দ্ব) হয়, সেজন্য এর একটা প্রয়োজন আছে।

ক্যারেকটারের সাথে রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাও চাই

কিন্তু আমি যেটার ওপর জোর দিতে চাইছি, বর্তমানে শুধু ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার (চরিত্র চরিত্র) বললে চলবে না। ক্যারেক্টারের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট (যথাযথ) পলিটিক্যাল এডুকেশন ইজ অলসো নেসেসারি (রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রয়োজন)। শ্লোগান হবে, ইউ মাস্ট পলিটিক্যালি ইক্যুইপ ইওরসেল্ফ (নিজেকে রাজনৈতিক ভাবে যোগ্য করতে হবে), যাতে আপনি আপনার বক্তব্য ঠিকমত আর্টিকুলেট ফর্মে (পরিষ্কার স্পষ্ট সুসংবদ্ধ ভাষায়) বলতে পারেন, অপোনেন্টের (বিরোধীর) বক্তব্য ঠিকমত এক্সপোজ (স্বরূপ প্রকাশ) করতে পারেন, তাদের চালাকি ধরতে পারেন এবং জনসাধারণকে ধরিয়ে দিতে পারেন। এইভাবে নিজেকে রাজনৈতিকভাবে তৈরি করতে হবে। এইজন্য এই অ্যাডিশনাল (আর একটি) শ্লোগান আমি যুক্ত করতে চেয়েছি। এইটে যদি এখন না করা যায়, তাহলে গড়ে ওঠা ক্যারেক্টার বা আজকে যে ক্যারেক্টারগুলো গড়ে উঠবে সেই ক্যারেক্টারগুলো বল পাবে না, যা প্রথম দিকে পেয়েছিল। কারণ, সেদিন স্মল সার্কল-এ (ছোট পরিসরে) দিনরাত নেতৃত্বের ডাইরেক্ট এটেনশানে তার ইমোশন এবং ক্যারেক্টার গড়ে উঠেছে। এখন তো তাদের সে ধরনের মুভমেন্ট নয়, সেই ধরনের অ্যাক্টিভিটি নয়; ফলে তারা ক্যারেক্টার পাবে কি করে, ক্যারেক্টার জিইয়ে রাখবে কি করে? তাই শুধু ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার বললেই ক্যারেক্টারও তৈরি হতে পারে না। ক্যারেক্টার তৈরি করার জন্য নিজেদের পলিটিক্যালি ইকুইপ করে আজকের ব্যাটল-এ এনগেজড হতে হবে। আজকের

ব্যাটলটা শুধু অ্যাসোসিয়েশন মেনটেইন করা নয়, প্রোপাগান্ডা করা, বা ডিসকাশন করা নয় — আজকের ব্যাটলটা হচ্ছে টু লিড দ্য মাসেস (জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া), মাসের মধ্যে গিয়ে মাস লেভেলে (স্তরে) অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা, লোয়ার (নিচের) লেভেলে পার্টি সংগঠনটাকে নিয়ে যাওয়া। কাজেই মাস লেভেলে সংগঠনকে নিয়ে যাবার মত যোগ্য করে যদি আমি আমাকে গড়ে তুলতে না পারি তবে কী করে আমি আমার ক্যারেক্টার মেনটেইন (রক্ষা) করব। এই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি যে, আমাদের প্রত্যেককে আপ টু দ্য মার্ক (চিন্তা চেতনার মান যতটা উপরে থাকা দরকার তা তৈরি) হতে হবে। অপর দলের কর্মীদের চেয়ে আমরা সচেতন কিনা, উই স্যাল নট বদার অ্যাবাউট ইট (এটা নিয়ে ভাবব না)। নতুন করে সংগঠন করা, পাবলিকের কনফিউশনের (বিভ্রান্তির) মধ্যে তাকে রাস্তা দেখানো, হাজার ফ্রাসট্রেশন এবং কনফিউশনের মধ্যে নিজের দৃষ্টিশক্তিকে বিভ্রান্ত করতে না দেওয়া এবং ঠিক ঠিক জিনিসটা ঠিকমত বোঝানো, সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে ওয়েল কনভারসেন্ট (ভালভাবে জানা) থাকা, ইনফর্মেশন (তথ্য) ঠিক ঠিকভাবে রাখা, খবর রাখা, জানা, এগুলো সম্বন্ধে আমাদের ওয়ার্কিং এবিলিটি, কর্মক্ষমতা বাড়ানো এবং পলিটিক্যালি ইকুইপড (রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষ) হওয়া — এইটা গড়ে তুলতে হবে। ক্যারেক্টার (উন্নত চরিত্র) গড়ে তোলার সাথে সাথে আজ যদি আমরা এটার ওপর অত্যন্ত জোর না দিই, তাহলে যে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার করে আমরা এত লাফাচ্ছি, সেই ক্যারেক্টারও আমাদের রক্ষা করা শেষ পর্যন্ত মুশকিল হবে — এইটাই আমি বলতে চেয়েছি।

যৌন আকাঙ্ক্ষা কাকে বলে

একটা অন্য ধরনের প্রশ্ন এসেছে, সেই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করব। প্রশ্নটা হচ্ছে, টেন্ডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশন (প্রজননের প্রবণতা), যৌন আকাঙ্খা কী? একটা বয়সে এসে একটা বায়োলজিক্যাল মোটর অ্যাকশন (জৈব ক্রিয়া জাত পেশী সঞ্চালন), একটা ইমপাল্‌স (যৌন অনুভূতি), একটা নার্ভাস সেনসেশন (স্নায়ু উত্তেজনা) যেটা সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে কতগুলি ইমোশনাল মুভমেন্ট (আবেগবিহ্বল স্পন্দন) হয়, তা জন্তুরও হয়, মানুষেরও হয়। কিন্তু মানুষ যেহেতু জন্তু নয়, সে চিন্তা করে, ভাবে; সেহেতু মানুষের সমস্ত ইমোশনগুলোর সঙ্গেই তার ভাবগত ও মনোগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক আছে। মানুষের ক্ষেত্রে তার সেক্সই হোক বা শারীরিক কোনও যন্ত্রণাবোধ হোক বা ক্ষুধা হোক বা যা কিছু হোক, সেগুলো মন বা ভাবগত যে কাঠামোটা মনের রয়েছে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাকে আলাদা করার উপায় নেই। তাই বাহ্যিক প্রকৃতিতে সেক্সের গঠন-প্রকৃতি নারীদেহ বলতে এক রকম বোঝায়, পুরুষদেহ বলতে অন্যরকম বোঝায়। মূলগত বৈশিষ্ট্যে একটা নারী দেহ, আর একটা পুরুষ দেহ। এই এই কারণে এটাপুরুষ দেহ বা এই এই কারণে এটা নারী দেহ। কিন্তু নারী দেহও সব একরকম নয়, দেখতেও একরকম নয়, গঠনবৈশিষ্ট্যও একরকম নয়, অথচ মূলত কতগুলো বৈশিষ্ট্য এক বলে তাদের নারী বলা হয়। তেমনি কতগুলো বৈশিষ্ট্য এক বলে তাদের আমরা পুরুষ বলি, তাদের মধ্যেও গঠন বৈশিষ্ট্য আলাদা থাকে। এই তো? এখন এই যে নারী পুরুষের পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ, এটা তো একদম শিশু বয়সে আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা দেহের গঠনের একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে এটা বিশেষ করে উপলব্ধি করতে থাকি। তার চাপটা ফিল করতে থাকি। তার প্রয়োজনীয়তা আমরা ফিল করি। কিন্তু আমরা যেভাবে ফিল করি, জন্তু কি সেভাবে ফিল করে? না, জন্তু কিন্তু ভেবে ভেবে তার এই মোটর অ্যাকশনটা, তার এই উত্তেজনাটা বা তার এই ক্রিয়াটা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু মানুষ অবজেক্ট সামনে না থাকলেও, ভেবে চিন্তা করে নিজেকে উত্তেজিত করতে পারে। মানুষ সেক্স অ্যাক্টও করতে পারে যদিও ইন এ পারভার্টেড ওয়ে (বিকৃতভাবে)। জন্তু জানোয়ার সেক্স নিয়ে ভাবতে পারে না এবং ভাবনাজনিত সেক্স ইমপালস এবং যৌন ক্রিয়াকে উত্তেজিত করতে পারে না বা প্রশমিতও করতে পারে না। কিন্তু মানুষ ভাবনাজনিত ক্ষমতার দ্বারা তার যৌন ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলোকে উত্তেজিত করতে পারে এবং প্রশমিতও করতে পারে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যৌনক্রিয়া এবং যৌনআবেগ জন্তু ও মানুষ উভয়ের মধ্যে থাকলেও দুজনের মধ্যে এর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আলাদা। মানুষের ক্ষেত্রে ভাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, তাই তার চিন্তা-রুচি-সংস্কৃতির সঙ্গেও এর সম্পর্ক আছে। একে একদম বাদ দিয়ে, অস্বীকার করে, এর কোনও ইমপ্যাক্ট (প্রভাব) স্বীকার না করে মানুষের সেক্স রীতি গড়ে উঠতে পারে না এবং গড়ে ওঠেও নি। তাই মানুষের রুচি-সংস্কৃতি-জীবনযাত্রা পাল্টাবার সাথে সাথে তার সেক্স রীতিগুলোরও অনেক ইমপ্রুভমেন্ট (উন্নত) হয়েছে। যদিও মৌলিক ফর্ম বা ইন্টারকোর্স (নর-নারীর যৌনক্রিয়া) বলবেন তো — একরকমই আছে, জন্তুরও যা আছে, মানুষেরও তাই। না, তারই মধ্যে কলাকৌশলের অনেক উন্নতি হয়েছে, কল্পনা মিশ্রিত হয়েছে, রসগ্রাহ্য হয়েছে। সেক্স উপাদান সামনে থাকলেই মানুষ মাত্রেই সেক্স ইমপালসের ভিক্টিম (যৌন আবেগের শিকার) হয় না; ঘৃণাও হয়, বিতৃষ্ণাও হয়। কিন্তু জন্তু জানোয়ারের এসব হয় না। জন্তু জানোয়ার একটি সিজনের সময়ে (একটা বিশেষ ঋতুতে) যৌন উপাদান সামনে থাকলে, সেক্সের উপকরণ অর্থাৎ অপোজিট সেক্স (বিপরীত লিঙ্গ) সামনে উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার যৌনক্রিয়া ও ঝোঁক আসে। মানুষের মধ্যে কি তা আসে? একজন নামজাদা বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে একবার সংস্কৃতির ওপর একটা আলোচনাচক্রে আমার বক্তৃতায় তাঁর খুব গোঁসা হয়েছিল। শুধু লড়াই, শ্রেণি সংগ্রাম, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি এসব তার ভাল লাগেনি, লড়াইয়ের ময়দানে বসে জুঁই ফুলের গান গাওয়া যায় কিনা এসব অনেক কথা বলে তারপর তিনি তর্ক জুড়ে দিলেন। আমি বললাম, শাশ্বত বলে কিছু নেই। তিনি আপত্তি করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বলুনতো শাশ্বত বলে কী আছে তিনি এটা হাতড়াচ্ছেন, ওটা হাতড়াচ্ছেন; এইসব ইন্টেলেকচুয়ালদের (বুদ্ধিজীবীদের) যা হয় আর কি। সবই কিছু কিছু নোট বইয়ের সেই বুক অফ মডার্ণ নলেজে (আধুনিক জ্ঞানের বইতে) আছে, যার মধ্যে দুলাইন করে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই লেখা থাকে। একদল লোক বাড়ির লাইব্রেরিতে সেইসব কিনে রাখে। মাঝে মাঝে সেগুলোর পাতা উল্টে দেখে। তারপর মনে করে সর্বশাস্ত্রে আমি সুপণ্ডিত হয়ে গেছি। কাজেই একবার আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির তত্ত্ব (আপেক্ষিকতা তত্ত্ব) নিয়ে বলা, যদিও আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কিছুই জানে না, কিন্তু একটা কিছু তো বলতে হবে। এইরকম নানা হাতড়ে হাতড়ে শেষে তিনি বললেন, কেন টেন্ডেসি অফ প্রোক্রিয়েশন — এটা তো মৌলিক, এটা একটা বেসিক ইনস্টিংক্ট (মৌলিক প্রবৃত্তি)। তিনি শুরু করেছিলেন আনন্দ দিয়ে, তারপর চলে এলেন টেন্ডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশনে। তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম আনন্দটা কার? সাপের আনন্দ না ব্যাঙের আনন্দ? মানুষের আনন্দ তো? কী তার প্রকৃতি? তাতে কোণঠাসা হয়ে গিয়ে আনলেন টেন্ডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশন। তা আমি বললাম, হ্যাঁ, টেন্ডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশনটা রয়েছে, তবে আপনার জানা নেই যে এই প্রোক্রিয়েশন কত রূপ পাল্টেছে। যখন জেলির স্তরে অর্গানিজম (জীব) তখন তার প্রোক্রিয়েশন ইনহেরেন্ট (স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য), নিজের ভেতরে, নিজেকে নিজে সে বিভক্ত করছে। যাকে আপনি বলছেন সেক্স ইন্টারকোর্স এর ফর্ম, এইসব রূপই তার হয়নি, কারণ তখন তার শরীরে সেক্সের গঠনই হয়নি। অথচ সৃষ্টি হচ্ছে, প্রোক্রিয়েশন হচ্ছে, একটা জেলি নিজেকে ডিভাইড করে দুভাগ হচ্ছে, সে তাকে ডিভাইড করে আবার পাঁচটা হচ্ছে, এইভাবে সে বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। সেখানে বংশবৃদ্ধির জন্য যাকে আপনি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বলেন — দুটো অর্গানিজমের অর্থাৎ মেল-ফিমেল-এর — তখন তার স্ট্রাকচারই গড়ে ওঠেনি, অথচ প্রোক্রিয়েশনটা ছিল। আমি বললাম, আপনি তো মাস্টারমশাই সেই খবরটা রাখেননি? আবার প্রোক্রিয়েশনের ভেতরও তো তফাৎ থাকে। একজন অশিক্ষিত মানুষ তার একটা টেন্ডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশন আছে। আপনি একজন রুচিবান শিক্ষিত মানুষ, আপনারও টেন্ডেন্সি অফ প্রোক্রিয়েশন আছে। আপনি কি মনে করেন দুটোই এক জাতের? সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, না, তা কি করে হয়। অথচ ফর্মের দিক থেকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে দুজনেরই এক। মোটামুটি বলতে একই রকমের ফর্ম, কিন্তু তাও কি হুবহু একই রকম? না, একই রকম নয়। একজনের মধ্যে অত্যন্ত ফাইন আর্টিস্টিক ওয়ে (সূক্ষ্ম শৈল্পিক প্রকাশ) থাকে, আর একজনের মধ্যে অত্যন্ত রাফ

(রুক্ষ) একটা খাই খাই ভাব থাকে। একটাতে থাকে জন্তুজানোয়ারের মতো পাশবিক রূপ, আর একটাতে অত্যন্ত সুন্দর এবং আবেগময়;এরকম কত পার্থক্য হয়। এ পার্থক্যগুলো কেন হয়? বাহ্যত ইমোশনটাতো একই রকম, অ্যাক্টটাতো (ক্রিয়াটাতো) একই রকম, অবজেক্টিভ মেটেরিয়াল বেসটা এক রকম;কিন্তু মানসিক গঠন আলাদা বলে, রুচি-সংস্কৃতি আলাদা বলে এর চাওয়া-পাওয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণগুলোও হুবহু একরকম নয়। যে জায়গায় একটা মানুষের সেক্সের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আর একটা মানুষের সেখানে আকর্ষণটা মুখ ফিরিয়ে কুঁকড়ে ভিতরে গুটিয়ে যায়। কিন্তু পশুর ক্ষেত্রে সেটা ঘটে না। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, মানুষের মানসিক গঠন এবং আদর্শবাদ, রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, এবং সঙ্গে তার বায়োলজিক্যাল মোটর অ্যাকশন বা যাকে আমরা বায়োলজিক্যাল ফিলিং বলি সেটার একটা সম্বন্ধ রয়েছে;একটা অপরটাকে প্রভাবিত করছে। মৌলিক ঢংটা তার পাল্টাতে শিক্ষাদীক্ষা অনেকখানি তাকে প্রভাবিত করেছে, প্যাটার্ন (একটা আদলে তৈরি) করেছে, স্টাইল (ধরন) পাল্টাচ্ছে। সে হুবহু পাশবিক রূপে নেই।

সেক্সের ঢং ও সম্পর্কের মধ্যেও শ্রেণি চিন্তা প্রতিফলিত হয়

এইটা ভাল বুঝলেই বোঝা যাবে চিন্তার সঙ্গে, রুচির সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে, মানুষের যৌন আবেগের একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক বুঝলেই বোঝা যাবে — চিন্তা যেখানে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিচিন্তা, শ্রেণি মানসিকতা;ঠিক সেইরকম শ্রেণিচিন্তা, শ্রেণিপ্রভাব অনুযায়ী সেক্স-এর রুচি, স্টাইল, সমস্ত কিছুর ওপর তার প্রভাব পড়ে। ফলে সেক্সের প্যাটার্নটা ও সম্পর্কের মধ্যেও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ যেখানে সেক্স ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব, সে রুচি এবং শিক্ষার পরোয়া করে না, সংস্কৃতি এবং মর্যাদার পরোয়া করে না, নিজেকে সে যৌনদাসে পর্যবসিত করে। অন্যায় আবদারের কাছে সেক্সকে মাথা নত করতে শেখায়। আমি সেক্সের জন্যই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করি, যেহেতু স্ত্রীর দরজায় আমাকে ধর্ণা দিতে হয়, সেহেতু স্ত্রী'র 'সর্ষের তেল আমাকে কিনে দিতে হবে'র মতই তুমি রাজনীতি করতে পারবে না আবদারটিও আমাকে রক্ষা করতে হয়। রাজনীতি করাটার মধ্যে মানুষের মৌলিক এবং মনুষ্যত্বের যত বড় আবেদনই থাক, ঐ নিচ আবেদনগুলির কাছে সারেণ্ডার করে। সেখানে এক ধরনের শ্রেণিচরিত্র। আবার এমন একদল মানুষ আছেন যে সেক্সের সম্পর্ক আছে বলে এই রকম হীন কাজ স্ত্রী করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে যৌন আকর্ষণটি তার শুকিয়ে যায়, সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ মনে করে এ পরিত্যাগ করা দরকার — তার প্রতি আকর্ষণও চলে যায়। এটা আর এক ধরনের শ্রেণি চরিত্র। এই যে যৌনতার কার্ভের দুরকম ব্যবহার, এইখানেই তো প্রোডাকশন রিলেশনের ইমপ্যাক্ট (উৎপাদন সম্পর্কের প্রভাব)। এ জিনিস অনেকভাবে বুঝতে হবে। স্ত্রী যৌন সম্পর্কের জন্য অন্যায় আবদার করছে, আমি মাথা নত করছি। আর একজন যৌন সম্পর্ক আছে বলে স্ত্রীকে অন্যায় আবদার করতে দিচ্ছে না, বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে স্ত্রী যৌন সম্পর্কে আকর্ষিত বলে বা ভালবাসে বলে অন্যায় আবদার করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। সে মনে করে তার স্বামী তার ভালবাসার পাত্র যে মহৎ কাজে ব্রতী, তার যৌনজীবন সেই মহৎ কাজকে সার্থক করার সহায়ক হওয়া দরকার, না হলে, এটা একটা ঘৃণ্য, নিচু জিনিস। তাই আকর্ষণ বিকর্ষণের তারতম্য এইভাবে ঘটে। যেখানে হীনমন্যতা, রেষারেষি, ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে যৌনতাকে কেন্দ্র করে নিচ প্রবৃত্তি প্রশ্রয় লাভ করে এবং যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে;বুঝতে হবে বুর্জোয়া সমাজের সম্পত্তিবোধ সেক্সের ভাবনা ধারণা, ফিলিংকেও (অনুভূতিকেও) সেক্ষেত্রে প্রভাবিত করছে। যেক্ষেত্রে সেক্স শুধু সুন্দরের পূজারী, বিপ্লবী আন্দোলনে সহযোগিতা এবং পরস্পরকে সাহায্য করা এবং ঔদার্যের পরিপূরক, সেখানে সে শ্রমিকশ্রেণির এবং মুক্তি আন্দোলন প্রসূত ভাবনাধারণার দ্বারা, রুচির দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উৎপাদন সম্পর্ক এবং শ্রেণি ভাবনা-চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যেখানে সেক্সের দোহাইতে, ভালবাসার দোহাইতে মানুষ কর্তব্য, আদর্শ ভুলে যায় এবং তার জন্য যুক্তি খোঁজে, সেখানে সে যৌনদাস। এই যৌনদাস সে হয়েছে যৌন নিয়মেই কি? না, যৌন নিয়ম তো আর একটা মানুষের মধ্যেও আছে, আর একটা বিপ্লবীর মধ্যেও আছে। সে তো যৌনদাস হয়নি। যৌনতা তো তার বিপ্লবী জীবনকে আরও প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল করতে সাহায্য করছে। তা যদি না করে থাকে, সে তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই লেনিন বলেছিলেন, পিপাসা পেয়েছে বলেই কি সব মানুষ ড্রেনের (নর্দমার) জল খেতে পারে? পারে না। একদল ড্রেনের জল খায় পিপাসা পেলেই। সে বাছবিচার করে না, তাতে তার রুচিতে আটকায় না, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আটকায় না, কোনও কিছুতেই আটকায় না। কিন্তু অন্য একজন তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে বলেই কি ড্রেনের জল খাবে? খাবে না। সেক্সের ক্ষুধা থাকলেও সেই প্রশ্নেও মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘটে। এক জায়গায় একজন যেভাবে হোক পেতে চায়, আর এক জায়গায় আর একজনের ক্ষেত্রে সেই প্রবৃত্তি গুটিয়ে আসে। এইখানেই হচ্ছে সেক্সের ওপর ভাবের ক্রিয়া। আর শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ভাবের ক্রিয়া হল, শ্রেণিগত ভাবনা-ধারণার ক্রিয়া।

মমতা, অনুভূতি, ভালবাসা ও দুর্বলতা এক জিনিস নয়

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের একটা কথা বলেছি, আপনারা নোট করেছেন কিনা জানি না। এই যে ধরুন সেক্সকে কেন্দ্র করে আবেগ অনুভূতি, এগুলো মনের লেভেলে এসে রসের লেভেলে চলে যায়, এতো জন্তুজানোয়ারের হয় না। সেই প্রসঙ্গে আগেই আমি একটা কথা বলেছিলাম যে মমতা, অনুভূতি, ভালবাসা, স্নেহ, আকর্ষণ এগুলো কোনওটাই খারাপ নয়, অমঙ্গলসূচকও নয় যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট (পৃথক) করতে পারি যে, এর সঙ্গে দুর্বলতা কীভাবে মিশে থাকে। আমরা দুর্বলতাকে মমতা বলে অনেক সময় ভুল করি। মমতার জন্য তো আদর্শহীন আচরণ করা যায় না, স্নেহের আবদারে তো আদর্শহীন আচরণ করার কথা নয়, নীতি বিসর্জন দেওয়ার কথা নয়, যেমন ধার্মিকেরা ধর্ম বিসর্জন দেয়নি। বিপ্লবীরা বিপ্লব বিসর্জন দেয়নি। বড়জোর দুঃখ পেতে পারে, যদি ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী বিপ্লবের সহগামী না হয়। একটু দুঃখ সাময়িক হতে পারে। কিন্তু সে জানে এ দুঃখ সাময়িক, বিপ্লবের আগুনে পুড়ে যাবে এবং বিপ্লবে নতুন নতুন সহকর্মী এবং অসংখ্য ভালবাসার পাত্রপাত্রী এসে তা দুদিনেই মুছে দেবে। মানুষের মন পরিবর্তনশীল, তার আবেগ-অনুভূতি, স্নেহ-মমতা, তাও পরিবর্তনশীল। মমতার দোহাই দিয়ে দুর্বলতার শিকার হওয়ার যুক্তি হয় না। মানুষ যখন এই মমতার বা আকর্ষণের দোহাই দিয়ে এবং তারই ভিত্তিতে দায়িত্ব-কর্তব্যের দোহাই দিয়ে মূল কর্তব্য, বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ভুলে যায়, তখনই বুঝতে হয় ঐসব অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কীভাবে শ্রেণিপ্রভাব এবং শ্রেণিচিন্তার প্রভাব কাজ করছে। তা না হলে আমি কোনও অনুভূতি এবং আবেগের জন্য আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ভুলে যাব কেন? তার থেকে বিচ্যুত হওয়ার যুক্তি আমার মনের মধ্যে দেখা দেবে কেন? বরং উল্টোটাই তো আসবে। আবেগ অনুভূতি, স্নেহ-মমতা কি বিপ্লব বিরোধিতার জন্য? বিপ্লবের সাহায্য করার জন্যই এদের দরকার। আমার আনন্দ দরকার বিপ্লবী হওয়ার জন্যই, আমার সুখ দরকার বিপ্লবী হওয়ার জন্যই। অমানুষ হওয়ার জন্য সুখের কী মানে আছে। আর সেটা কি সুখ? সে সুখে আমার দরকার কী? তাহলে মানুষ হিসাবে এই সব ভাবনা-চিন্তাগুলো খেয়াল করলেই আমরা বুঝতে পারি আমাদের সেক্স অনুভূতি এবং সেক্স ক্রিয়ার মধ্যেও কীভাবে শ্রেণিচিন্তা, শ্রেণি মনোভাবনা, ধারণা, প্রেজুডিস বা সংস্কারগুলো কাজ করে। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আরও বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পুরনো কর্মীরা শুনেছেন। পুস্তিকাকারে বেরোলে নূতন কর্মীরাও জানতে পারবেন।

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির তত্ত্বগত দিক বোঝা দরকার

এরপর যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো এসেছে তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। প্রথমত যুক্তফ্রন্ট কী? মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে

যুক্তফ্রন্টের যে কনসেপশন (ধারণা) তার তত্ত্বগত দিকটা কী? বিপ্লবী আন্দোলনে কেন যুক্তফ্রন্টের কথা দেশে দেশে বার বার উঠেছে? প্রোলেটারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্ট (সর্বহারার যুক্তফ্রন্ট), পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট), ন্যাশানাল ফ্রন্ট (জাতীয় ফ্রন্ট), অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট পিপলস ফ্রন্ট (সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট) — এগুলো সমস্তই যুক্তফ্রন্টের ভাবধারাকে প্রতিফলিত করছে, অথচ শব্দগুলো আলাদা। শব্দগুলো শুনেই বুঝতে পারছেন যে, প্রতিটি শব্দ একই ধরনের যুক্তফ্রন্টকে বোঝাচ্ছে না বা যুক্তফ্রন্ট প্রক্রিয়ার একই স্তরকে নির্দেশ করছে না। একেকটা স্তরে একেকটা বিষয় নির্দেশ করছে। তাহলে, এই যুক্তফ্রন্টের তত্ত্বগত দিকটা কী? তত্ত্বগত দিকটা হচ্ছে, কোনও রাজনৈতিক দল চায় বলেই যুক্তফ্রন্ট হয় না। যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে একটা বিশেষ অবস্থায় বাস্তব আন্দোলনের প্রক্রিয়ার প্রতিফলন। জনগণের চেতনার স্তর এবং বাস্তব অবস্থানের প্রতিফলন। আন্দোলনের মধ্যে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অফ দ্য অপোজিটস (বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য ও সংগ্রাম) যা একটা সরকারবিরোধী আন্দোলনের মধ্যেও রয়েছে, এটা তার একটা রূপ। একটা সমাজব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে যে সমস্ত বিক্ষোভ বা অসন্তোষগুলো জন্ম নিচ্ছে সেইগুলোকে আজকের দিনে কোনও পার্টি অস্বীকার করতে পারে না, কোনও রাজনৈতিক দলই একেবারে তা অস্বীকার করতে পারে না। সরকারবিরোধী নানা মতবাদের যে দলগুলি রয়েছে, তারা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথাগুলো তাদের আপন আপন শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে জনসাধারণকে বোঝাতে চায় এবং তেমনভাবে প্রতিবাদ গড়তে চায় যাতে আপন শ্রেণিস্বার্থের কোনও লোকসান না হয়। বাইরে থেকে মনে হয় তারা বেশ লড়াই করছে। সাধারণ মানুষও মনে করে আমাদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তারা যখন লড়ছে, নিশ্চয়ই তারা জনগণের বন্ধু। এইসব দলগুলো জনগণের বন্ধু সেজে থাকে, আসলে এই দলগুলো কেউই জনগণের আসল বন্ধু নয়। আবার এরা কেউই জনগণকে বাদ দিয়ে পার্টি করতে পারে না, জনগণকে নিয়ে তাদের চলতে হয়। চরিত্রে জনস্বার্থবিরোধী পার্টিগুলিও জনগণের মধ্যে যায় এবং জনগণের দাবি-দাওয়াকে তারা হাইলাইট করে (গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে)। এমনকি কেউ কেউ খানিকটা প্রগতি, বিপ্লবের কথাবার্তাও বলে, বিপ্লবী মতবাদেরও কথা তাদের কেউ কেউ আওড়ায়। এই দলগুলি জনসাধারণের বন্ধু সেজে জনসাধারণকে বিপ্লবের রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লববিরোধী রাস্তায় আটকে রাখে। যাদের মার্কসবাদী পরিভাষায় বলা হয় ফোর্সেস অফ কমপ্রোমাইজ (আপসকামী শক্তি), সিউডো রেভোলিউশনারি (মেকি বিপ্লবী) — দোজ হু অ্যাক্ট অ্যাজ ফোর্সেস অফ কমপ্রোমাইজ বিটুইন লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল (যারা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে কাজ করে)। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বিপ্লব, এইসব কথাগুলো বলেই ওরা কখনও কখনও সত্যিকারের বিপ্লবী লাইন এবং বিপ্লবী রাস্তা থেকে মানুষকে কতকগুলি মিথ্যা এবং ফেক (মেকি) লড়াইতে আটকে রাখে। কখনও কখনও এই দলগুলি দৈনন্দিন লড়াইগুলোকে উগ্র মারমুখী এবং ফেক মিলিট্যান্ট (মেকি জঙ্গী) কায়দায় চালিয়ে মানুষকে বোঝায় যে এইটেই বিপ্লবের রাস্তা এবং এই রাস্তাতেই বিপ্লব হবে। পিপল লড়ছে এই পার্টিগুলির নেতৃত্বে। কিন্তু শ্লোগানে, অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করে দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করার মানে পিপলের মধ্যে পলিটিক্যাল পাওয়ার ডেভেলাপ করছে (রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠছে) তা নয়। মালিকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে — মালিকী ব্যবস্থা মুর্দাবাদ, ইয়ে ব্যবস্থাকো উখাড় ফেকনা হোগা, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইত্যাদি — তার মানে এর দ্বারা তাদের মধ্যে ইনকিলাবি চেতনা গড়ে উঠছে না। সেই জন্য ওয়ার্কিং ক্লাসের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মালিকশ্রেণি সম্বন্ধে বা সমাজ সম্বন্ধে যে চেতনাটা হয় তাকে পাল্টানো দরকার। বিপ্লব করা দরকার, এটা হল একটা ভাসাভাসা কনসেপশন (ধারণা)। এই কনসেপশনটা একটা ক্লিয়ার কাট বেস (সুস্পষ্ট মৌলিক) পলিটিক্যাল লাইনের ভিত্তিতে নয়, এবং এর ভিত্তিতে কখনও জনতার পলিটিক্যাল পাওয়ার (জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা) গড়ে ওঠে না। এটা আপনা আপনিও গড়ে ওঠে না। মালিকের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে মজুরদের মধ্যে একটা টাইপ অফ কনসাসনেস (এক ধরণের চেতনা) গড়ে ওঠে — মালিকরা শত্রু, সরকার মালিকের দোসর, এই সরকার মালিককে সাহায্য করছে। আবার ইলেকশনের রাজনীতিতে বা অন্য আর একটা জায়গায় বিভ্রান্ত হয়ে ওই মজদুররাই সরকার পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের ঝাণ্ডা উড়িয়ে বসে থাকে। এটা কী ইন্ডিকেট করে? এটা ইন্ডিকেট করে যে, এটা ব্যাকওয়ার্ডনেস (পিছিয়ে পড়া চিন্তা), ডেভেলাপড ক্লাস কনসাসনেস নয় (উন্নত শ্রেণি চেতনা নয়)। এটা কখনোই পলিটিক্যাল রেভোলিউশনারি কনসাসনেস নয়, আর এভাবে তার জন্ম হতে পারে না। এই ক্লাস কনসাসনেস জন্ম হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না রেভোলিউশনারি পার্টি অ্যান্ড রেভোলিউশনারি পলিটিক্স সোসালিস্ট মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে ইমার্জ করে (আবির্ভূত হয়)। ততক্ষণ পর্যন্ত এই কনসাসনেসের জন্ম হতে পারে না। সেই জন্য লেনিন বলছেন, সোস্যালিজম কামস ফ্রম উইদাউট, নট ফ্রম উইদিন (সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বাইরে থেকে আসে, ভেতর থেকে আপনাআপনি উদ্ভুত হয়না)। ওয়ার্কারের পলিটিক্যাল স্ট্রাগল যেটা বিপ্লবী পার্টি করে, তার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের যথার্থ চেতনা মজুরের কাছে যায়। তখন মজুর বুঝতে পারে যে, তার এক্সটেনশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (গণতান্ত্রিক অধিকারের বিস্তার), ফুলফিলমেন্ট অফ এনি অ্যামাউন্ট অফ ডিমান্ড (যত দাবিই পূরণ হোক) বা যত দাবি-দাওয়ার লড়াই হোক, এবং যতই লড়াই করে জেতা হোক, তার দ্বারা মালিক মজুর সম্পর্কের অবসান হয় না। যে মজুর, সে মজুরই থাকবে এবং তার মুক্তি এর দ্বারা হবে না। তার মুক্তি আনতে হলে তাকে এইটা বুঝতে হবে যে, শুধু মালিকের বিরুদ্ধে মজুরের দাবি নিয়ে লড়াইয়ের জন্য যে ক্লাস স্ট্রাগলের চেতনা সেটা রেভোলিউশনারি চেতনা নয়। যতদিন ক্লাস স্ট্রাগলের চেতনা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে ডিক্টেটারশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট (সর্বহারার একানায়কতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিপ্লবের মারফৎ নিজের পলিটিক্যাল পাওয়ার সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে — এই স্তরে না পৌঁছায়, সেটা মার্কসবাদের ক্লাস স্ট্রাগলের কনসেপশন হয় না বা রেভোলিউশনারি কনসাসনেস হয় না।

তাহলে মাসের এই প্রিভেইলিং কনফিউশন (বিরাজমান বিভ্রান্তি) দূর করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী হবে? পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ছাত্র শাখাও শ্লোগান দেয়, তারাও বলে পুঁজিবাদ মুর্দাবাদ। সিপিএম, সিপিআই, নকশাল, আরএসপি বলছে একচেটে পুঁজিবাদ মুর্দাবাদ। এমনকি ওয়ার্কার্স পার্টি বা আরসিপিআই, আরএসপি যারা সিপিএম-এর লেজুড়বৃত্তি করে, তারাও বলছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ, পুঁজিবাদ মুর্দাবাদ। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে? রেভোলিউশনারি পার্টি শ্রমিকের মধ্যে এবং মাসের মধ্যে রিয়েল লিডারশিপ (সঠিক নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠা কীভাবে করবে? আবার একাজটা অবশ্যই বিপ্লবী পার্টিকে করতে হবে, না হলে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে উঠবে না। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম শর্ত হল, ইউনাইটেড স্ট্রাগলের (ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের) মধ্যে সমস্ত জনগণকে একত্রে জড়ো করা এবং একত্রে লড়াই করা। একত্রে না লড়াই করলে এটা গড়ে উঠবে না। তাহলে লড়াই ছাড়া এই কনসাসনেস গড়ে তোলার যখন কোনও উপায় নেই, তখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করার উপায় ইউনাইটেড স্ট্রাগল ছাড়া হতে পারে না। ইউনাইটেড স্ট্রাগলের মধ্যে প্রত্যেক পার্টি তাদের পার্টি লাইনে চলার চেষ্টা করে, একটা বিপ্লবী দলও বিপ্লবী লাইনে সেই চেষ্টা করে। বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতি এবং জনসাধারণের চেতনা নিম্নস্তরে থাকার জন্য এমনকি ফিলানথ্রপিস্টদের প্রভাবও যে মাসের ওপরে থাকে, সেই মাস ইউনাইটেড স্ট্রাগলের মধ্যে একত্রে জড়ো হয়। আপনারা তো এও দেখেছেন যে, ধর্মীয় মিশনারির মতো একজন সেবাধর্মী লোক সম্পর্কেও কী বড় ধারণা মানুষের — এরা অনেক বড়, আমাদের জন্য কাজ করেন বলে তার পেছন পেছন মাস (জনতা) চলল। আর সে কর্মী তাদের ডুবিয়ে বারোটা বাজিয়ে দিলো। অথচ লোকটির উদ্দেশ্য ধরতেই পারল না। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পিপলকে রিয়েল ইস্যু থেকে সরিয়ে অন্য ইস্যুতে তাদের মাইন্ডটাকে নিয়ে যাওয়া, কিছু রিলিফ দেওয়া, আর এটা ওটা কিছু করা।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে খতম করা যাবে না

এই যে মাস (জনতা) বিভিন্ন ফোর্সেসের ইনফ্লুয়েন্সে (প্রভাবে) টুকরো টুকরো হয়ে রয়েছে এবং পার্টিকুলারলি (বিশেষ করে) যারা রেভোলিউশনারি ছদ্মবেশ ধরে আছে, যাদের বেস পলিটিক্যাল লাইন বিপ্লবী নয়, পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার অফ দ্য পার্টি বিপ্লবী নয়;যে অ্যানালিসিসে (বিশ্লেষণে) আপনারা বুঝেছেন যে আলটিমেটলি তারা পিপলকে বিপ্লবে নিয়ে যেতে চায় না;পিপলের মধ্যে যে আউটবার্স্টটা আসে (বিস্ফোরণ ঘটে), লড়াইয়ের ফারভারটা (উদ্দীপনা) আসে সেটাকে তারা ডাইভার্ট (বিপথগামী) করে ইলেকশনে ফায়দা তুলতে চায়। প্রথম দিকে এইরকম ফোর্সগুলোর প্রভাব থাকে পিপলের কনসাসনেস না থাকার জন্য। সেইজন্য স্ট্যালিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলছেন — টু পুট অ্যান এন্ড টু ক্যাপিট্যালিজম, ইট ইজ নেসেসারি টু পুট অ্যান এন্ড টু সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজম (পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে ধ্বংস করা প্রয়োজন)। একথা কেন বলছেন? সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজমের কথা বলছেন কেন? ক্যাপিট্যালিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেতনাটা মাসের মধ্যে যখন আসতে থাকে, যারা প্রো-ক্যাপিট্যালিস্ট পার্টি তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মোহ কাটাতে বেশি সময় লাগে না। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও সেটা কাটাতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে যারা অ্যান্টি ক্যাপিট্যালিস্ট বলে পোজ করে, লাল ঝাণ্ডা ওড়ায়, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির কথা বলে, কমিউনিজমের কথা বলে, ক্লাস স্ট্রাগলের কথা বলে, মজুরের কথা বলে, মালিকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়;যারা আসলে ফোর্স অফ কমপ্রোমাইজ (যারা আপসকামী শক্তি), মেকি বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ফোর্স — এই ফোর্সদের সম্পর্কে মোহমুক্তি না ঘটলে, এদের নেতৃত্বের প্রভাবের বাইরে মাসকে না নিয়ে আসতে পারলে, শ্রমিক-মজুরের রিয়েল পলিটিক্যাল পাওয়ার যে গড়ে উঠবে না — এই কথাটা বোঝাতে না পারলে রেভোলিউশন হয় না। সেইজন্য বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইউ কানট গিভ ডিফিট টু অল শেডস অফ (সব ধরনের) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজম, মিনিং (অর্থাৎ) সিউডো রেভোলিউশনিজম, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবকে ফাইনালি জয়যুক্ত করা, কারেক্ট পলিটিক্যাল পার্টির লিডারশিপ এসট্যাব্লিশ করার চিন্তা হল ইজ আনসাইন্টিফিক ওয়ে অফ থিংকিং (অবৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারা)। আপনি কাজ করলেই হয় না। আপনার কাজের মধ্যে টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন থাকে, সাকসেস এবং ফেইলিওর থাকে। সংগ্রাম করা মানে তো আমরা সবসময় মাসের প্রবলেম সলভ (সমস্যা সমাধান) করে দিতে পারি না। লড়াইগুলোতে কি আমরা সবসময় জিতি? না, বরং উল্টো হয়। বিপ্লবী দলের ওপর আক্রমণ মারাত্মক হয়। সেই আক্রমণের মুখে প্রথম প্রথম তাদের ফেইলিওর হয়, কিন্তু বিপ্লবী দলের কর্মীরা এই ফেইলিয়োরের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে, মাস ডিফারেনসিয়েট (জনসাধারণ পার্থক্যবোধের মাধ্যমে বিচার) করে আন্দোলনের মধ্যে কে কীভাবে লড়ছে, কার স্লোগান কীরকম, কোন দলের কর্মীদের হালচাল কীরকম — এই সবের প্রভাব পড়ে। তাৎক্ষণিক এর ফল না পেলেও, মনে রাখবেন এর মধ্য দিয়ে আপনার শক্তি বাড়ে, ক্ষমতা বাড়ে।

বিপ্লবী চরিত্র ছাড়া বিপ্লবী দল হয় না

আপনাদের আর একটা কথা এখন বলতে চাই। আমাদের দলটা শুরু থেকে একটা বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে, বিল্ডিং আপ অফ রেভোলিউশনারি ক্যারেক্টার (বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলা)। কমিউনিস্টদের কাছে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী চরিত্র বিল্ড আপ করা। কারণ আমাদের দল গঠনের যা ভিত্তি, যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই নতুন দলটির অভ্যুত্থান;বিশেষ করে এদেশে এই দলটা গড়তে গিয়ে আমরা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। তখন যে মানুষ অনেস্টি (সততা) ও ফাইট (লড়াই) করার আকাঙ্খা নিয়ে, যাকে সাধারণ মানুষের অর্থে বা বুর্জোয়া অর্থেও ত্যাগ স্বীকার বলি, অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য, আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা বলি — সেইরকম প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার পিছনে বা সিপিআই দল গড়ার পিছনে বহু কর্মীর বহু অবদান ছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আরসিপিআই গড়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁর পিছনেও অনেক ভাল ছেলের, ভাল ভাল লোকের ঐ অর্থে যাকে আত্মত্যাগ এবং অবদান বলি সে সব যথেষ্ট ছিল। এমএন রায়ের মতো মানুষ, জ্ঞানে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সেই যুগে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর সমকক্ষ আমি কাউকে দেখতে পাইনি। বাকি সব তো পিগমি (অতি ক্ষুদ্র)। যারা এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা কংগ্রেসই হোন বা বামপন্থীই হোন, অন্য যে কোনও দলেরই হোক সকলেই সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত(!)। লোক ক্ষেপানো আর চালাকির কথা বলা ছাড়া আর তারা কী করছে? হ্যাঁ, করছে কীভাবে কায়দা করে, ডিপ্লোম্যাসি, চালাকি আর চটুলতা করে চলা যায়। যেগুলোকে আমরা দুষ্ট রাজনীতি বলি। তাদের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি, উইসডম বা কোনও শাস্ত্র সম্বন্ধে ধারণা তথৈবচ, একদম নেই বললেই চলে। কিন্তু পুরনো দিনে অন্যান্য অনেক নেতাই ছিলেন, যাদের আজকের নেতাদের মত শুধু চালাকির দ্বারা রাজনীতি করাটা ছিল না। মানুষ হিসাবেও তাদের চরিত্রের একটা ভিত ছিল। বুর্জোয়া রাজনীতিই হোক বা বিরোধী রাজনীতিই হোক, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি একটা বেশ উচু স্তরে ছিল। আপসমুখী কংগ্রেসী রাজনীতি বা বিরুদ্ধপক্ষ আপসহীন বুর্জোয়া রাজনীতিতেও বড় বড় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আর এমএন রায় ওয়াজ অ্যান এক্সসেপশন (ব্যতিক্রম), তিনি সত্যিই পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় প্রবেশ করেছেন, গভীর পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। এইরকম একজন মানুষ পার্টি গঠন করার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের ইন্টেলেকচুয়ালরা, একসময় জহরলালের মত ইন্টেলেকচুয়াল তাঁর দিকে প্রবলভাবে অ্যাট্রাকটেড (আকৃষ্ট) হয়েছিলেন। এসব অতীত দিনের কথা, অনেকেই এসব খবর রাখেন না। তিনিও এদেশে কোনও দল খাড়া করতে পারলেন না। যে দল খাড়া করলেন সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শুধু তাই নয়, সেই দলের বেশিরভাগ লোকগুলো হয় সিআইএ'র এজেন্ট, নাহয় কেরিয়ার সিকারস, না হয় এখানে ওখানে চাকরি করছে, এরা সব সিউডো ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে গেল। তারা কেউই রেভোলিউশনারি হয়নি। অথচ তিনি অতবড় একজন ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন এবং তাঁর লাইফ একটা সময়ে রেভোলিউশনারির মতোই ছিল। ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যাওয়া ফাঁসির আসামী এবং তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একটা ইমপর্ট্যান্ট পজিশনে ছিলেন। কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে একজনও বড় মাপের রেভোলিউশনারি তো দূরের কথা একজন সাধারণ রেভোলিউশনারিও তৈরি হয়নি। অন্তত আমি তা দেখতে পাইনি। বরং দেখেছি ইগোসেন্ট্রিক (অহংসর্বস্ব), ফুল অফ ভ্যানিটিওয়ালা (দম্ভে পরিপূর্ণ) লোক তৈরি হয়েছে। আর কিছু পড়ুয়া পণ্ডিত এবং ব্যক্তিবাদের ঝোঁক সম্পন্ন সেলফিস (স্বার্থপর) টাইপের কতগুলো মানুষ তৈরি হয়েছে। এটা আমাকে অদ্ভুতভাবে ভাবিয়েছে যে — কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার জন্য কত ছেলেমেয়ে বাড়িঘর সর্বস্ব ত্যাগ করে, বাপ-মাকে কাঁদিয়ে এসে সবকিছু করার জন্য লাইফ দিয়ে পার্টিটাকে গড়বার চেষ্টা করল। অথচ দেখতে পেলাম পরবর্তী সময়ে সেই লোকগুলোই চরম সুবিধাবাদী হয়ে গেল, যাদের লাইফে কোনও প্রিন্সিপল (নীতি) নেই, ডিক্টাম (বিচারসিদ্ধান্ত) নেই, ডেকোরাম (শালীনতা) নেই, নির্ধারিত নীতি নেই। এইগুলো আমাদের খুব ভাবিয়েছে এবং একটা জিনিস শুরু থেকেই আমাদের মাথায় ধাক্কা দিয়েছে, যদি সত্যি সত্যিই একটা বড় আদর্শ গ্রহণ করা হয়, তার ডেলিভারির ভেহিকেলটা (মানুষের মধ্যে সেই চিন্তা পৌঁছানোর বাহন) কী হবে। যদি সত্যিই খুব বড় একটা আদর্শ হয়, কিন্তু সেটার ভেহিকলটা যদি সঠিক না হয়, তাকে কংক্রিট সিচুয়েশনে ট্রান্সলেট (বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ) করা, বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং কার্যকরী করার জন্য ঠিক উপযুক্ত চরিত্রসম্পন্ন মানুষগুলো তৈরি না হয়; সেই বিপ্লবের উপযোগী চরিত্র, ক্যারেক্টার, ডিটারমিনেশনের (দৃঢ়তার) দিক থেকে এবং আউটলুক ও কনসেপশনের দিক থেকে যদি সেইরকমভাবে মানুষগুলো গড়ে না ওঠে, সকল কর্মী না হলেও অন্তত নেতৃত্বদানকারী কর্মীরা, নেতৃত্বের মধ্যে সকল নেতা না হোক অন্তত ন্যূনতম মেজরিটি — যদি তেমন ধরনের চরিত্রের আধার, কমিউনিস্ট চরিত্রের আধার নিয়ে এবং জীবনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন না করে, তাহলে তা ব্যর্থ হতে

বাধ্য। কারণ আলটিমেটলি এই চরিত্র গড়ে না তুলতে পারলে, বিপ্লবের উপযোগী করে চরিত্রটা গড়ে তুলতে না পারলে, যে মহৎ আদর্শটা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম, তা রক্ত-মাংস ও রসের সাথে ভিতরে গিয়ে ঢোকে না। সেটা ওপরে ওপরে বলার জন্য ওপর ওপর থেকে যায়। সেটা বড় বিপ্লবী আদর্শের যেটা প্রাণসত্তা বা মর্মবস্তু, তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই কথাটা আমাদের খুব ভাবিয়েছিল।

তাই আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বুঝেছিলাম, একটা বড় বিপ্লবী দল গড়ার জন্য শুধু একটা আদর্শ, রাস্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ঠিক হলেও চলবে না। সেই রাস্তায় পদক্ষেপের জন্য একটা সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এথিক্যাল, মরাল সমস্ত দিক থেকে মুভমেন্ট (সর্বাত্মক আন্দোলন) শুরু করা দরকার। একটা সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট কাভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ শুরু করা দরকার। শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বক্তব্যটা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হবে, আর শিক্ষা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব তখন শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি নেই বা ভালবাসা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব তখন শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না, পারিবারিক সম্পর্ক, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব, যৌনতা সম্বন্ধে যখন কোনও প্রবলেম সামনে আসবে তখন তা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছি না, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব, কোনও ইমোশনলান ফ্যাক্টর, এগুলোর সামনে যখন পড়ছি তখন তাকে বিচার করার সময় শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি আমার কাজ করে না, তাহলে আর যাই হোক বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে না। এগুলো সবই তো শ্রেণি সংগ্রামের ইমপ্যাক্ট। অর্থাৎ শ্রেণিভাবধারার দ্বারা যে এগুলো প্রভাবিত, শ্রেণিসম্পর্কের দ্বারা যে এগুলো প্রভাবিত, তা এসব বিষয়ে কি কাজ করে না? এরকম যদি হয় মার্কসবাদটা যদি শুধু বক্তৃতায় এবং আন্দোলন বা লোক ক্ষেপাবার জন্য আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমি রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে বা বার্ণার্ড শ'র ফলোয়ার হতে পারি — তাহলেও তাদের দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবী আন্দোলন মাঝপথে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। আমি বুঝেছি পরিষ্কার ভাষায় না বললেও রেভোলিউশনারি থিওরি বলতে লেনিন কখনও শুধুমাত্র পলিটিক্যাল, ইকনমিক থিওরি আর স্টেজ অফ রেভোলিউশনটা ঠিক করা বোঝাননি। ফলে সোস্যালিস্ট মুভমেন্টটা কাভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ রিলিজ (জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি) করতে হবে। আমরা সেইজন্যই মরালিটি, এথিক্স এবং ক্যারেক্টার বিল্ডিং-এর দিকে এত জোর দিয়েছি।

বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দলের শক্তি কোথায় নিহিত তা বুঝতে হবে

এখানে আর একটা বিষয়ও বোঝা দরকার কমরেডদের। এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে নিজেদের শক্তি কোথায় নিহিত, এটা ভালভাবে বুঝতে না পারাটাও একটা অপরাধ এবং অন্যায়। ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং (একটা কথা আপনাদের বুঝে নিতে হবে)। ওভারএস্টিমেট (অযথা বড়) যেমন নিজেকে করতে নেই, তেমনি আন্ডারএস্টিমেটও (অযথা ছোটও) করতে নেই। নিজের শক্তিকে অযথা বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে দেখাও হচ্ছে যেমন ভ্রান্ত ও অন্যায়, আবার একেবারে তুচ্ছ করে দেখাটাও ঠিক নয়। তার ফলে কাজ খানিকটা নষ্ট হয়, বিপথগামী হয়। তাই শক্তি আমাদের কোথায় সেটাও ভাল বোঝা দরকার।

আমরা যখন দল গঠন করি, তখন আমরা কারা? আমাদের তখন কিছুই ছিল না। আমাদের নাম করা কোনও নেতা ছিল না, টাকাপয়সা ছিল না, আমরাই একমাত্র পার্টি যার সোস্যাল ব্যাকিং (সামাজিক সমর্থন) বা সোস্যাল হাইআপ সোর্স (উঁচুতলার থেকে প্রাপ্তিযোগ) যাকে বলে তা ছিল না। একটা পয়সাওয়ালা লোক বা এ ধরনের কোনও সিমপ্যাথাইজারও (দরদী) তখন আমাদের গড়ে ওঠেনি। পাঁচ-দশটা লোক যারা পার্টিকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে পারে এরকম কাউকে তখন আমরা পাইনি। অত্যন্ত কমন ম্যান, এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আর মজুর চাষি ঘরের ছেলেপুলে, বা ওরই মধ্যে কেউ একটু চাকরি করে মোটামুটি জীবনযাপন করে — এই হচ্ছে তখন আমাদের পার্টির কর্মীদের, এমনকি সাপোর্টারদের ক্যাটিগোরি (অবস্থা)। এই নিয়ে আমাদের পার্টির কাজকর্ম শুরু। তখন দিন আনা দিন খাওয়ার মত অবস্থা আমাদের। ফলে ফ্রম দ্য ভেরি ইনসেপশন (একদম শুরু থেকে) আমাদের কর্মীরা — এমনকি এমএ, বিএ পাশ করা গুটিকয়েক শিক্ষিত কর্মী, মাস্টার, প্রফেসার — যারা তখন পার্টির আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল, এমন সব কর্মীদেরও রাস্তায় বাক্স নিয়ে সারাদিন ঘুরে মুখে রক্ত তুলে পাবলিক থেকে কালেকশন (অর্থসংগ্রহ) করে আমাদের খরচ চালাতে হয়েছে। সকল রাজনৈতিক দল আমাদের কোণঠাসা করতে চেয়েছে। ঠাট্টা টিটকারি করে বলত, চামচিকাও পাখি আর এস ইউ সিও পার্টি। কাজেই আমাদের সাথে আবার কথাবার্তা বলার কি আছে? তারা ইউনাইটেড ফ্রন্টেও আমাদের রাখতে চায়নি। আজ যদি দলের মধ্যে কিছু নেতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, যদি নাম কিছু হয়ে থাকে, কিছু ইজ্জত হয়ে থাকে, তবে সেটা বুর্জোয়া প্রেস তৈরি করে দেয়নি। বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে জনতার আন্দোলন, কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দেশে কিছু ভাবগত আন্দোলন এবং সংগ্রামের কন্ট্রিবিউশনের (অবদানের) মারফত তা সৃষ্টি হয়েছে। বুর্জোয়ারা তা করে দেয়নি, প্রেস তা করে দেয়নি। কোনও প্ল্যাটফর্ম কেউ দেয়নি। যেমন করে অন্য সব ছোট পার্টিগুলো ঐ সিপিআই, না হয় সিপিএম-এর লেজুড়বৃত্তি করে, নাহয় ওদের তোষামোদি করে এই প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেতা হচ্ছে — এ দলের কোনও নেতা তেমন করে সৃষ্টি হয়নি। তাদের দয়াদাক্ষিণ্যে এ দলে কেউ নেতা হয়নি। এই দলের কর্মীরা এক সঙ্গে লড়াই করেছে কিন্তু তোষামোদ করেনি, তাদের দাসত্ব স্বীকার করেনি বলেই সকল দলেরই ক্ষোভ। তাদের ভাবখানা ছিল, ছোট একটা পার্টি তার এত তেজ! তা সত্ত্বেও যদি কিছু নেতা সৃষ্টি হয়ে থাকে এ দলে, সেটা হয়েছে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টায় এবং রক্ত ঢেলে।

তাহলে এই দলটা কিসের ভিত্তিতে শক্তি অর্জন করছে, যার ইন্টারন্যাশানাল ব্যাকিং নেই, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কৃতিত্ব সে ব্যবহার করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কৃতিত্ব ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ইউজার্প (আত্মসাৎ) করেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের যত কৃতিত্ব, তার যা ঢেউ এদেশে এসেছে তার সমস্ত কৃতিত্বটুকু, ফলটুকু ভোগ করেছে অবিভক্ত সিপিআই। আমাদের পক্ষে এটা ছিল আর একটা অ্যাডিশনাল ডিফিকাল্টি (অসুবিধে)। আমাদের প্রথমে মানুষকে বোঝাতে হতো যে কমিউনিজমই ঠিক, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই ঠিক এবং এটাই বিপ্লবের সঠিক রাস্তা। বোঝাতে হতো, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্গ হবে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন, ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রশ্ন তুলতো, তাহলে আপনাদের সোভিয়েটের পার্টি কেন রেকগনাইজ করে না (স্বীকৃতি দেয় না)? চীনের পার্টি কেন রেকগনাইজ করে না? আপনারাই যদি ঠিক তবে চীনের পার্টি আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে মানে না কেন? সিপিআইকে সোভিয়েটের পার্টি মানে কেন? নাও, তার উত্তর দাও। এগুলো বোঝানোর পর এসে গেল কমিউনিজমই যদি ঠিক পথ তবে ভুল করুক আর ঠিক করুক এটাই তো কমিউনিস্ট পার্টি, তাহলে এটাকেই শুধরে নিয়ে কাজ করাতো ভাল। তারপর আবার বোঝাও এটা কেন কমিউনিস্ট পার্টি নয়, নাম কমিউনিস্ট হলেও কেন কমিউনিস্ট পার্টি নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবির স্বীকার করলেও কেন কমিউনিস্ট পার্টি নয়, কি অর্থে কমিউনিস্ট পার্টি নয়। তারপর আলোচনা করে দেখানো হল, ওটা পেটিবুর্জোয়া পার্টি এবং কি অর্থে ও কেন নানা চুলচেরা বিচার করে করে দেখানো হল। তারপর আবার বোঝানো, একটা পেটি বুর্জোয়া পার্টিকে তার ভুল শুধরে কোনওদিনই একটা শ্রমিকশ্রেণির দলে পর্যবসিত করা যায় না। এত কথা বুঝিয়ে তবে একটা একটা করে ক্যাডার আমাদের রিক্রুট করতে হয়েছে। আমাদের দলে কর্মী রিক্রুট করতে হয়েছে সিপিআই, সিপিএমের মতো করে নয়। কমিউনিজমে আকৃষ্ট হল, ভিয়েতনামের লড়াইয়ে উৎসাহিত বোধ করল, আর এরাও কমিউনিস্ট পার্টি এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকে পড়ল, এভাবে আমাদের পার্টিটা গড়ে ওঠেনি। কত প্রতিকূল পরিস্থিতি, বিরুদ্ধ পরিবেশে ফাইট করে করে আমাদের এগুতে হয়েছে। অনেক কর্মী যখন এই যে প্রশ্নের সামনে পড়ে যে — আপনাদের পার্টির বিশ বছর হয়ে গেল তবে এতটুকু ডেভেলাপমেন্ট নেই কেন, তখন তারা আর উত্তর খুঁজে পায়

না। আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তাদের ঠাট্টা করে জবাব দিয়েছি যে, তোমরা তো সব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ যা বিচার করে দিয়েছিলেন, তোমাদের দেখি ডায়ালেক্টিক্যাল মেটেরিয়ালিজমের (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের) জ্ঞান অর্জন করার পরও সেই বিচার করার ক্ষমতাটুকুও নেই। তোমরা কি কুরুক্ষেত্রের ভীষ্ম এবং অর্জুনের যুদ্ধের কাহিনী পড়েছ? যদি পড়ে না থাকো, তবে তোমাদের একটা কাহিনী শোনাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যেদিন দুর্যোধনের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়ে সত্যি সত্যিই বীরবিক্রমে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাতে বাণে বাণে অর্জুন একেবারে জর্জরিত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সেদিন। অর্জুন তখন মহাক্ষিপ্ত হয়ে প্রবলবেগে ভীষ্মের রথের দিকে একটা বাণ নিক্ষেপ করল, তাতে ভীষ্মের রথটা ধরুন পাঁচ-দশ হাত পিছিয়ে গিয়েছে। এটা ভীষ্মের কাছে একটা অপমান। ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গে রথটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসে প্রত্যুত্তরে প্রবলবেগে অর্জুনের রথে পাল্টা একটা বাণ নিক্ষেপ করেছে। ধরুন, সেই বানে অর্জুনের রথটা আধ কিংবা এক হাত পিছনে গিয়েছে। রথ দুটো দেখতে একরকম এবং বাহ্যিকভাবে দুটোরই সমান ওজন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সমস্ত দুঃখ বেদনা ভুলে গিয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠল বাঃ বাঃ ভীষ্ম, তোমার মত বীর, তোমার মত শক্তিমান ভূভারতে কখনও আসেনি, আর কখনও আসবে না। অর্জুন তখন বলল, কৃষ্ণ তুমি হলে আমার সখা, আমার বন্ধু, পাণ্ডবদের বন্ধু, আমার রথের সারথী হয়ে আমি দাদু ভীষ্মের রথকে পাঁচ হাত হটিয়ে দিলাম, তুমি আমাকে তারিফ করলে না। আমি বীর বলে আমার শক্তির তারিফ করলে না। আর দাদু ভীষ্ম আমার রথকে মাত্র আধ হাত হটিয়েছে আর তুমি বললে এতবড় বীর, এতবড় শক্তিমান ভূভারতে কেউ হয়নি! এ কি তোমার বিচার? তুমি ধার্মিক, তুমি ন্যায়বান, এ তোমার কী বিচার হল? কৃষ্ণ বলল, বুঝতে পারলে না? অর্জুন বলল, না, বুঝতে পারলাম না। কোন ঘটনাকে কীভাবে বিচার করতে হয় সেটাই বোঝার বিষয়। আসলে পবনপুত্র হনুমান বায়ুর সমস্ত চাপ নিয়ে অর্জুনের রথের চূড়ার ওপর বসে আছে। তার মানে অর্জুনের রথটি যেটি দেখতে একরকম হলেও, আসলে তার উপর বায়ুর প্রবল চাপ নিয়ে হনুমান বসে আছে রথের চূড়ার ওপর। আর নিজে কৃষ্ণ, তাকে বাইরে দেখতে একরকম। কিন্তু, মহাভারতে কৃষ্ণ হল নারায়ণ, বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর মানে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি এবং ভার নিজের মধ্যে নিয়ে বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করে রথের উপর বসে আছে। ফলে রথটি একরকম দেখতে হলে কি হবে, সেই রথের ওপর বায়ুর চাপ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভর দুটোই কাজ করছে; সেই রথকে ভীষ্ম বাণ মেরে আধ হাত পিছিয়ে দিয়েছেন। অর্জুনকে বোঝাবার জন্য কৃষ্ণ হনুমানকে বললেন, হনুমান তুমি তোমার ভারটি ছেড়ে দাও এবং তিনিও বিশ্বম্ভর মূর্তি ত্যাগ করে সাধারণ কৃষ্ণ হলেন। এবার ভীষ্ম একটি বাণ মেরেছে। যেই না বাণটি মেরেছে, অর্জুনের রথ তখন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরতে শুরু করেছে, আর অর্জুন রথের বাহু জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছে বাঁচাও বাঁচাও বলে। কৃষ্ণ বলছে সখা বুঝতে পারলে, কেন তারিফ করেছি? তা মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্র তো মার্কসবাদী, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নয়, অথচ কৃষ্ণ যে বিচারটি করেছে তোমরা যারা এ ধরনের প্রশ্ন তুলছ, বিশ বছরেও কেন আর ডেভেলাপমেন্ট হলো না, তোমাদের তো সেটাও নেই।

স্বাধীনতার পরে একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি। তাছাড়া সোস্যালিস্ট পার্টি, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক — সেগুলোও তখন অনেক বড় পার্টি। অত বড় সোস্যালিস্ট পার্টি ভাঙতে শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙতে ভাঙতে আজ তিন টুকরো। আবার তারাও আরও টুকরো হতে যাচ্ছে। সোস্যালিস্ট পার্টি ছাড়াও আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক এইসব পার্টিগুলো ভাঙতে ভাঙতে ক্ষয় হতে হতে এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সময়ে আমাদের পার্টি কয়েকটা হাতে গোনা আনকোরা কর্মী নিয়ে একটা পার্টি গঠন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে সময় আমাদের তো ঝড়ে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল। যার আন্তর্জাতিক ব্যাকিং (পৃষ্ঠপোষকতা) নেই, বরং যারা প্রকৃত কমিউনিস্ট নয় বলে আলাদা দল গড়ে তুলছি, তারা সেই ব্যাকিং পাচ্ছে। অন্যদিকে অভিজ্ঞ কর্মী নেই, নামকরা সর্বভারতীয় নেতা নেই, প্রেস পাবলিসিটি নেই, সমস্ত দলের সম্মিলিত আক্রোশ এবং বিরুদ্ধতা — তার মধ্যে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে আজ এই জায়গায় এসে এই পার্টিটা দাঁড়িয়েছে। এ কি সোজা শক্তি? এ শক্তি কিসের শক্তি? এ আসতে পেরেছে এই কারণে যে, এর আদর্শ এবং রাস্তা সঠিক ছিল। এর কি কোনও ভুলভ্রান্তি নেই, এর সবই কি ঠিক, এর প্রতিটি নেতা কি সবসময় সঠিক আচরণ করেন, প্রতিটি কর্মী কি সবসময় সঠিক আচরণ করে? না, এসব দাবি আমরা করতে পারি না, আমরা এসবের বিরুদ্ধে সজাগ এবং এগুলো দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাই। তবে একথাটা খেয়াল রাখবেন, এইসব কথার দ্বারা মূল কথাটা আপনাদের যেন গোলমাল না হয়। মূল কথাটা হল — সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে, প্রবল অ্যান্টি কারেন্টের বিরুদ্ধে কি সেই প্রবল শক্তি যার ওপর ভিত্তি করে পার্টিটা আজ এই জায়গায় এসেছে। সে শক্তিটা হল, এই পার্টিটা একটা মূল আধারের উপর, সঠিক আদর্শ আর কতকগুলো দৃঢ়চেতা কর্মী, যাদের বিপ্লবী চরিত্রের একটা মান আছে, যে কোনও অবস্থাতে সে ফাইট করে, তারা মাথা নিচু করে না, কুসংস্কার মুক্ত, আর যেকোনও অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সব সময় তৈরি হয়ে আছে। আর ত্রুটিবিচ্যুতি যেগুলো আছে, যেগুলো এখনই আমাদের কাজকে আগে বাড়াতে অসুবিধা সৃষ্টি করছে, সেগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা হচ্ছে। কিন্তু এই ত্রুটিগুলোকে হাইলাইট করে এর মূল শক্তিটির দিকে লক্ষ্য না রাখা বা তাকেই দুর্বল করার চেষ্টা করা, সে সম্বন্ধে মানুষকে সঠিক ধারণা না দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা, এবং এমনভাবে আবার প্রশ্নগুলো তোলা বা আলোচনা করা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি করা — এটা অন্যায়। কারণ, এর ফলে আমি আমার ক্ষতি করছি, আন্দোলনের ক্ষতি করছি। ত্রুটি-দুর্বলতাকে আমি না দেখতে বলছি না, বরং বলছি শুধু দেখো না, ফাইট কর। কিন্তু ফাইট কর ইন এ কারেক্ট ওয়ে। ডু নট ইনডালজ ইন রং থিংকিং (ভুল চিন্তাকে প্রশ্রয় দিও না)। সত্য চাপা পড়তে দিও না, মানুষের সামনে এই সত্যটা সঠিকভাবে উপস্থাপনা কর;একদিকে যত বড় বড় পার্টি, সব ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে;আর সেখানে এই একটি মাত্র পার্টি স্লোলি বাট স্টেডিলি (ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে) ইনস্পাইট অফ মেনি ডিফিকাল্টি জ গ্রোইং; ট্রাই টু লার্ন ফ্রম ইট (বহু অসুবিধা সত্ত্বেও বাড়ছে, এর থেকে শেখার চেষ্টা কর) — তবে তুমি বুঝতে পারবে এই আদর্শের সঠিকতা কতখানি দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ পয়সা দিয়ে তৈরি করা পার্টি নয়, এ কতকগুলো নেতার ইলিউশন (মিথ্যা মোহ) সৃষ্টি করা পার্টি নয়, এ পার্টি নেতা-কর্মীদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে। ফলে এর শক্তি যদি দেখতে না পাও এবং দেশের মানুষ যদি দেখতে না শেখে, আমি বলব ঠকবে তারাই। কারণ মূর্খামির সাজা আছে। যেমন শরৎবাবু একসময় চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যাওয়ার পর খুব দুঃখে বলেছিলেন, এ ঠিক হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে সব বিপ্লবীরা ছুটে গিয়েছিল, শরৎদা এ কী হল? দেশবন্ধু আর দার্জিলিং থেকে ফিরলেন না, মারা গেলেন। বললেন, ঠিক হয়েছে, কাঁদছিস কেন? তোরাই না তাকে অপমান করে ভাগিয়ে দিয়েছিলি, মূর্খের শাস্তি এইভাবেই হয়। যে দেশের মানুষ এমন মূর্খ, যে দেশের রাজনৈতিক কর্মীরা এমন মূর্খ যে, কোন মানুষকে কেমন সম্মান দিতে হয়, কোন বস্তুকে কি মূল্য দিতে হয় তা জানে না, সে দেশে মূর্খের শাস্তি এইভাবেই হয়। এখন কেন কাঁদছিস? কারণ শরৎচন্দ্রও একজন বড় মানুষ ছিলেন।

এও ঠিক তাই কথা। আমাদের সোল কনসার্ন (একমাত্র চিন্তা) হচ্ছে মানুষকে এই কথাটা বলতে হবে — যারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তাদের অবস্থা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তোমরা দেখো। এরা সব ঐ ভাঙা জমিদারি নাড়াচাড়া করে বলছে, দেখো দেখো আমরা কেমন বড়, আমরা যদি বেঠিক হই তবে বড় কেন? দেখাতে হবে, মুখে তোমরা যাই বলো না কেন, তোমরা ভাঙছো, তোমাদের ক্ষয় ধরেছে, তোমরা আরও বড় ছিলে, ক্ষুদ্র হচ্ছো;আর আমাদের এই দলটা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হচ্ছে। তোমরা শত সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও, তোমাদের পক্ষে শত অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ। অলটারনেটিভের (বিকল্প হওয়ার) সুযোগ তোমরা পেয়েছো, আন্তর্জাতিক সহায়তা তোমরা পেয়েছো, আন্তর্জাতিক টাকাপয়সা তোমরা পেয়েছো, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কৃতিত্বকে ইউজার্প করার (আত্মসাৎ করার) সুযোগ তোমরা পেয়েছো, তা সত্ত্বেও তোমাদের ক্ষয় ধরেছে, তোমরা ভাঙছো। অথচ

এই পার্টিটার দেশের অভ্যন্তরেও উত্তরাধিকারী সূত্রে কোনও কিছু পাওয়ার ছিল না। দেশের বাইরের সাহায্যও সে কোনওদিন পায়নি, অথচ ক্রমাগতই সে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং তোমাদের হেডেক (মাথাব্যথা) হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি একে এড়াবে কী দিয়ে? তোমরা তো কৃষ্ণের বিচারও বোঝ না। এটা বুঝলে, বিচারটা হতো — কী সেই প্রবল শক্তি যার জোরে পার্টিটা এই জায়গায় এসেছে।

পার্টিকে বৃহত্তর জনগণের পার্টিতে রূপান্তরিত করতে হবে

আগেই বলেছি, আমরা পার্টির একেবারে শুরুর দিন থেকেই পার্টির নেতা-কর্মীদের ক্যারেক্টারটার ওপর জোর দিয়েছি। কমিউনিস্ট ক্যারেক্টারের এথিক্যাল সাইডটাতে জোর দেওয়া হয়েছে। যেটা ছাড়া কমিউনিস্ট আদর্শের ভিত্তিটা গড়ে ওঠে না। এখন ফিল করছি জোর দেওয়াটা ঠিক হয়েছে, কিন্তু জোরটা একতরফা পড়ে গেছে। এখন আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে দলের অনেকেই আবার শুধু এটার ওপরেই আরও জোর দিতে চাইছে। কিন্তু আমি যেটা ভাবছি সেটা আপনাদের কাছে বলি— আমি বলছি, এ জোরটা কম করে দেওয়া চলবেই না। কিন্তু আজ একটা সময় এসেছে আগের থেকে উত্তরণের স্তরে আমরা আজ এসেছি। আগে ছিল পার্টিটা একটা প্রোপাগান্ডা নিউক্লিয়াস বা প্রোপাগান্ডা ইউনিট। তখন কাজ ছিল — কতগুলো কর্মী তাদের সর্বস্ব দিয়ে মুখের রক্ত তুলে একটা আইডিয়াকে থ্রো করা, প্রচার করা, শুধু একটা ভাবকে, চিন্তাকে এনে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু এখন সেই স্তরটা পার করে এসেছি। এখন আমরা একটা দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করার মুখে, যখন শুধু খণ্ড খণ্ড এখানে সেখানে স্থানীয় কিছু সংগঠন নয়; ব্যাপকভাবে গণসংগঠন, গণআন্দোলন এবং মাস মুভমেন্টের ইনিশিয়েটিভ, বৃহত্তর জনসাধারণের পার্টিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করার স্তরে এসেছি। এই সময়টায় শুধু ক্যারেক্টার নিয়ে ব্যস্ত থাকা বড় জিনিস নয়। এখানে আর একটি বড় জিনিস যা নাহলে ক্যারেক্টারকেও রক্ষা করা যাবে না। এখন আমরা মাসকে অর্গানাইজ করতে না পারলে আমরা ক্যারেক্টারের বলিষ্ঠতাকে রক্ষা করতেই পারব না। আমাদের এখন যেটা ইমপর্টেন্ট তা হল — পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ বাড়ানো, মাসের মধ্যে থাকা, যে কোনও মাস ইস্যুতে কেউ ডাকবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়া, ডাকল কিনা তার অপেক্ষায় না থেকে মাসের সাথে সকলের আগে নিজের ইনিশিয়েটিভে ফোরফ্রন্টে (সম্মুখে) থাকা। আমাদের কর্মীদের ক্যারেক্টার থাকা সত্ত্বেও এই এবিলিটিটুকু (ক্ষমতাটুকু) কমপেয়ারেটিভলি (তুলনামূলকভাবে) ভয়ানক ল্যাক করছে (অভাব আছে)। এটা হচ্ছে মূল উইকনেস (দুর্বলতা)। এই উইকনেস দূর করার মধ্যে রয়েছে আমাদের সমস্ত প্রবলেমগুলোর বারো আনা সলিউশন। যেমন বিভিন্ন ফিল্ড অফ অর্গানাইজেশনের (সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে) দায়দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা তৈরি করা, পলিটিক্যাল এবং অর্গানাইজেশনাল নেতৃত্ব দিতে পারার যোগ্যতা অর্জন করা — এমন ধরনের এগজিকিউটিভ কি শুধু ক্লাসে তৈরি হয়? একদিন এই এগজিকিউটিভরাও মুভমেন্ট থেকেই তৈরি হয়েছে, যখন মুভমেন্টটা ছিল প্রোপাগান্ডার স্তরে। তখন স্টাডি ক্লাস, অ্যাসোসিয়েশন থেকে এই এগজিকিউটিভস তৈরি হতে পেরেছে। কিন্তু এখন শুধু এদিয়ে ঐ ধরনের ক্ষমতা তৈরি হবে না। এখন শিখতে হবে, জনগণের মধ্যে থেকে কীভাবে কাজ করতে হয়, কীভাবে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও নিজের আইডেন্টিটি (নিজস্ব স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচিতি), নিজের ক্যারেক্টার এবং পলিটিক্যাল ইডিওলজি ঠিক রেখে কীভাবে কাজ করতে হয়। এই জিনিসটি শিখতে না পারলে বর্তমান সময়ে পার্টিকে মাসের স্ট্রাগল লিড করার উপযুক্ত পার্টিতে ট্রান্সফরম করার জন্য যে এগজিকিউটিভ এবং কর্মীদের দরকার সেই কর্মী তৈরি হতে পারবে না। আগের যে পদ্ধতি, পার্টি বড় হবার ফলে, নানা অ্যাকশনে আসার ফলে, নানা রকম মাস অ্যাক্টিভিটিতে আসার ফলে সেই ধরনের ট্রেইনড (দক্ষতাপূর্ণ), সেই ধরনের লিডারদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ কম বা সুযোগ সকলের নেই। এই হল এক নম্বর। কিছু কিছু ক্যাডার সবসময়েই বেরোবে, কিন্তু সেই সব ক্যাডাররা ক্যারেক্টারের দিক থেকে ফাইন হয়ে বেরোলেও পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভের ক্ষেত্রে দেখা যাবে তাদের সে যোগ্যতা গড়ে ওঠেনি। তারা পার্টির ইমিডিয়েট রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল (আশু প্রয়োজন পূরণ) করতে পারছে না। একটা বিচারে দেখা যাবে তারা ডেডিকেটেড, সেল্ফ লেস, তাদের কনসেপ্ট অফ লাইফ (জীবন সম্পর্কে ধারণা), তাদের ফাইটিং জিল (লড়াইয়ের উদ্দীপনা), তাদের স্যাক্রিফাইস করার ক্ষমতা, এই সমস্ত কিছুই তারা বিপ্লবের জন্য করতে পারে এরকম অবস্থা তাদের রয়েছে, অথচ পাবলিকের মধ্যে পড়ে থাকতে পারে না বা থাকলেও শুধু তর্ক করে, বা সবসময় সারমন (উপদেশ) দেয়, শুধু বোঝায়, বেশি বোঝানোর ফলে সাধারণ মানুষ তিক্ত বিরক্ত হয়ে তাদের দেখলেই দৌড় দেয়। তাকে দেখলেই বলে — এই প্রিস্ট (উপদেশদাতা) এলো, এক্ষুনি জ্ঞান দেবে। আজকালকার ছেলেরা এতসব কথা শুনতে চায় না। ফলে তারা কী চায়, তাদের সঙ্গে কীভাবে থাকতে হবে, কখন কীভাবে বোঝাতে হবে এগুলো তো শিখতে হবে। বোঝাতে তাদের হবেই, কিন্তু ধরেছি যখন তখন ব্যস্ত হয়ে সব বুঝিয়েই ছাড়বো — সমাজবাদ কি, জীবনের মূল্য কি, চরিত্র কাকে বলে, সব বোঝাবো আর সে মাথা চুলকাতে থাকবে, বেশি কথাও বলবে না। পরে কি হবে, আমাকে গলির মোড়ে দেখলেই দৌড় দেবে, এই এল আর রক্ষে নেই। আর আমি দুদিন এইরকম বোঝাবার পর যখন দেখব কেউই আর আমার সঙ্গে আসছে না, তখন আমি কি ভাবব? ধুর আর করে কি হবে, এই তো এত বোঝাচ্ছি, মানুষই নেই, কেউ বুঝতেই চায় না। আমি বলি, এত বোঝাবার দরকার কি? আসলে তাদের সঙ্গে থাকো, লিভ উইথ দেম, রিমেইন উইথ দেম, এবং নিজে ঠিক থাকো। তারা আস্তে আস্তে বুঝবে, সইয়ে সইয়ে বোঝাও, ধৈর্য ধরো। পুরনো একটা কথা আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। এই কথাটা মনে রাখলে কাজ ভাল হবে।

এখানে একটা বিষয় না বুঝলে আবার সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। বোঝাটাও সঠিক হবে না। একজন বিপ্লবী কর্মীর কথাগুলো বিপ্লবীর মত হবে, শ্লোগানগুলো বিপ্লবীর মত হবে আর আচরণগুলো অন্যরকম হবে, তা নয়। যা অনুচিত একটা কারেন্ট, তার দিকে একটা প্রবাহ চলছে, সেখানে বিপ্লবী একা হলেও প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তার মানসিক প্রবণতাই হচ্ছে — টু গো এগেইনস্ট দ্য টাইড (স্রোতের বিরুদ্ধে যাও)। মানুষের দুরকম মানসিকতা আছে। যারা মিডিওকার (মাঝারি মাপের), সাধারণ মানুষ, তাদের ঢঙই হচ্ছে যেদিকে দলবল বেশি, যেদিকে হাওয়া সেদিকে চলা। যেমন করে ছেলেমেয়েরা সব ফ্যাশানের ভিক্টিম হয়। মেয়ে বলল, আজকাল এরকম রেওয়াজ নেই — অমনি মা-ও বলবে, হ্যাঁ এসব পুরনো ফ্যাশান, এরকম জামা নয়, আজকাল এরকম ফ্যাশান নেই। মা-ই মেয়েকে বলছে এরকম নয়। মেয়ে আবার মাকে বোঝায়, বাবা ছেলেকে বোঝায়, সকলেই একই সুরে বলছে — মানে হচ্ছে একটা জেনারেল কারেন্ট (স্রোত) চলছে। সে যত রবীন্দ্রজয়ন্তী হোক, আর নানা জয়ন্তী হোক বা ফাংশন করা হোক, সকলেই ঐ কারেন্টে ভাসছে। ইস্কুল-কলেজে পড়া সব শিক্ষিত ছেলেমেয়ে, তারা একবারও ভাবে না যে ফ্যাশান এবং স্টাইল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছেন। শরৎবাবুও তো এ নিয়ে কী কথা লিখেছেন। তাঁর প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই এই জিনিসটা ধরাবার চেষ্টা করেছেন যে, রুচিটা, সংস্কৃতিটা বাইরের জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথ একেবার পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, ফ্যাশান আর স্টাইল এক জিনিস নয়। যেটা মানুষ নকল করে, যার মধ্যে স্বকীয় সৃষ্টি কিছু নেই, সেটা হল ফ্যাশান। ফ্যাশান হাওয়ায় একটা ঢেউয়ের মত, ঝড়ো হাওয়ার মতন আসে। আর সেই হাওয়ায় ছেলেমেয়েরা ফ্যাশানের ভিক্টিম হয়। এরকম চুল রাখছে, এই ধরনের পোষাক পরছে সকলে, তাই আমাকেও তা করতে হবে। এটাই হল ফ্যাশান, হাওয়ায় চলা। সে একবারও ভেবে দেখে না যে তাকে হনুমানের মতো দেখাচ্ছে। মেয়েরাও আবার এই হনুমানের দলকে পছন্দ করছে। আমি বুঝতে পারি না যে, সেই মেয়েগুলিও আবার কীরকম মেয়ে যে, তাদের হনুমান ভাল লাগে, তাদের ভাল্লুক ভাল লাগে, মানুষ ভাল লাগে

না। তারা যে কী সংস্কৃতির চর্চা করে, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট (আমি বুঝতে পারি না)। একে বলে ফ্যাশানের ভিক্টিম হওয়া, একে স্টাইল বলে না। স্টাইল হচ্ছে একটা স্বকীয় জিনিস। স্টাইল মানে নকল করা নয়। তার চলবার, বলবার, জীবন-যাত্রার ভঙ্গিটার মধ্যে একটা নিজস্বতা ফুটে ওঠে — সেটাই তার স্টাইল। আর ফ্যাশানটা হচ্ছে একটা ধার করা জিনিস, বাইরের জিনিস। যাদের চরিত্রের কোনও আধার নেই, গভীরতা নেই, তারাই ফ্যাশান-এর ভিক্টিম হয়। ধরুন একটা হাওয়া এসেছে, বুঝে আসুক বা না বুঝে আসুক। কিন্তু যেটা এসেছে ছাট-কাটের দিক থেকে খুব একটা খারাপ নয়। তর্কের খাতিরেই বলছি, আমি দেখছি যে এটা খুব একটা খারাপ নয়, আমার সংস্কৃতিতেও আটকায় না। কিন্তু যদি দেখি যে এটা হাওয়ার মতন এসেছে, ফ্যাশানের মতন সকলেই নিচ্ছে; তা হলে সত্যিকারের ভাল মানুষের মেন্টাল ট্রেন্ড (মানসিকতা) হওয়া দরকার — টু গো এগেইনস্ট ইট। এই জন্য নয় যে ঠিক এইভাবে জামা-কাপড় পরলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এই কারণে যে, এটা সকলে নকল করছে, তাই আই প্রোটেস্ট ইট (আমি এর প্রতিবাদ করছি)। যখন নকল বন্ধ হবে, হাওয়ায় চলাটা থাকবে না, তখন আমিই হয় তো বলব যে, এরকম ছাঁট-কাট পরলে কিছু ক্ষতি হবে না। এই নকল নবিশিতে যেটা ক্ষতি হয় তাতে এই নকলের হাওয়া ঘরে ঘরে ঢুকে গেল। এতে কি মানুষগুলো খাঁটি থাকবে? এত নকল করতে থাকলে মানুষের থাকে কী? সেই জন্য চীনের পার্টির টেন্থ কংগ্রেসে বলছে, মানুষের মধ্যে দু'রকমের জাত আছে। একদল বলে, একটা হাওয়া চলছে আমি তার পিছনে চলব না। আমি বুঝে চলব, বিচার করে চলব। আমার জেনারেল মেন্টাল ফ্যাকাল্টি টা, বেন্ট অফ মাইন্ডটা (মানসিকতা, মনোবৃত্তি) অর্থাৎ মনের ঢংটা, ক্রিয়া করবার ঢংটাই এরকম হবে যে কোনও একটা কারেন্ট যদি আসে, তা হলে আমি তার বিরুদ্ধ দিকে চলতে চেষ্টা করব। আবার এর মানে এই নয় যে, একটা কারেক্ট, সুন্দর টাইড (স্রোত) এসেছে, সেই টাইডটার কি আমি বিরুদ্ধতা করব? না, এটা গোলমাল হলে কোনও ভাল জিনিস আমরা গ্রহণ করতে পারব না। টেন্থ কংগ্রেসে এটা একটা জেনারেল ফ্যাকাল্টি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে। যদিও পুটিংটার (উপস্থাপনার) মধ্যে এই জিনিসটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি বলে এই রকম মনে হতে পারে যে — ইরেসপেকটিভ অফ কন্ডিশন (অবস্থা নির্বিশেষে) বিষয়টা বলা হয়েছে। টাইডটা যদি ভাল হয়, কাজের হয়, বিপ্লবের পক্ষে হয়, তবে কি আমি তার বিরুদ্ধতা করব? নিশ্চয়ই নয়, সে কথা চীনের পার্টি বলতেও চায়নি। টেনথ্ কংগ্রেসে বলেছে টু গো এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট ইজ এ মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট প্রিন্সিপল। এটা শুধু মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট প্রিন্সিপল কেন, সর্ব যুগে সমস্ত বড় মানুষরা, যারা যথার্থ মানুষ, তাদের সবসময় মেন্টাল ট্রেন্ডটা হচ্ছে, বেন্ট অফ মাইন্ডটা হচ্ছে টু গো এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট (স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া)। মানুষের মধ্যে দুটো জাত থাকে, একদল কপি করে, আরেক দল সৃষ্টি করে। একদল সমাজকে কিছু দেয়, আর একদল শুধু সমাজ থেকে নেয়। এই দুটো জাতই সমাজের মধ্যে থাকে। যে দলটা সব সময় সমাজকে কিছু দেয়, তাদের মেন্টাল ট্রেন্ডটা হচ্ছে, বেন্ট অফ মাইন্ডটা হচ্ছে, টু গো এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট। নট টু বি ভিক্টিম অফ দ্য কারেন্ট (স্রোতের শিকার হয়ে যেও না!)। এটা টেনথ কংগ্রেস সুন্দর ভাবে বলেছে। তার থেকে এ রকম ধরবেন না যে, একটা টাইড অফ রেভোলিউশন এল, একটা টাইড অফ স্ট্রাগল এল; টু গো এগেইনস্ট দ্য টাইড ইজ এ মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট প্রিন্সিপল, ফলে আমি তার পক্ষে যাব না — না, এটা ঠিক বোঝা হল না। একটা রেভোলিউশনারি টাইডের মধ্যেও কাতারে কাতারে লোক আসে, লড়াইয়ের মধ্যে নেমে যায়, কত মানুষ জীবন দেয়, কত লোক তাদের মধ্যে থেকে লিডার হয়ে যায়। এই সময়টায় যে দল নেতৃত্ব দেয়, সে যদি না অন্ধতাকে স্তরে স্তরে ফাইট করে, মাসকে এডুকেট করতে না পারে, তা হলে এই বিপ্লবের জোয়ারের মধ্যে প্রবল বন্যায় অন্ধতা থাকার জন্য, বহু টেনডেন্সি এবং ঝোঁক ঘাপটি মেরে থাকার জন্য, বিপ্লব জয়যুক্ত হলেও পরবর্তীকালে নানা অসুবিধার সামনে পড়ে যাবে। যদিও তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সে-ই যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব যে নেতৃত্ব আগে থেকে অ্যালার্ট হয়ে এই ঝোঁকগুলো অ্যাপ্রিহেন্ড করতে (ধরতে) পারে।

একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেকগুলি বিপ্লব করতে হয়

একটা কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেকগুলো বিপ্লব করতে হয়। কোনও একটা বিশেষ বিপ্লবের কার্যক্রম সফল হওয়ার পর আবার আরেকটি বিপ্লবের কার্যক্রম তাকে গ্রহণ করতে হয়। সেটি সফল হওয়ার পর আবার আরেকটি। এইভাবে যতক্ষণ না সে শ্রেণিহীন সমাজে গিয়ে পৌঁছাবে অর্থাৎ ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি (সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ) যতক্ষণ না কমিউনিস্ট রেভলিউশনারি হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পার্টি ডিজঅ্যাপিয়ার (অবলুপ্ত হবে) করবে না। সেই স্তরে গিয়ে রাষ্ট্রও থাকছে না, পার্টিও থাকছে না। ফলে সমস্ত ক্লাস কনসাস মার্কসিস্টরা জানে যে আমরা যে পার্টি করছি, যে পার্টিকে শক্তিশালী করবার জন্য চেষ্টা করছি, যে পার্টির ডিসিপ্লিন মেনে চলবার জন্য সকলকে বলছি — তার অর্থই হচ্ছে মানব ইতিহাস এবং সমাজ থেকে পার্টিকে উইদার অ্যাওয়ে করার (অবলুপ্ত করার) রাস্তা প্রশস্ত করছি। এই হল নিগেশন অফ নিগেশন (বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ) তত্ত্বের আসল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যে কোনও জিনিস জোর করে অবলুপ্ত করা যায় না, কোনও অবজেক্টিভ থিংককে (বস্তুকে) ইউ ক্যানট ডেস্ট্রয় (ধ্বংস করতে পারে না), ইউ ক্যানট ক্রিয়েট (সৃষ্টি)। সেই বিপ্লবটা চলতে চলতে তার ডেভেলাপমেন্টে যখন তার নোডাল (সর্বোচ্চ) পয়েন্টে গিয়ে রিচ করে (পৌঁছায়), তখন ফ্রম দ্য আরিনা (বিশেষ ক্ষেত্র থেকে) সে ডিজঅ্যাপিয়ার করে। এইভাবে একটি বিশেষ নূতন নিয়মকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিদ্যমান বিশেষ নিয়মটা চলে যায়। এইভাবে সমাজের বিকাশ, শ্রেণি সংগ্রামের বিকাশের পথেই শ্রেণি সংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটে।

কিন্তু শ্রেণি সংগ্রামকে অস্বীকার করে, নিন্দা করে, শ্রেণি সংগ্রাম না বুঝে গালমন্দ করে, কোনওদিনই শ্রেণি সংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটানো যাবে না। শ্রেণি সংগ্রামের বিকাশের ধারায় প্রভাব বিস্তার করতে পারলে, তার অবজেক্টিভ ওয়ে অফ ডেভেলপমেন্টকে (অগ্রগতির বাস্তব পথকে) সঠিকভাবে এক্সিলারেট (দ্রুতগামী) করতে পারলে, তবেই শ্রেণি সংগ্রাম বিকাশ প্রাপ্ত হতে হতে সমাজ থেকে অবলুপ্ত হবে। রাষ্ট্র যখন সেন্ট্রালিজমের পথে হাইয়েস্ট স্টেজে (উচ্চতম স্তরে) রিচ করবে, তখনই রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে। রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রেণির এবং শ্রেণি সংগ্রামের ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকে। আমরা জানি যে রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণি শাসনের হাতিয়ার। শ্রেণির হাতে শাসন ও শোষণের অস্ত্র হিসাবেই রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। রাষ্ট্র আকাশ থেকেও পড়েনি, ঈশ্বরও সৃষ্টি করে দেয়নি। কাজেই ইতিহাসের সেই সব তত্ত্ববিদ ও রাজনীতিবিদেরাই অ্যাবসোলিউট থিওরি অফ স্টেটের (অপরিবর্তনীয় রাষ্ট্রের তত্ত্বের) কথা বলতে পারে, যারা রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসই জানে না। কোন সময়ে, কখন কি অবস্থায় কেন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, এবং কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সশস্ত্র হয়ে উঠেছিল এই ইতিহাস যাদের জানা আছে, তারাই জানে যে শ্রেণিসংগ্রামের অস্তিত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ওতপ্রোত এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র থাকবে আর শ্রেণি সংগ্রাম চলে যাবে — তা হয় না। একটা চলে গেলে তবে আরেকটা যাবে। অর্থাৎ ঠিক সেই সময়েই রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব থাকবে না, যখন মানুষে মানুষে উৎপাদন করা এবং উৎপাদনের বণ্টন নিয়ে অ্যান্টাগনিস্টিক কন্ট্রাডিকশন (বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব) নন-অ্যান্টাগনিস্টিক কন্ট্রাডিকশনে (মিলনাত্মক দ্বন্দ্বে) রূপান্তরিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিপ্লবী পার্টি সমাজ বিপ্লবকে পরিচালনা করে সেই অবস্থায় যেতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পার্টি অ্যাজ কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, সমাজ থেকে ডিজঅ্যাপিয়ার করবে না। পার্টি রাজনীতি কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফল নয়, বাস্তব শ্রেণি সংগ্রামের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরের প্রতিফলন। সেই জন্য নিগেশন অফ নিগেশন হচ্ছে বিকাশের পথে অবলুপ্তি। অবলুপ্তি ছাড়া সৃষ্টি হয় না। ক্রমাগত পার্টিকে গড়ছি মানে হল, একদিকে পার্টি রাজনীতির অবলুপ্তির পথও প্রশস্ত করছি, ক্রমাগত পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আয়োজন করছি, একথার অর্থ হল — ক্রমাগত পার্টি রাজনীতিকে খতম করার প্রসেসকে অ্যাক্সিলারেট (ত্বরান্বিত)

করছি। শ্রেণিসংগ্রামকে শক্তিশালী করছি, একথার অর্থ হল শ্রেণি সংগ্রামকে সমাজ থেকে অবলুপ্ত করার প্রক্রিয়ায় আমি অংশ গ্রহণ করছি। এই হল নিগেশন অফ নিগেশন — ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপলস অফ ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নীতিগুলির একটি), এই তার যথার্থ অর্থ এবং তাৎপর্য।

যেটা বলতে শুরু করে মাঝে তত্ত্ব নিয়ে কয়েকটা কথা বলেযেতে হল, সেটা না বুঝলে ভাসাভাসা বোঝা হবে। পার্টি গড়ার শুরুর দিকে আমাদের কাছে মূল বিষয় ছিল ভারতবর্ষে একটা বিপ্লবী দল খাড়া করতে হবে, আর তার জন্য প্রথম শর্ত ছিল একজন-দুজন করে কর্মী সংগ্রহ করা। আর এখন এস ইউ সি আই একটা ফুল ফ্লেজেড (সমস্ত গুণাবলীসম্পন্ন) পার্টি, খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করা পার্টি, যার কয়েক হাজার কর্মী, বহু সমর্থক এবং অনেক কর্মক্ষেত্র রয়েছে। শুধু একটা স্টেটে নয়, আট-দশটা স্টেটে। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আজ আর এস ইউ সি আই অপরিচিত পার্টি নয়। যারা মতবাদ, দর্শন এবং রাজনীতি সংক্রান্ত খবরাখবর রাখে এরকম লোকের বিভ্রান্তির ব্যাপার এখন নেই। অথচ একটা সময় ছিল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার — কমিউনিস্ট না সোস্যালিস্ট সেইটেই বুঝতে অসুবিধা হত। আর আজ শত্রুদেরও বুঝতে ভুল হয় না যে এটা কি পার্টি। ফ্রম কংগ্রেস টু সোস্যালিস্ট অ্যান্ড আর এস এস, এভরিবডি (প্রত্যেকে) জানে যে, এটা হচ্ছে একটা মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি। শুধু তাই নয়, এটা একটা কট্টর মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি। এটা তাদের ভাষা, আমি কট্টরও নই, মাখনও নই — আমরা যা তাই। ওরা মনে করে আমরা একটা কট্টর মার্কসবাদী পার্টি, মানে একস্ট্রিমিস্ট (চরমপন্থী)। এই যে পরিস্থিতিটা হয়েছে, এখন পার্টিটা বিভিন্ন মাস লেভেলে একটিভ আছে। যেমন ধরুন পশ্চিমবাংলা, এখানে জেলা কমিটি, থানা-অঞ্চল-গ্রামসভা কমিটি পর্যন্ত আছে। যে কাজটা এখন এসে গেল, সেটা যদি আমরা এখন করতে না পারি তা হলে মাস স্ট্রাগলে লিডারশিপ আমরা অ্যাসার্ট (প্রতিষ্ঠা) করতে পারব না। কাজেই যে কাজটা আমরা গোড়ার দিকে শুরু করেছিলাম সেটা এখন বাদ চলে গেল, তা কিন্তু নয়; সেটার সাথে অ্যাডিশনাল প্রেজেন্ট টাস্কটা (এই সময়ের অতিরিক্ত কর্তব্য) এসে গেল। আর এই দুটোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বর্তমান নেসেসিটিটা (প্রয়োজন) আমাদের কাছে ইমপর্টেন্ট, যেটা আমরা এখন অ্যাভয়েড করতে (এড়িয়ে যেতে) পারি না। এত মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও পাবলিকের মধ্যে আমাদের ক্যাডাররা যদি ঠিক ঠিক মতো বক্তব্য উপস্থাপনা করতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে পাবলিক সেটা গ্রহণ করছে। আমাদের যেটা দরকার — কোন পার্টি কী কনফিউশন সৃষ্টি করছে সেইটি ধরতে পারা, আর সেইটি শুনে কোন জায়গাটা কীভাবে এক্সপ্লেন করলে পাবলিক সহজে বুঝতে পারবে সেভাবে বক্তব্য রাখতে পারা, আর অপরের বক্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা এবং আমাদের বক্তব্য সম্বন্ধেও খুব ভাল ওয়াকিবহাল থাকা। এই বিষয়গুলো কমরেডদের ভাল করে রপ্ত করতে হবে। আমাদের বক্তব্যটা আমরা ভাসাভাসা বুঝি। ফিল করি যে এটা ঠিক, কিন্তু কারেক্টলি গুছিয়ে বলতে পারি না। যখনই বলতে যায় — বেশিরভাগ কমরেড গোলমাল করে ফেলে। যে কোনও লোক একটু চেষ্টা করলে আমাকে এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে নিয়ে ফেলে দিতে পারে। আমি একটা জিনিস বোঝাতে শুরু করেছিলাম, আর মতলববাজ লোক কতকগুলো উটকো পয়েন্ট তুলে দিয়ে আমাকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি জানি না হাউ টু কনডাক্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল (পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ) দ্য ডিসকাসন। অন্য মানুষ আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলেও তাকে কীভাবে চারদিক থেকে আটঘাট বেঁধে, আমি যে জায়গায় তাকে আনতে চাই সেই জায়গাটায় এনে ফেলব; এই আর্গুমেন্টের দক্ষতা আমাদের অর্জন করতে হবে। আর এর জন্য কী দরকার? দরকার, নিজেদের দলের বক্তব্য এমনভাবে জানতে হবে যাতে আমি আমার ভাষায় রিপ্রোডিউস (উপস্থাপনা) করতে পারি। যেখানে বক্তব্য খুব ভালভাবে বলা আছে, এক্সপ্লেইন করা আছে, আর্গুমেন্ট করা আছে, সেগুলোকে রিপ্রোডিউস করতে পারি, এমনভাবে পড়তে হবে যাতে রিয়েলাইজ (উপলব্ধি) করতে পারি। বারবার সেইগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা করতে হবে যাতে সেইগুলো ভাল করে আয়ত্ত করতে পারি। আমরা জনগণের মধ্যে পার্টিকে নিয়ে যাচ্ছি না, কাজ করছি না, তা তো নয়। গো টু দ্য মাসেস এই স্লোগানটা দিলেই আর মাস-এর মধ্যে গেলেই আমাদের সমস্ত কাজ হয়ে গেল, আমরা সব শিখে ফেললাম বা আমাদের টাস্ক যা এখন লিডারশিপ অ্যাসার্ট করছে — তা কিন্তু চাইলেই আমরা অ্যাসার্ট করতে পারব না। আমাদের বক্তব্য কারেক্ট এই কথা বললেই কি আমরা লিডারশিপ অ্যাসার্ট করতে পারব? না, কেউ শুনবে না, হাজার ভাল বক্তৃতা করলেও কেউ শুনবে না। সেই স্ট্যালিনের কথা — তোমার শক্তি যদি না থাকে তোমার কথা কেউ শুনবে না। সেই জন্য শক্তি দরকার। শক্তি যদি না থাকে, মাসেস-এর উপর এফেক্টিভ কন্ট্রোল যদি না থাকে, শক্তিশালী মাস অর্গানাইজেশনগুলো যদি আমরা কন্ট্রোল না করি, বিভিন্ন জায়গায় গ্রাম লেভেল পর্যন্ত, ফ্যাক্ট্রি লেভেল পর্যন্ত যদি এফেক্টিভ পার্টি কমিটি ফাংশন না করে, ইউনিয়ন কন্ট্রোলে থাক বা না থাক, এফেক্টিভ পার্টি কমিটি না থাকে, আমাদের কথা শোনানো যাবে না। কমিটি মানে এরকম নয় যে, আমার দুটো লোক আছে, কোনও কাজ করে না, কিছুই করে না, কী করবে তাই জানে না, কি তাদের দৈনন্দিন কাজ সেগুলো তারা সৃষ্টি করতেই জানে না, তারা পার্টির কাগজ নিজেরা নেয় না, তা নিয়ে আলোচনা করে না, তারা নিজেরা কিছু প্রোপাগান্ডা করতে পারে না। ইজ ইট অ্যান অ্যাক্টিভ পার্টিবডি? যারা নিজেরা প্ল্যান করে পার্টির প্রচার করে, ক্লাস করে, আলোচনা করে, কাগজ-পত্র নিজেরা পড়ে, অন্যকে পড়ায়, ইউনিয়ানের এবং স্ট্রাগল-এর গতি প্রকৃতি বুঝে অ্যাক্টিভলি সকলের আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে, রেগুলারলি স্টাডি সার্কল অর্গানাইজ করার বন্দোবস্ত করে, যখন যে নেতা অ্যাভেইলেবল হয় (পাওয়া যায়) তাকে নিয়ে যায়, নেতাকে না নিতে পারলেও নিজেরা বসে আলোচনা করে, এবং এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি পার্টির লিটারেচার (বই-পত্র-পত্রিকা), বক্তব্য, বিভিন্ন পার্টির মতামত, সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা, আলাপ-আলোচনা করে। ফ্যাকট্রিগুলোতে এই রকম পার্টি কমিটিগুলোকে গড়ে তুলতে হবে। তা হলে আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে ফ্যাকট্রি লেভেল পার্টি কমিটিগুলোকে গড়ে তোলা, এলাকা লেভেলে পার্টি কমিটিগুলো গড়ে তোলা, পিজ্যান্ট (কৃষক) ফ্রন্টে গ্রাম লেভেল পর্যন্ত কমিটি গড়ে তোলা। শুধু থানা কমিটি নয় — থানা কমিটি, অঞ্চল কমিটি, গ্রামসভা কমিটি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করবার যোগ্য লোক বার করতে হবে। এখন আমরা কিছু কিছু সংগঠন কন্ট্রোল করছি, মাসেসও কিছু আমাদের পিছনে আছে, কিন্তু এখন প্রধানত এটাকে প্রোপাগান্ডা নিউক্লিয়াস ক্যারেক্টার থেকে মাস ব্যাটল পরিচালনার অর্গানাইজেশনে রূপান্তরিত করতে হবে।

আজ অসংখ্য যোগ্য রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা দরকার

যদি তা করতে হয় তবে আমাদের ইনিউমারেবল নাম্বার অফ (অসংখ্য) এক্সিকিউটিভস্ এবং যোগ্য রাজনৈতিক কর্মীর দরকার। সেটা আগের মেথডে এই ম্যাসিভ (বিপুল) নাম্বার অফ এফেক্টিভ ওয়ার্কার্স, অর্গানাইজার্স এবং এক্সিকিউটিভ হেডস গড়ে তোলা যাবে না। অল্প কিছু লোককে হয়তো গড়ে তোলা যাবে। এই হচ্ছে প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় বিষয় হল, শুধু আগেকার সেই প্রক্রিয়ায় গড়ে তোলা হলেও যদি তারা এই ধরনের মাস অ্যাকশনে এই অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় এফেক্টিভ ইনিসিয়েটিভ নিয়ে নিজেদের মেথড অফ ওয়ার্কিং স্টাইলস, হ্যাবিটস, রিমোল্ডিং অ্যান্ড রিস্টাইলিং না করে (কর্মপদ্ধতি, অভ্যাস, নতুন করে গড়ে তোলা, নতুনত্ব নিয়ে যদি এগুলি না করে) এবং আজকের নেসেসিটি অনুযায়ী কাজ করতে না পারে তবে গড়ে ওঠা ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যেও ঘুণ ধরতে পারে এবং ঘুণ ধরবে। ফলে কী দরকার আমাদের? আমাদের দরকার, এই হল ভর্তি কমরেডদের মধ্যে হাত গুণতি পাওয়া যাবে ইনক্লুডিং লিডারস যারা বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী অ্যাক্ট করার যোগ্য, বাকিদের সবাইকে ওয়ান স্ট্রোকে (এক ধাক্কায়) পরিবর্তিত হতে হবে।

কোনও লিডারকেও খাতির করা চলে না, কোনও লিডিং কমরেডকে খাতির করা চলে না।

আর একটা বিষয় আমি আপনাদের কাছে বলব যে, আপনারা রেভোলিউশনের কাজের জন্য, একটা মহৎ কাজের জন্য আপনাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। যত অভাবই থাকুক আপনার, প্রতিদিনের যা এক্সপেনডিচার (খরচ) আপনি করেন, তা থেকে দু-চার আনা করে সংগ্রহ করতে যদি পারেন, যদি না আপনার আর্জ (প্রবল আকাঙ্ক্ষা), ডিসিপ্লিন অ্যান্ড মেথড অফ ক্যারেক্টার ল্যাক না করে, তা আপনারা এরকম দু হাজার, আড়াই হাজার কমরেড যদি বছরে পঞ্চাশ/একশ টাকা করে দেন, তা হালে পার্টি ফান্ডে কয়েক লক্ষ টাকা হয় বিনা আয়াসে। আপনাদের ইচ্ছা হয়তো আছে, এমন নয় যে আপনারা প্রয়োজন মনে করেন না, কিন্তু হ্যাবিট নন-সিরিয়াস, এ্যাটিটিউড এবং লাইফে মেথডের (অভ্যাস, ঢিলেঢালা মানসিকতা এবং পদ্ধতি অনুসরণের চেতনার) এমন অভাব যে, কোন কাজটা আগে করা দরকার, কোন কাজটা পরে করা দরকার, কোনটা প্রয়োজন সেটা রিয়ালাইজ করতে সক্ষম নন। এইভাবে পার্টির ফান্ডটা তুলতে পারলে পার্টির একটা বিরাট ফিনান্সিয়াল (আর্থিক) প্রবলেম সলভ হয়। আর তা করতে পারলে বহু কর্মীকে রিলিজ করাও সম্ভব হয়।

কিন্তু যেটার উপর জোর দিতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে স্টাইল অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড হ্যাবিট। বহু গুড অ্যান্ড ডিসেন্ট (ভাল এবং সুন্দর) কমরেড, যারা কালচারালি রেভোলিউশনারি ক্যারেক্টারের দিক থেকে অনেকখানি অ্যাডভান্স করেছে, তাদেরও এই নতুন প্রয়োজন অনুযায়ী খানিকটা রিমোল্ড (পুনর্নির্মাণ) করা দরকার। আর নতুনদের চরিত্র অর্জন করবার জন্য যেটা আমাদের মূল ভিত্তি সেটা কোনও অংশে ঢিলে দেওয়া চলবে না। কারণ, এটাই হল আমাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণের ভিত্তি, এখানেই আমরা সুপ্রিম টু অল (সর্বোত্তম)।

আরেকটি কথা হল পার্টির বই-পত্র পড়ার ক্ষেত্র, আমাদের ক্যাডাররা খুব দাগিয়ে দাগিয়ে সিরিয়াসলি (গুরুত্বসহকারে) পড়ে না, ক্যাজুয়্যালি (হাল্কাভাবে) পড়ে। মেনি অফ দ্য (অনেক) কমরেডস একবার পড়ে রেখে দিল। তারা বার বার পড়ে নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করে না। এই ডিসকাস করে না বলেই তাদের ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন গড়ে ওঠে না। যেটা পড়ছি, তার ভেতরে কত জিনিস থাকে। আর যদি নাও থাকে, তাকে কতভাবে আরও ইমপ্রুভ করা যায়, এ দুটোই তো প্রয়োজন। একটা হচ্ছে কত জিনিস এর ভেতরে রয়েছে যা আমি ধরতে পারিনি, বারবার চর্চা না করলে তার মধ্যে হয়তো অনেক অমূল্য জিনিস রয়েছে সেগুলো আমার চোখেই পড়বে না। আবার বারবার চর্চা না করলে তার মধ্যে যদি কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করার দরকার মনে হয়, তাও তো হবে না। ফলে পড়াটাও কি জন্য পড়ছি, আমি কি চাই, তা গভীরে বোঝা না হলে পড়াটা শুধু পড়ার জন্য থেকে যাবে, কোনও কাজে লাগবে না।

শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নির্বাচন সম্পর্কেও দুটো বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে

পার্লামেন্টে যাওয়া দরকার আছে কি নেই এটার আলোচনা কিছুটা হলেও দরকার মনে হয়। মাঝে মাঝে এই বিষয়টা কমরেডদের হন্ট (ভাবায়) করে। বর্তমানে পার্লামেন্টারি ব্যাটল-এর কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এটা একটা প্রশ্ন। দরকারটা কি দিয়ে বিচার হবে? যদি, লিগাল-ইললিগাল (আইনি-বেআইনি) মুভমেন্টকে কম্বাইন করার (মেলানোর) দিক থেকে, ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে এগজস্ট (নিঃশেষ) করার দিক থেকে, মাসকে মবিলাইজ (শামিল) করার দিক থেকে তার ইউটিলিটি (প্রয়োজনীয়তা) থাকে তবে কি স্টাইলে তাকে ইউটিলাইজ করতে হবে (কাজে লাগাতে হবে) সেইটাই বিচার করার বিষয়। যেতে সেখানে হবেই, কিন্তু সেই স্টাইলে যদি তাকে ইউটিলাইজ করতে না পারো, তাহলে তুমি নিজেই ক্যারেড হবে (ভুলের খপ্পরে পা দেবে), তুমি বুর্জোয়াদের দালালে পর্যবসিত হবে। এক্সট্রা পার্লামেন্টারি (সংসদের বাইরের) ব্যাটল, ইললিগ্যাল ব্যাটল এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে গড়ে তোলার একটা অগজিলিয়ারি (সাহায্যকারী) স্ট্রাগল হিসাবে যদি আমি পার্লামেন্টারি ফেজ অফ স্ট্রাগলটা গ্রহণ করে থাকি, যখন আমি অপোজিশনে আছি তখন করবো, আর যখন আমি মেজরিটি হয়ে গেলাম তখন আমার কাজ কী হবে? তখনও তো বিপ্লবের প্রস্তুতি হয়নি। একটা হল যতক্ষণ পর্যন্ত মাসেসের মধ্যে ইলিউশন (মোহ) রয়ে গেছে, আমাকে যেতে হবে। তখন পর্যন্ত আমারও একটা দায়িত্ব বর্তায় মানুষগুলোকে মোহমুক্ত করার। আর যদি ইলিউশন না থাকে, বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্ভব, তাহলে আমি ইলেকশনে জয়েন করবো কেন? তাহলে তো পার্লামেন্টারি ইলেকশনে আমার কোনওমতেই যাওয়া উচিত নয়। এক্সট্রা পার্লামেন্টারি আন্দোলন তো বিপ্লবের সময় এসে গেলে করার কথা ওঠে না, মাসেসের পার্লামেন্টারি ইলিউশন না থাকলে করার কথা ওঠে না। আর যখন বিপ্লবী সংগ্রামের প্রস্তুতি হয়নি, ডেমোক্রেটিক সেটআপে (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়) এই ইলিউশন আছে, তখন বিপ্লবী পার্টিকে পার্লামেন্টে যেতে হয়। এইটাই লেনিন বলেছেন। যাওয়ার পর বিপ্লবী দল যদি মেজরিটি হওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছয়, তখন কি করা হবে এই প্রশ্নে লেনিনের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। কারণ লেনিনের সময়ে দুনিয়ার কোথাও এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। ভারতবর্ষে সেটা প্রথম দেখা গেল, তারপর চিলিতে দেখা গেল। কিন্তু আউটলুক ঠিক না থাকায়, ভুল হওয়ার জন্য ভারতবর্ষ এবং চিলি দুজায়গাতেই সিউডো কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টারি স্ট্রাগলে কীভাবে পার্টিসিপেট (অংশগ্রহণ) করতে হয় সেটাকে বিসর্জন দিয়ে সুবিধাবাদীতে পর্যবসিত হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে বসলো। তার মানে কি এই যে যারাই যাবে তারাই সুবিধাবাদী হবে? ঢালাও বিচার করলে কোনও কিছুরই সঠিক বিচার হয় না। অ্যাকচুয়ালি অ্যাটেম্পটিং টু ইউটিলাইজ দ্য পার্লামেন্টারি স্ট্রাগল ইন ফারদারেন্স অফ দ্য রেভোলিউশনারি স্ট্রাগল, ইউ মাস্ট নো হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য টু। দ্যাট ইজ দ্য হোল কোয়েশ্চেন। (বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংসদীয় সংগ্রামকে কাজে লাগানোর জন্য আপনাদের সুবিধাবাদ ও প্রকৃত সংগ্রামের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করতে হয় তা জানতে হবে। সেটাই আসল কথা।) নো হোয়ার লেনিন সেইড দ্যাট ইন এনি সারকামস্ট্যান্সেস কমিউনিস্টস কান্ট গো টু গভার্ণমেন্টাল পাওয়ার (কোথাও লেনিন বলেননি যে কোনও অবস্থাতেই কমিউনিস্টরা সরকারি ক্ষমতায় যেতে পারবে না)। একথা লেনিনে নেই। আসলে, তখন প্র্যাক্টিকেবল (বাস্তব) ছিল না বলে ভিউ করা (ভাবা) হয়নি। সেতো আমরাও ভিউ করিনি। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর কেরালায় প্রথম অপোজিশন কমিউনিস্ট পার্টির সরকার ফর্ম (গঠন) হল। সেই সময়ের আগে এরকমভাবে কোনও পার্টি সরকারে যেতে পারে, এটা কারও ভিউতে ছিল না, অবজেক্টিভলি অনেকেই ভিউ করতে পারেনি। ফলে, থিওরেটিক্যালি সরকার চালানোর বিষয়ে প্রশ্ন ছিল না। এখন এই প্রশ্ন তো আসবে এবং উত্তর প্রোভাইড করতে হবে। সেই কারণে পার্লামেন্টারি ইলিউশন দূর করার জন্য, নানা কৌশলে পার্লামেন্টারি ওয়েপনটাকে রেভোলিউশনারি স্ট্রাগলে ব্যবহার করার কী কলা-কৌশল হবে, কীভাবে তা বুঝবেন? অবজেকটিভ কনডিশনে এখন এই প্রশ্ন এসে গেল। সিউডো রেভোলিউশনারি এবং রেভোলিউশনারি উভয়েই পার্লামেন্টে যাচ্ছে, দুজনেই বলছে আমরা পার্লামেন্টকে ইউজ (ব্যবহার) করব; কিন্তু দুজনে কি কি শ্লোগান তুলছে, কি কি ডিমান্ড তুলছে, কী কায়দায় সরকার চালাতে বলছে, তার অ্যাপ্রোচ (দৃষ্টিভঙ্গী) টু পুলিশ, তার অ্যাটেম্পট টু কন্ট্রোল দ্য পুলিশ, তার অ্যাপ্রোচ টু ক্লাস স্ট্রাগল এবং মাস মুভমেন্ট এগুলো সব তার উপকরণ — যা দিয়ে বোঝা যাবে সরকার চালাতে গেলে, ভেস্টেড (কায়েমি) ক্লাসের সঙ্গে যখনই কনফ্লিক্ট দেখা দেবে তখন রেভোলিউশনারিদের অ্যাটেম্পট (প্রচেষ্টা) কি হবে। পাবলিকের মধ্যে কী হয় — যতই বোঝান তবুও কমন পাবলিক অ্যাট লার্জ (ব্যাপক সাধারণ মানুষ), যাদের রেভোলিউশনারি কনসাসনেস নেই, এ সব কথা শুনে তারা মনে করে এরা সব কাজেই খুঁত ধরে। অনেক কথা বোঝানোর পরেও মানুষের মনের মধ্যে ডেমোক্রেটিক সেটআপে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য যে ইলিউশনটা সৃষ্টি হয়ে

আছে সেটা সহজে যেতে চায় না। লিবারাল ডেমোক্রেসি (তথাকথিত বুর্জোয়াদের উদারনৈতিক গণতন্ত্র) বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী অস্ত্র, সে ভয়ঙ্কর। সে প্রিচ করে — বিপ্লবের দরকার কি, যেমন সরকার চাও তোমরা তৈরি কর। সরকার ইচ্ছে করলে তো সবই পাল্টে দিতে পারে, আইনকানুন পাল্টে দিতে পারে, সংবিধান পাল্টে দিতে পারে, আর্মি যেটা আছে সেটারও গঠন পাল্টে দিতে পারে, পুলিশ যেটা আছে তারও গঠন পাল্টে দিতে পারে। তাহলে এরকম রক্তাক্ত বিপ্লবের দরকারটা কী? সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাবল, হ্যাঁ এতো ঝামেলার দরকার কি, এপথেই তো হতে পারে। এই মিথ্যা কথাটা প্রবলভাবে বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীরে কাজ করে। শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনা দিয়ে এটার থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবে না। এটা দেখাবার সবচেয়ে বড় সুযোগ থাকে, যদি কোনও কারণে বিপ্লবী দলের সরকার ফর্মড (গঠন) হয়। এবং তা যদি হয় তাহলে বিপ্লবীদের উচিত হবে — বিহেভ ইন এ ওয়ে (এমনভাবে আচরণ কর যার মধ্য দিয়ে) তোমরা প্রমাণ কর যে জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং চরিত্রে তোমরাই বেস্ট এলিমেন্ট (শ্রেষ্ঠ)। তোমরা একটা আধলা পয়সাও ঘুষ নাও না, পার্টির প্রয়োজন দেখিয়ে সরকারি পয়সা নষ্ট করো না, তোমরা স্বজনপোষণ করো না, কোনওদিক থেকে কেউ যেন তোমার খুঁত না পায়। আসলে যেগুলো দিয়ে কনফিউশন হয় যে, এরা করাপ্ট, এই লোকগুলো ঠিক নয়, সব বাজে লোক, সেই জন্য এদেশে কিছু হল না। পাবলিক কনসেপশনে এখনও সততার একটা মূল্য রয়েছে। আর সততার মূল্য থাকুক বা না থাকুক, কোনও খাদ না রেখে তোমরা সরকার চালাও। পাবলিকের সাথে কনসাল্ট (আলোচনা) করো, গুড প্ল্যান অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল (আইন অনুযায়ী ভাল পরিকল্পনা কর), সেগুলো চালু করার এবং প্রয়োগ করার চেষ্টা কর। আর সাথে সাথে পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাও যে সরকার আর স্টেটের (রাষ্ট্রের) মধ্যে পার্থক্য কি? আইন করে কেন রাষ্ট্র পাল্টানো যায় না, কিসে কোথায় লিমিটেশন (সীমবদ্ধতা), আইনের সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কি। এগুলো মানুষের কনসেপশনে আনতে হবে, আইনকেও পাল্টানোর একটা আর্জ (আকাঙ্খা) তৈরী করতে হবে। সোস্যাল আর্জ সৃষ্টি করে তার বলভরসায় এমন এমন জায়গায় আইন পাল্টাবার চেষ্টা করতে হবে, যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়ায় টান পড়বে। এভাবে চলতে থাকলে, ইনভ্যারিয়েবলি (অবশ্যম্ভাবীভাবে) সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট, পুলিশ এবং মালিক সম্প্রদায় থেকে বাধা আসবে। চিৎকার করে উঠবে তারা। এই কাজগুলো অর্থাৎ তোমরা গুড প্ল্যান নিয়েছ, চেষ্টা করছ, আধলা পয়সা খাওনি, এবং তোমরা সৎ লোক, যোগ্য লোক, জ্ঞানী লোক, কিন্তু করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, কিছু হল না, তা মানুষকে দেখিয়ে দিতে হবে। শুধু হলো না, তা নয়, সমস্ত ভাল পরিকল্পনাগুলো বাধা দিচ্ছে ভেস্টেড ক্লাস (পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার দোসররা)। তাই সেটা দেখিয়ে দিতে হবে। তখন বামপন্থী সরকার এবং পিপল ভেস্টেড ক্লাস এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়বে। লড়বে ফর অ্যাডভান্সিং ডেমোক্রেটিক স্ট্রাগল (গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য)।

কেরালার সিপিআই সরকার এটা করেনি। আমরা ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় সরকারে গিয়ে প্রথমেই বললাম, পুলিশ স্যাল নট ইন্টারফিয়ার ইনটু দ্য ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ বাধা দেবে না)। সরকারে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ একটি ডিক্লারেশনে (ঘোষণায়) ফ্রান্স, আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে জাপান, ইউরোপের সমস্ত কাগজে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। তাদের বুকে কাঁপুনি ধরে গেল। এই ওয়ার্কার নিয়ে তো তাদের দেশেও কারবার। ব্রিটেনের লেবার পার্টির টনক নড়ে গেল। তাদেরও তো এই ওয়ার্কার নিয়েই কারবার, কালই যদি ওয়ার্কাররা বলে আমাদের ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের ওপর পুলিশের হস্তক্ষেপ চলবে না? আর বলতে হবে আইনসঙ্গত হলেই তা মানবিক হয় না। কাজেই সরকারে গেছো বলেই কি অমানবিক কাজ করবে, আইনের দোহাই দিয়ে? তা চলবে না। জনগণের আর্জ অ্যান্ড অ্যাসপিরেশন (ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা) অনুযায়ী দরকার হলে আইনের খোলনলচে পাল্টাতে হবে। তাদের কাছে এতো মারাত্মক কথা! তখন এখানে সিপিএম সহ অন্য পার্টিগুলো কী করল? তারা কায়দা করে বলতে শুরু করল যে, ওটা আমরা বলিনি, ওটা এস ইউ সি আই বলেছে, মালিক ঘেরাও হলে পুলিশ যাবে না, ওসব হচ্ছে এস ইউ সি'র উগ্রতা। আবার যখন পাবলিকের মধ্যে এই পলিসির অ্যাপ্রিসিয়েশন (প্রশংসা) দেখলো তখন বেকায়দায় পড়ে ঠিক উলটো সুর, তখন বলে কিনা ওটাতো ওরাই চালু করেছে। সিপিএম-এর তো হোম মিনিস্টার ছিল, এই বলেই ক্রেডিট নিতে আরম্ভ করল। সেই জন্য দেখুন ইঞ্জিনিয়ারিং মজুর সম্মেলনে ওয়ার্ন করেছিলাম যে, ইট ইজ এ পাওয়ারফুল ওয়েপন (অস্ত্র)। এই ওয়েপনটা হচ্ছে মাসের সঙ্গে সরকার কম্বাইন্ডলি (মিলিতভাবে) ব্যালান্স করে স্ট্রাগল করবে, উইদআউট গিভিং এনি স্কোপ টু দ্য বুর্জোয়াজি। বুর্জোয়াদের কোনও স্কোপ দেবে না, পুঁজিপতিদের কোনও স্কোপ দেবে না, পুলিশ ও জুডিসিয়ারিকে (বিচারব্যবস্থাকে) কোনও স্কোপ দেবে না, অথচ কনফ্লিক্টটাকে গড়ে তুলবে যাতে পিপল ক্লিয়ার দেখতে পায়। পিপলকে এটা বোঝাতে পারলে সেই পিপল বামপন্থী সরকারের পক্ষে থাকবে। তার ফলে যদি কনফ্লিক্ট (আক্রমণ) আসে ফ্রম ভেস্টেড ক্লাস, লেট দ্য সেন্ট্রাল গভার্নমেন্ট ওভারথ্রো দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। পিপল উইল স্ট্যান্ড বাই দ্য স্টেট গভার্নমেন্ট অ্যান্ড বাই দ্যাট ইট উইল বি ট্রান্সফর্মড ইনটু এ রেভোলিউশনারি গভার্নমেন্ট ফাইটিং এগেইনস্ট দ্য বুর্জোয়া গভার্নমেন্ট (রাজ্য সরকারের পক্ষে জনগণ দাঁড়াবে এবং তার দ্বারা তা বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিপ্লবী সরকারে পরিণত হবে)। উইদাআউট রেভোলিউশন (বিপ্লব ছাড়া), গভার্নমেন্টের মধ্য দিয়ে সব পরিবর্তন এসে যাবে কে বলেছে? কিন্তু ইফ উই বিহেভ ইন অ্যান ইরেসপন্সিবল ওয়ে (যদি আমরা দায়িত্বহীন আচরণ করি) সরকার গঠনের দায়িত্ব না নিয়ে, তাহলে দ্য হোল পারপাস অফ পার্টিসিপেটিং ইন দ্য পার্লামেন্টারি পলিটিক্স ইজ গান, ফলিং ফ্ল্যাট (সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে)। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে তুমি পার্লামেন্টারি ইলেকশনে লড়েছিলে কেন? তুমি ইরেসপন্সিবল পার্টি, তুমি দায়িত্ব নিতে চাও না, অপোজিশনে (বিরোধী হিসেবে) শুধু চিৎকার করতে চাও। সেই পার্টি কখনও মাসকে লিড করতে পারে নাকি? যখন তোমার সুযোগ এসেছে, তুমি কি তা নষ্ট করবে? এ কোনও রেসপনসিবল পার্টির কাজ? আমরা তো কতগুলি রিফর্ম (সংস্কার) বা মেজারের (পদক্ষেপের) কথা ভাবব, যে মেজারগুলি কনডিউসিভ (সহায়ক) টু দ্য গ্রোথ অফ দ্য রেভলিউশনারি মুভমেন্ট, যাকে পাবলিক অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। কিন্তু সেন্ট্রাল গভার্নমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অল অর্গানস অফ দ্য স্টেট (রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত শাখা) সেগুলোর বিরোধিতা করবে। এই বিরোধিতায় লেফট সরকার এবং পাবলিকের রিলেশন (সম্পর্ক) ক্লোজার (আরও ঘনিষ্ঠ) হবে এবং ক্লাস স্ট্রাগলটা আরও একটা ফারদার স্টেপ পাবে (উন্নতস্তরে যাবে)। এই রাস্তাটা লেনিন কোনও বইয়ে লিখে যাননি। আর বইয়ে যখন তিনি লিখে যাননি, তখন আমাদের নতুন কিছু করা চলে না। আর তখন আমাদের লেনিনের মত করতে হলে তো জারের রাশিয়ার অবস্থায় গিয়ে পৌছনো দরকার। তা নাহলে, লেনিনের তত্ত্বের প্রয়োগ সম্ভব নয়। আর সেইরকম অবস্থায় আমরা পৌছতেও পারব না। লেনিনের পার্টি আন্ডারগ্রাউন্ড (নিষিদ্ধ) পার্টি ছিল। তাহলে আমাদের ওপেন পার্টি (প্রকাশ্য পার্টির কাজ) করার সুযোগ নেওয়া চলবে না। কারণ ওপেন পার্টি হলেই সুবিধাবাদ এসে আমাদের ছেয়ে ফেলতে পারে। কাজেই ওপেন পার্টির সুযোগ থাকলেও ওপেন পার্টি না করে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে আমার নাম আজ সোমেশ, কালকে গোমেশ, পরশু পরেশ এই সব হাবিজাবি বকে যাব আরকি; এই চুপ এখন কোনও কথা নয়, আমি রাত বারোটার সময় গঙ্গার ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা করব, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি! এসব সিলি অ্যাফেয়ার (ছেলেমানুষি)। হাউ ক্যান দে লিড দ্য মাসেস? বিপ্লব এত সোজা নয়। খোকাদের কাজ নয় বিপ্লব। এই সব ফাইট করার জন্যই, লেনিনের 'লেফট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিজঅর্ডার' বইটি লেখা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটা বিচারধারা, একটা বিজ্ঞান। যে সব মনীষীরা মার্কসবাদের উপর বহু কথা বলে গেছেন তারা বহু জিনিস দেখেই যাননি।

যদি তাঁরা দেখে যেতে পারতেন, তাহলে তো তাকে রিজলভও করে যেতে পারতেন। কিন্তু রিজলভ করার জন্য যে শাস্ত্রটা দরকার, যে বিজ্ঞানটা দরকার, সেটাতো দিয়ে গেছেন। কীভাবে রিজলভ করতে হবে, কী ক্লাস দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে, কীভাবে বিজ্ঞানটা প্রয়োগ করলে তবে তুমি সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারবে, সেই বিজ্ঞানটাতো হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। লেনিনবাদের বিজ্ঞানটাতো আমাদের হাতে আছে। কিন্তু ইলেকশনে লড়তে গিয়ে মেজরিটি হলে যে সঙ্কট এবং কন্ট্রাডিকশন হয় বা তার সামনে তুমি পড়লে তাকে কীভাবে তুমি রিজলভ করবে, তার সলিউশন লেনিনের বইয়ে দেওয়া নেই, কারণ তিনি এই অবস্থা ফেস করেন নি (সম্মুখীন হন নি)। সেই অবস্থা যে মার্কসবাদীরা ফেস করবে, তাদের সেই সলিউশনটা দিতে হবে, সেটা তাদের দায়িত্ব। আমাদের দলের এইমাত্র অপরাধ হয়েছে যে, আমাদের দলই একমাত্র গর্বের সঙ্গে বলতে পারে যে, এই পরিস্থিতিতে দল বই কপি করে সোজা রাস্তা বাতলাতে চায়নি বা কন্ট্রাডিকশনের সামনে পড়ে উল্টোপাল্টা বলতে শুরু করেনি। যারা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করছ তারাও তার উত্তর দিতে পারছো না। হয় বুর্জোয়া রাজনীতির লেজুড় হয়ে গিয়েছো, আর তা না হলে বলছো সরকারে যাওয়া চলবে না। ইলেকশনে গিয়ে যদি তুমি মেজরিটি হও, তুমি বলছ আমি সরকার ফরম করব না। তাহলে তুমি লোকের কাছে ভোট চেয়েছিলে কেন? পাবলিক ভোট দিয়েছে, মেজরিটি হয়েছ, এখন বলছ সরকার ফরম করবে না। আমি মনে করি, সে পার্টির বিপ্লব অর্গানাইজ করার কোনও যোগ্যতাই নেই।

এই ক্লাস ডিভাইডেড সোসাইটিতে সমস্ত জিনিসই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অ্যাপ্রোচ করতে হয়, কোনও বিষয়েই একটা কমন সিঙ্গল অ্যাপ্রোচ নেই। কোনও বিষয় সম্বন্ধে সকলের একরকম স্বার্থবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি, তা হয় না। তাই ইলেকশন সম্বন্ধেও তাই। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ইলেকশন যখন হুড়মুড় করে এসে পড়ে তখন তার দুটো ক্লাস অ্যাঙ্গুলারিটি (দৃষ্টিভঙ্গী) আছে, একটা বুর্জোয়া ক্লাস অ্যাঙ্গুলারিটি, আর একটা রেভোলিউশনারি প্রোলেটারিয়ান ক্লাস অ্যাঙ্গুলারিটি। এই জায়গাটা আপনাদের বুঝতে হবে ঠিক করে। রেভোলিউশন আমি চাইলেই তৎক্ষণাৎ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রেভোলিউশনারি কন্ডিশন বোথ পলিটিক্যালি অ্যান্ড অর্গানাইজেশনালি ক্রিয়েটেড হয়েছে। সেই অবস্থায় আমরা সরকারে গেলাম এবং সরকারে আমরা মেজরিটি হলাম। মেজরিটি হয়ে গেলে যদি আমরা বলি আমরা সরকার ফরম করব না, তুমি যে পিপলের কাছে ভোট চেয়েছিলে ফাইট করার জন্য, নোইং ফুল ওয়েল দ্যাট, এটা একটা বুর্জোয়া পার্লান্টোরি ব্যবস্থা। তা আমরা কি সেটাকে হ্যান্ডল করব না? বা আমরা ঐ লেনিন যেটাকে বলছেন নিজের ছায়া দেখে ভয় পাওয়া — ওরে বাবা, ওখানে গেলে তো আমি পচে যাব, কাজেই আমি যাব না। ও জনতা যা ভাবে ভাবুক, আমি পিওরিটান (গোঁড়া নীতিনিষ্ঠ) থাকব। আমরা কি এইভাবে ভাবব, নাকি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করব? হ্যাঁ, আমরা চ্যালেঞ্জটাই অ্যাকসেপ্ট করব। মানুষ তো মনে করে যে, আমাদের দল সরকারে গেলে আমরা অনেক কিছু করতে পারব। কিন্তু এই বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি সিস্টেমের মধ্যে সরকারে গিয়ে আমিও যে বিশেষ কিছু করতে পারি না, আমি এইটা অন্তত দেখাবার সুযোগ পাব। এইটে করে দেখাবার কায়দার মধ্যেই সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি আর সিউডো রেভোলিউশনারি পার্টির ডিফারেন্স (পার্থক্য) ধরা পড়বে। ফলে এই অবস্থায় আমরা কারেক্ট স্ট্যান্ড (সঠিক অবস্থান) নিয়েছি। আমরা কারেক্ট রেভোলিউশনারি লাইন নিয়ে চলছি, আমরা যে প্রকৃত রেভোলিউশনারী পার্টি এটা শুধু আমরা বুঝলেই তো হবে না, জনতাকে তো বোঝাতে হবে। কে বোঝাবে? সেই দায়িত্বও আপনাদের।

আপনারা মনে রাখবেন, এই হলে (মহাজাতি সদন, কলকাতা) যত কমরেড উপস্থিত আছেন, তার পাঁচ দশগুণ পার্টি কমরেড আমাদের গোটা দেশে ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমবাংলা থেকে আপনারা যারা এসেছেন তার আরও চারগুন এই ক্লাসে আসেননি। এই হলে সকলের জায়গাও দেওয়া সম্ভব হত না। তার মানে পার্টির এই যে সংখ্যাটা, প্রত্যেকে যদি ইডিওলজিক্যালি, পলিটিক্যালি কনসাসলি নিজের ক্রিয়েটিভ সেন্স ইউটিলাইজ করে কাজ করে যান, এই এতবড় শক্তি তাহলে সত্যিই এই চ্যালেঞ্জটাকে মিট করতে পারবেন। পার্টি কাজ দিল কি না দিল, তার উপর বসে থাকবেন না। যেমন করে আপনি বোঝেন, তাতে হয়তো আপনি ভুল করবেন, শুধু মেন্টাল অ্যাটিচিউডটা থাকা দরকার যে ভুল হলেও সেটাকে ডিফেন্ড করবেন না (আঁকড়ে ধরবেন না)। আবার ভুল করতে পারি এই ভয়ে বসে থাকবেন না। নিজের পরিকল্পনায় প্রতি মুহূর্তে আপনারা কাজ করুন, তাহলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আপনারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা কমান্ডেবল (নেতৃত্বকারী) শক্তি অর্জন করতে পারবেন। ২৬টা বছর এই স্তরে আসতে যে বেগ পেতে হয়েছে, আজকের পার্টির এই টোটাল নাম্বার, প্রত্যেকে তার সীমিত ক্ষেত্রে বসে না থেকে আপন উদ্যোগে পার্টির রাজনীতি জনগণের মধ্যে নিয়ে যান, জনগণকে নানা ধরনের সংগঠনে সংগঠিত করুন। নিজের উদ্যোগে এবং আপন বুদ্ধিতে এই কাজটুকু যদি প্রত্যেকটি কমরেড করেন দেখতে দেখতে পার্টিটা যে শক্তি অর্জন করবে, নিজেরাও যে ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তাতে সকলের কাছে একটা সমীহ আদায় করার জায়গায় চলে যাবেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আপনাদের অনেকগুলো কাগজ রয়েছে। একটা অদ্ভুত জিনিস আমি লক্ষ্য করছি যে, উপর থেকে একটা হাওয়া সৃষ্টি করে দিলে তখন কাগজের সেল বেড়ে যায়। কিন্তু আপনারা কন্টিনিউয়াসলি মনে রাখেন না যে, প্রত্যেকটি কমরেডের দলের কাগজ রাখা একটি অবশ্য করণীয় কাজ। ইউনিটের কোটা শুধু নয়, ইউনিটের প্রতিটি মেম্বার ইন্ডিভিজুয়ালি এক কপি করে রাখবেন। এটার দুটো ইউটিলিটি (লাভ), একটি হল তিনি সেটাকে বারবার করে পড়তে পারবেন। অবসর সময় কেবলই বাসে-ট্রেনে বা কোথাও যেতে ব্যাগ থেকে বের করে পড়ার সুযোগ থাকবে। আরেকটি হল, তার কাছে সব বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও সর্বদা ঐ একটি কপি সঙ্গে থাকলে তিনি আরও পাঁচজনকে যখন যে জায়গাগুলো পড়ে শোনানো দরকার বা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার, সেগুলো সাথে সাথে আলোচনা করতে পারবেন। আর একটা হল ইউনিটের কোটা হবে এই প্রত্যেকের একটি করে সংখ্যা আর জনগণের মধ্যে পার্টির কাগজটা নিয়ে যাওয়ার জন্য কত সংখ্যা আমরা পাবলিকের মধ্যে বিক্রি করতে পারি, পুশ করতে (নেওয়ানোর জায়গায় নিয়ে যেতে) পারি, সাবস্ক্রাইবার (গ্রাহক) ক্রিয়েট করতে পারি — এই দুটোর যোগফল। এরকম টাইম টু টাইম (মাঝে মাঝেই) সাবস্ক্রাইবার ক্রিয়েট করার মুভ হয়। এটা হচ্ছে উপর থেকে লিডারশিপ একটা ডাইরেক্টিভ (নির্দেশ) দিল আমরা তৎক্ষণাৎ সাবস্ক্রাইবার তৈরি করার জন্য ডোর টু ডোর অ্যাপ্রোচ (বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি) করতে শুরু করলাম। এতে কিছু সাবস্ক্রাইবার বাড়ে, সার্কুলেশনও (বিক্রির সংখ্যাও) বাড়ে। এটাতো সময়ে সময়ে করতে হবে। কিন্তু, প্রতিদিনই আমরা হাজার একটা কাজের মধ্যে থাকি, মানে আমি তো মানুষের মধ্যেই কাজ করি, মানুষের মধ্যেই ঘোরাফেরা করি, মানুষের মধ্যেই ক্যাম্পেইন (প্রচার অভিযান) করি, ফলে আমার ব্যাগে কাগজ থাকলে আমি কন্টিনিউয়াসলি সেগুলো পুশ করতে পারি। আমাদের ইউনিটগতভাবে যেমন ইউনিটের কমরেডরা, জেলাগতভাবে যেমন জেলার নেতারা, তাদের লক্ষ্য করা দরকার যে প্রতিটি ইস্যুর পরেই তারা তাদের সংখ্যাটা কতটা বাড়াতে পারল। দে মাস্ট নট এন্টারটেইন অর এনকারেজ এ ডিসকাশন অর অ্যান আর্গুমেন্ট, (এমন আলোচনা বা যুক্তি করায় প্রশ্রয় বা উৎসাহিত করা উচিৎ নয় যে) কতটা কমানো যায়। কি কি অসুবিধা, কেন করা যাচ্ছে না, কেন কাগজ পড়ে থাকে, সেই পড়ে থাকা কাগজগুলো যে সব জায়গায় যে সব কারণে হচ্ছে, সেগুলো এলিমিনেট করা হবে তাদের কাজ। ইনস্ট্রাকশন বা সার্কুলারে যেখানে কাজ হয় না, সেখানে লিডাররা সেসব জায়গায় নিজেরা গিয়ে ফ্যাক্টরগুলোকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলিমিনেট করবে যাতে একটি কাগজও পড়ে না থাকে। আর একটা জিনিস হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাবলিকের মধ্যে যারা কাজ করেন, কাগজের ইস্যুর ভিত্তিতে, পার্টি লিটারেচারের ভিত্তিতে মানুষের সাথে আলোচনা করার উদ্যোগ নিতে হবে। কালেক্টিভ রিডিং (যৌথ পাঠ) হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন। আমি শুধু পার্টি কমরেডদের কালেক্টিভ রিডিংয়ের কথা বলছি না। বলছি, মজুরদের মধ্যে, গ্রামের চাষিদের মধ্যে যারা কাজ করেন, প্রচুর

শ্রমিক-চাষি অশিক্ষিত, অনেক লিটারেচার বেরোয় বাংলা, হিন্দি বা ইংরাজিতে, সেগুলো তারা পড়তে পারে না। ফলে তাদের নিয়ে সপ্তাহে বৈঠক হওয়া দরকার। যেখানে প্রশ্নোত্তর করে ক্লাস নেওয়া হয়, সে তো হবেই, কিন্তু আগে আমাদের কাগজে কি বেরোল, লিটারেচারে যা বেরোল, নতুন যে বইগুলো বেরোল, সেগুলো আগে পড়িয়ে দেওয়া দরকার। একজন পড়বে, তার ভিত্তিতে সকলে মিলে আলোচনা করবে। এটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে (সুপরিকল্পিতভাবে) হওয়া দরকার। এটা অবশ্যকরণীয় কাজ একটা। যখন আমরা একসাথে বসছি, আমরা দেখব যে আমাদের কাগজটা সকলের ভালভাবে পড়া হয়েছে কিনা, এবং তার ওপর একটা আলোচনা হয়েছে কিনা। সেটা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে একসঙ্গে বসে প্রথমে সেইটা করব। করতে গিয়ে কত কথা আলোচনা হবে। আমরা তর্ক বিতর্ক করব। অ্যাসোসিয়েশনের এটা একটা প্রাথমিক শর্ত। এই কাজটা আমরা করলে, আমাদের কাগজের সার্কুলেশন ডাবল (দ্বিগুণ) হয়ে যেতে পারে বলে আমার ধারণা। প্রতিটি ক্ষেত্রে পেপারকে পুশ করা আর দেখা সেই পেপারটাকে কেন্দ্র করে লোকজন বসে আলোচনা করছে কিনা। যদি না করে, কি করে পেপারটাকে কেন্দ্র করে আলোচনা শুরু করিয়ে দেওয়া যায়, তুমি তার আর্টটা (কৌশল) রপ্ত করার চেষ্টায় থাকো। এক্ষুনি পারলে কিনা সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু তোমার নজরের মধ্যে সেটা ২৪ ঘণ্টা আছে। একটা জায়গায় গেলেই অনেক কাজের মধ্যে এটা তুমি ভোলো না যে, এখানে আমার কাগজটা এসেছে কিনা, এবং ঐ ইস্যুটা যেটার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বেরিয়েছে সেই কাগজটা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে কিনা এবং এই লোকগুলো সেটা পড়েছে কিনা। অথবা যারা পড়েছে তারা অপরকে সেগুলো শুনিয়েছে কিনা। একটা কাজ করতে গিয়ে এটা মনে রাখার মধ্যে কোনও গণ্ডগোল নেই। কাজের দ্বন্দ্বের ব্যাপার নেই যে আমার এতগুলো প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামের জন্য আমি এইটা মনে রাখতে পারলাম না। যে কোনোও প্রোগ্রামের কাজ করতে গিয়ে এটা আমার মনে না থাকাটা পলিটিক্যাল অ্যালার্টনেস, পারপাসিভনেস (উদ্দেশ্যমুখীনতা), আর পলিটিক্যাল উদ্যোগের অভাব। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে লিডিং অর্গানাইজারস, লিডারস টু ইম্পর্ট্যান্ট ক্যাডারস অ্যান্ড ইভন অর্ডিনারি মেম্বারস এই পারপাসটা ফুলফিল করতে পারবে। নোট ইট ভেরি কেয়ারফুলি (খুব গুরুত্বসহকারে আপনারা এটা লিখে নিন, বুঝে নিন)।

কমরেডরা কাজ করুন, সাধ্য মতো করুন আর নিজেদের ইকুইপ করুন

আর একটা কথা বলি। একটা অভ্যাস হয়েছে শুধু শোনা। যখনই যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথা ক্লাসে শোনেন বা অন্য জায়গায় শোনেন, নিজের ব্যাগ বা ঝোলা প্রত্যেকেরই একটা থাকা দরকার, সেইটা থেকে কাগজপত্র বের করে যে নতুন কথাটি, যে নতুন ভঙ্গিটি, যে এক্সপ্রেশনটি আপনি শুনলেন, যা আপনার মনে রাখা দরকার বা আরও ভাল করে বোঝা দরকার, তৎক্ষণাৎ সেটাকে লিখে রাখুন। এটাকে একটা অভ্যাসে পরিণত করুন। পরে বুঝে নেব বলে আপনারা শুধু শুনে যান। তারপরে বুঝে নেওয়া আর হয় না। অথবা বুঝে নেওয়া হল, কিন্তু কিছু বুঝে নেওয়া হলেও মেথডিক্যালি (পদ্ধতি অর্থে) এই ডিফেক্টটা (ত্রুটিটা) থেকে যায়। তার ফলে বহু জিনিস অ্যাটেনশন থেকে ল্যাক করে (সচেতন দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়)। ফলে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করুন। তাই লিখিতভাবে আমি নোট নেব এবং তারপর তা আমি বেস্ট ওয়েতে আয়ত্ব করব। যখন একা থাকব বারবার আওড়াব। সেটা আবার সময় সুযোগ পেলেই অপরকে বলব। এইভাবে আমাদের বলার ভঙ্গি, যুক্তি করার ধরন, তর্ক করার ক্ষমতাটাকে প্রত্যেকদিন বাড়াতে হবে। আমাদের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, মজুরের কাজ করলেও মোমবাতি জ্বালিয়ে হলেও আমাকে পড়তেই হবে। কারণ আমি একজন বিপ্লবী, আমাকে জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। আমি একজন সচেতন ওয়ার্কার। আমাকে পরিশ্রম করে জানতেই হবে। আপনি ক্যাডার, পাবলিককে ট্যাকল (জনতাকে সঠিকভাবে পরিচালনা) করার সময় কন্টিনিউয়াসলি তার মুডের (মন-মানসিকতার) দিকে লক্ষ্য রাখবেন, তাকে কখন বোঝানো বা কখন শোনানো যাবে। কিন্তু সারাক্ষণ প্রিচিংয়ের (উপদেশ দেওয়ার) মত করে বোঝাবেন না, থাকুন তার সঙ্গে। আর থাকবার রীতিটা আপনার বিপ্লবীর মতো হওয়া দরকার। অর্থাৎ থাকতে গিয়ে তার কারেন্টে (ক্ষতিকারক প্রভাবে) বা তার সংস্কৃতিতে আপনি ইয়ার হয়ে যাবেন না। তার আড্ডার একজন সদস্য হয়ে যাবেন না। তার আড্ডার মধ্যেই সেই পরিবেশের মধ্যেই নিজের বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রটি নিয়ে থাকুন। তাহলেই কাজ হবে। তাহলেই তার প্রভাবে সেই মানুষগুলো আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকবে এবং আপনার প্রভাবও বাড়তে থাকবে। প্রতিটি কমরেড এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ তার আপন ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম (যতটা বেশি সম্ভব) সময় নিয়ে প্রতিদিন করুন। অ্যাপ্লিকেন্ট মেম্বাররা অন্তত দু-ঘণ্টা করুন। পাবলিকের সঙ্গে কোনও একটা কর্মক্ষেত্রে, হয় ক্লাবে, নয় বস্তিতে, নয় ইউনিয়নে, নয় মজুরদের মধ্যে একটা পলিটিক্যাল ক্লাস নেওয়া বা আড্ডা দেওয়া বা আলোচনা করা বা গণদাবী বোঝাবার ব্যাপারে প্রতিদিন সমস্ত কাজের মধ্যে এইটা যদি প্রত্যেকের মনের মধ্যে থাকে তাহলে খুবই ভাল। যারা সর্বক্ষণের কর্মী, গুড ক্যাডার তারা দুঘণ্টা কেন, সারাদিনই এই কাজ করতে পারেন। তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই যে চ্যালেঞ্জ আপনারা নিচ্ছেন তা ফুলফিল (পূরণ) করতে পারবেন। মুভমেন্ট আফটার মুভমেন্ট (আন্দোলনের পর আন্দোলন) আসছে যাচ্ছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি আপনাদের পার্টিকে শক্তিশালী করে জনগণের সমস্ত লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন, তাহলে বিক্ষোভ এলে সেই বিক্ষোভের লড়াইতে নেতৃত্বের ভূমিকায়, একেবারে নিম্নস্তর থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত অর্গানিক কানেকশন (প্রাণের সম্পর্ক) গড়ে তুলতে পারবেন। এমতাবস্থায় মাসকে আমরা কারেক্ট ডাইরেকশনে (সঠিক পথে) নিয়ে যেতে পারবো। তাই এটাকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। সিপিআই, সিপিএম এমনকি নকশালপন্থীরা যতটা মোহ বা বিভ্রান্তি যুব সমাজের মধ্যে বা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছিল, কমিউনিস্ট মনে করে এদের দিকে মানুষ যেভাবে ঝুঁকেছিল, এদের সম্বন্ধে সে বিশ্বাসে অনেকখানি চিড় খেয়েছে। আর একটা অত্যন্ত উপকারী জিনিস অনেক অনিষ্টের মধ্যে হয়েছে, জনগণের মধ্যে এই ভাবনাটা এসেছে যে নাম থাকলেই কমিউনিস্ট হয় না। যেমন সিপিআই, এখন অনেকেই তাকে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে না। তেমনই নকশালদেরও অনেকে কমিউনিস্ট মনে করে না। তেমনই সিপিএমকেও অনেকে কমিউনিস্ট মনে করে না। আগে কিন্তু আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন একটা দৃঢ় ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল নাম না থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি হয় না। নামে কমিউনিস্ট পার্টি অথচ কমিউনিস্ট নয়, তা কখনও হয়? আর আন্তর্জাতিক রেকগনিশন (স্বীকৃতি) সেটা থাকলেই একটা সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হয়, ভুল পার্টি হয় না, সেটা একটা অমোঘ যুক্তি ছিল। সেটাও এখন অনেকখানি চলে গেছে। তৃতীয় পয়েন্ট হল, পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে খুব ফেভারেবল (অনুকূল)। এস ইউ সি আই যে কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, বরঞ্চ শত্রুপক্ষ, মাস এবং বিপক্ষ দল ওভারঅল যে প্রচারটা করে ইন দ্য মেইন (প্রধানত), সেটা হচ্ছে আপনারা মার্কসবাদী এবং আপনারা উগ্র কমিউনিস্ট। কিন্তু শত্রুও বলতে পারবে না আপনারা কমিউনিস্ট নন, মার্কসবাদী লেনিনবাদী নন। শুধু এই পার্টিগুলো নিজেদের র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলকে আটকে রাখার জন্য বলে এটা কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কিন্তু নিজেরাও বোঝে, জানে আমরা আসলে কী, সেখানেই ওদের ভয়। কারণ লোকজনেরও আমাদের সম্পর্কে আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। বাইরের পাবলিক সকলেই মনে করে আপনারা কমিউনিস্ট পার্টি। শত্রুপক্ষও মনে করে বুর্জোয়ারা বা অন্যরাও মনে করে তাই যে আপনারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। কাজেই এই ফ্যাক্টরগুলো সমস্ত মিলে পুরনো অবস্থায় আমরা যে জগদ্দল পাথর ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছিলাম, যেটাকে ভীষ্মের যুদ্ধ করার সঙ্গে তুলনা করেছি, কী প্রবল কারেন্টের বিরুদ্ধে আমাদের লড়ে এগুতে হয়েছে, আজ সেই তুলনায় অনেকটা এক্সেলেন্ট (খুবই অনুকূল) সিটুয়েশন। যতটা সিপিএম ডিসক্রেডিটেড (ধিকৃত) হয়েছে, যতটা সিপিআই ডিসক্রেডিটেড হয়েছে, যতটা মানুষের মনের মধ্যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব স্বীকার করলেই সেটা ঠিক পার্টি হয়ে যায় না এই ধারণা পরিষ্কার হয়েছে, ততটা এক্সটেন্টে (পর্যন্ত) আমাদের রাজনীতির প্রবেশের রাস্তা এক্সেলেন্ট (খুবই অনুকূল) হয়েছে। এর মানে এই নয়

যে আমাদের বাধা নেই। আমরা এখন কাজ করতে গেলেই লোককে বোঝাতে থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে লোক সব আমাদের দিকে আসতে থাকবে এই চিন্তা ঠিক নয়, এটা ইলিউশন। এখনও বহু কনফিউশনকে (ভ্রান্তধারণা) ফাইট করতে হবে। আরও বহু ধাক্কা খেতে হবে। কিন্তু তবু অতীতের সেইসব স্টাম্বলিং ব্লকগুলো (জোরালো প্রতিবন্ধকতা) অনেকাংশে কমে গিয়েছে এবং সেই কারণে এটা একটা এক্সেলেন্ট সিচুয়েশন আমাদের জন্য। বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য, কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আচরণের জন্য বহু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বের মেইন ট্রেন্ড বা প্রবণতা বিপ্লবের দিকে। সর্বত্র বিপ্লবের আগুন যেন ধক ধক করে জ্বলছে, কারেক্ট লিডারশিপ এবং রিয়েল পলিটিক্যাল ফোর্স (প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি) মাসের মধ্যে গড়ে তোলার অপেক্ষায় আছে। আর ভারতবর্ষের মাটিতে তা করার দায়দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তেছে। আমরা এটাকে অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট (গ্রহণ) করতেই হবে। প্রত্যেকে এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার উপযোগী মনোবল নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। আর পলিটিক্যাল উদ্যোগের ব্যাপারটা মাথায় রাখুন সবসময়। ওপরের ইনস্ট্রাকশনের (নির্দেশের) জন্য কখনও অপেক্ষা করবেন না। ভুল করব এই ভয়ে উদ্যোগ নিতে ভয় পাবেন না। আর ভুল করেছেন বলে নেতারা ধমকালে ভয় পাবেন না। আমি এখনও বেঁচে আছি, অসুবিধা হলে আমার কাছে দৌড়ে আসবেন। পার্টির পলিটিক্স ভাল করে বুঝুন, নিজেকে তৈরি করুন। কাজ না করে শুধু বসে বসে আলোচনা করে অপরের মধ্যে কর্মস্পৃহা নষ্ট করবেন না। সেটা যে কেউ করুক, যেকোনও নেতা করুক, অ্যাট ওয়ান্স (তৎক্ষণাৎ) তাকে ডিসকারেজ (নিরুৎসাহিত) করুন। সমালোচনা থাকে সমালোচনা করুন, কিন্তু কাজ করতে করতে করুন। বেশি কাজ করে বেশি সমালোচনা করুন, আপত্তি নেই। কাজ না করে সমালোচনা করা, এ হল অধিকারের বাইরে পা দেওয়া। এ উচিত নয়। সেই ট্র্যাপে (ফাঁদে) কেউ পা দেবেন না। প্রত্যেকে কাজ করুন, সাধ্যমত করুন এবং নিজেকে ইক্যুইপ (তৈরি) করুন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বই পড়ুন, সাথে সাথে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে বুঝতে বলছে এবং কীভাবে এক্সপ্লেইন (ব্যাখ্যা) করছে, কীভাবে প্রয়োগ করার কথা বলেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে তাকে অ্যানালিসিস করেছে সেগুলোকে মাস্টার (অভ্রান্তভাবে আয়ত্ত করুন) করুন।

একটা কথা মনে রাখবেন, কারেক্ট রেভোলিউশনারি অ্যাপ্রোচের মধ্যে টাস্‌ল আছে, ন্যায় অন্যায় আছে, দোষত্রুটি আছে, ভুলভ্রান্তি আছে। কিন্তু ভুল-ভ্রান্তি, ন্যায়- অন্যায়, দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ইন দ্য মেইন দিস রেভোলিউশনারি কারেন্ট ইজ দ্য সিওরেস্ট ওয়ে টু লিড অ্যান অনারেবল লাইফ। কাজেই আমি নিজেকে এটা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। তাহলে আমার আর কিছু থাকে না। এইভাবে যদি আপনারা আপনাদের কাজ করতে থাকেন, তাহলে ফিউচার ইজ উইথ ইউ (ভবিষ্যৎ আপনাদের)। তাহলে আমি একটি মাত্র কথাই বলব, আপনাদের বিরুদ্ধে সিপিএমই হোক, আর কংগ্রেসই হোক, আর নিন্দাবাদীরা যত নিন্দাই করুক, যত গল্প এবং কুৎসা রটনাই করুক, সেই সিভি রমনের কথা দিয়ে আমি শেষ করব, লেট দ্য ডগস্‌ বার্ক, বাট দ্য ক্যারাভান উইল মার্চ অ্যাহেড। আপনারাও এগোবেন। তারা হাজার চিৎকার করেও আপনাদের গতিরোধ করতে পারবে না। আর তৃতীয় ফ্যাক্টর হচ্ছে, আপনাদেরকেও মানুষ দেখছে এবং মার্কসবাদী- লেনিনবাদী বলে মনে করে, বরং কট্টর বলে মনে করে। বিপ্লবী বলে মনে করে। শুধু সন্দেহ আপনারা নেতৃত্ব দিতে পারবেন কিনা, আপনাদের সেই শক্তি আছে কিনা। এই কাজটি করতে আপনারা যদি দশ বছর সময় নেন, দশ বছর বিপ্লব অপেক্ষা করবে। দশ বছরের আগে পাঁচ বছরে যদি কমপ্লিট করতে পারেন অ্যান্ড ইফ দ্য ক্রাইসিস অফ দিস নেচার পারসিস্টস অ্যান্ড কন্টিনিউজ, (এই ধরনের সংকট যদি চলতেই থাকে) তবে পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে বিপ্লবের সূচনা হবে। আজ এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই (সি) জিন্দাবাদ